নবাব বাঁদী

অসীম রায়

মনীষা

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ১৯৬১

প্রচ্ছদ
খালেদ চৌধুরী

প্রকাশক
মণি সান্যাল
মনীষা গ্রন্থালয় (প্রাঃ) লিমিটেড
৫৪ এ, হরি ঘোষ স্ট্রিট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক
শ্যামল কুমার
মিত্র প্রেস
২, গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্ধুবরেষু

ভূমিকা

একাল থেকে সেকালে কেন এ প্রশ্ন রেখেছেন আমার সামনে কোনো কোনো পাঠক। জনৈক হিতাকাঙ্ক্ষী আরও খোলসা করে বলেছিলেন, এই র‍্যাকেটে তুমিও?

কিছুকাল আগে ফার্মিঙ্গারের ফিফ্‌থ রিপোর্ট হাতে আসে। অষ্টাদশ শতাব্দী সম্পর্কে কমবয়সী কৌতূহল বাড়ে আরও কিছু বই-সংগ্রহে। ঊনবিংশ শতাব্দী যেন ঘাঁটা পায়েস। তার চেয়ে অনেক বেশী লেখককে টানে ইংরেজ-আগমনের সমসাময়িক কিংবা তার কিছু আগে-পরের আলো-আঁধারে মেশা কাল যেখানে লিখিত ইতিহাস আর কিংবদন্তী মাখামাখি হয়ে আছে। আমাদের কালের চেহারা বুঝতেও অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবন যাত্রার অনুধাবন খুব প্রয়োজনীয় কাজ বলে মনে হয়। একেবারের ভিন্ন মেজাজের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া এ সময় নিয়ে ভালো কাজ আর হয়নি। ঠিক সেকালে যাওয়া নয় কিংবা সেকালের জন্যে অশ্রুপাত নয়। আমাদের একালের চোখ দিয়ে অতীতের পুনর্বিন্যাস কি সম্ভব নয়? এই ধরনের প্রশ্ন মাথায় ঘোরে।

হিতাকাঙ্ক্ষীর সাবধানবাণী মাথায় ছিল। দু'শো কেন, পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে গেলেই মানুষের চরিত্র, বিশেষ করে বাংলা উপন্যাসে, অবয়ব হারিয়ে ফেলে। ঐতিহাসিক উপন্যাস মানেই যেন খাসা রোমান্স অথবা এমন এক জ্যাবড়া কাহিনী যেখানে চরিত্রগুলো খালি শৌর্যবীর্য, প্রেমের প্রতীক।

অথচ ইতিহাস, অন্তত: কোনো কোনো লেখককে, প্রবলভাবে টানে, তার শক্তি চ্যালেঞ্জ করে, তার অভিজ্ঞতাকে দেয় আরো বড় ক্যানভাস। ওয়ারেণ হেস্টিংসের সমসাময়িক কাল নিয়ে এই উপন্যাস এবং কিছুকাল পরেই পুরনো মুর্শিদাবাদ অবলম্বনে আর একটি উপন্যাস "পলাশী কতদূর" লিখবার সময় ইতিহাসের এই প্রাণদায়িনী শক্তি টের পাওয়া যায়

বইপত্র ছাড়াও উপকৃত হয়েছি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কিউরেটার শ্রীনিশীথরঞ্জন রায়ের আনুকূল্যে সলভিন্সের আঁকা চারখণ্ড চিত্রমালা দেখার সুযোগ লাভে। ইংরেজ আগমনের আগে ভারতবর্ষ ছিল গহন তমিস্রায়, এই চালু ধারণা ধাক্কা খায় এই চিত্রমালাদর্শনে। নানারকম জলযান, স্থলযান, বেশভূষা, বিভিন্ন পেশার মানুষের, বিশেষ করে খেটে-খাওয়া সাধারণ নর-নারীর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারায় আমাদের এই ভ্রম-নিরসন হয়।

আর একটি প্রসঙ্গও উল্লেখ না করে পারছি না। বোধ হয় হুতোমের কল্যাণে আমাদের বেলেল্লাবাবু উত্তরাধিকার-সম্পর্কে আমরা একটু বেশী মাত্রায় সচেতন। সীমিত হলেও আর এক উত্তরাধিকার ছিল। ইংরেজদের সঙ্গে ক্রমাগত অসম প্রতিযোগিতায় পরাজিত, কিছু মানুষের ব্যবসায় বাণিজ্য থেকে পরাজিত নায়কের মতো জোতজমিতে প্রস্থান এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

যাঁদের কাছ থেকে উপকরণ-সংগ্রহে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের মধ্যে আছেন এশিয়াটিক সোসাইটির শ্রীবীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীপ্রণবরঞ্জন রায়। 'বারোমাস' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ ধারাবাহিকভাবে তাঁদের কাগজে এ কাহিনী ছাপিয়ে লেখককে উৎসাহ দিয়েছেন।

উপন্যাসের-পাত্রপাত্রী

চার্লস ম্যাকিনটশ—তেইশ বছর বয়স্ক রাইটার, প্রাক্তন কাউন্সিল-মেম্বার

পিটার ম্যাকিনটশের ভ্রাতুষ্পুত্র

মিস ক্র্যাফটন—ভারতের মাটিতে ভাগ্যান্বেষী তরুণী

ম্যাকডাওয়েল—বোর্ড অফ ট্রেডের সভ্য

ডক্টর ডিকি—নামে ডাক্তার, আসলে ব্যবসায়ী

ক্যাপ্টেন নর্টন—জাহাজের ক্যাপ্টেন

গোকুল মুখার্জি—ব্যানিয়ান

কৃষ্ণগোপাল দে—কটন পীস গুডস, রেশম ও জাহাজ ব্যবসায়ী

হেমা—কৃষ্ণগোপালের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী

প্রাণগোপাল—কৃষ্ণগোপালের ভাই

ওয়ারেণ হেস্টিংস—গভর্ণর-জেনারেল

মেজর ফাউলার—কোম্পানী-অফিসিয়াল

বারোজ—নদীয়ার কালেক্টার

রামগতি মিত্র—নবগ্রামের আমিন

লক্ষ্মণ দাস—বিদ্রোহী তাঁতী

রূপী—লক্ষ্মণের নাবালিকা স্ত্রী

কানাই—লক্ষ্মণের ভাই

বালথাজার—স্লেভ-ট্রেডের কারিগর

জন পড ও ম্যাকগ্রেগর—স্লেভ-ওয়্যারহাউসের নিলামদার ও মালিক

সুরথ, শীতল—মাঝি

স্থান : ক'লকাতা। কাল—১৭৮৩।

কাউণ্টেস অফ সাদার্ল্যাণ্ড' তীরে ভিড়ছে সকাল দশটায়। দোতলার ছোট ডেক থেকে রাইটার চার্লস ম্যাকিনটশ গঙ্গার ধারে সারি সারি বাগানবাড়ির দিকে চেয়ে হাই তোলে। গত সাতমাস জল দেখে দেখে চোখ পচে গেছে। মাঝে একবার কেপ অফ গুড হোপে খালি সাতদিন স্থল। কিন্তু সেখানে পর্তুগীজদের গীর্জার পাশে সাদা আদমিদের কলোনিতে বেশ আতঙ্কেই ছিল চার্লস। চারপাশে খালি ইয়লো ফিভার আর খুনোখুনির গল্প। তারপর জাহাজে জল নিতে সিংহলে ত্রিনকোমালিতে মাত্র দুদিন। গভর্ণর হাউসে তাদের সম্মানে নেটিভদের ডান্স তার মন্দ লাগে নি। 'দেয়ার হাই জাম্প, মাই গড্!' রেশমের ট্যাসেল-আঁটা লাল মখমলের কোট ঝাড়তে ঝাড়তে তার মাথার ওপরেই রেলিং লাগানো এক নম্বর ডেকের দিকে চোখ পড়ে। কী সাজতেই পারে মেয়েছেলেরা! তিনজন মহিলা অদূরে নৌকোর দিকে চেয়ে হেসে গড়িয়ে পড়ছে। এর মধ্যে রোগাটে গড়নের মিস ক্র্যাফটন তার চিত্তাকর্ষণের কারণ। রাইটার ম্যাকিনটশ চেষ্টা করেছিল আলাপ জমাতে। কিন্তু কোম্পানির কাউন্সিল মেম্বারের কন্যা জুনিয়ার রাইটারকে বিশেষ পাত্তা দেয় নি। 'লুক, দে আর নেকেড, অ্যাবসলিউটলি নেকেড!' মিস ক্র্যাফটনের সুরেলা গলা ভেসে আসে। আঁট লাল মখমলের কোট আলগা করতে করতে চার্লস মনে মনে বললে 'ইয়েস নেকেড, বাট দে ফিট আণ্ডার দিস স্কাই।'

সিংহলের বন্দরে অগণিত মাঝিমাল্লা লস্করের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রায় উলঙ্গ শরীরের মেলায় প্রথমে সেও অসোয়াস্তি বোধ করেছিল। রোদ্দুর ঝলকাচ্ছিল মাল্লাদের ঘামে ভেজা খালি পিঠে কাঁধে। সেদিকে, আর একবার আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে তার মনে হয়েছিল এ দুটোর মাঝখানে কোথাও একটা মিল আছে। এখন এই ভাদ্রের গরমে ঘামে গলায় লেপ্টে থাকা কালো মুর্শিদাবাদি সিল্কের স্কার্ফ আলগা করতে করতে রাইটার চার্লস তার কাকা ভারতবর্ষ প্রত্যাগত পার্লিয়ামেণ্ট সদস্য পিটার ম্যাকিনটশের উপদেশ স্মরণ করে, 'দেয়ার আর মেনি থিংস দ্যাট মে স্ট্রাইক ইউ ইন বেঙ্গল। থিঙ্ক অফ ওয়ারেন হেস্টিংস অ্যাণ্ড ইয়োর কমিশন। দ্যাটস্ অল। হোয়েন ইউ কাম ব্যাক আই স্যাল গেট ইউ এ সিট ইন পার্লিয়ামেণ্ট।'

'হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ স্যার?' শাদা ফ্রিল দেওয়া ধূসর কোট আর কাঁচাপাকা এক গাল দাড়ি—ষ্টুয়ার্ড বললে।

গেট মি এ স্মেলিং সল্ট।

কেপ অফ গুড হোপ পেরোতেই তাদের জাহাজ ঝড়ে পড়েছিল। তবে সিংহল ছাড়ার পর বঙ্গোপসাগরে ক্রমাগত এক সপ্তাহ ধরে নাস্তানাবুদ যাত্রীদের সবাইকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। ওপরের কেবিন থেকে ক্রমাগত মহিলাদের চিৎকার, ক্রন্দন, তার সঙ্গে সঙ্গে তার গা ঘোলানো। এমন কি অতি চমৎকার উপাদেয় খরগোশের মাংসও চার্লস মুখে তুলতে পারে নি।

এতক্ষণে হাওয়া দিয়েছে। পাশে নীল রেলিং দেওয়া ডেকে ক্যাপ্টেন বেরিয়ে আসে। প্রায় সাতফুট লম্বা। ছুঁচলো দাড়ি। সোনাবাঁধানো বেটন তুলে সেকেণ্ড অফিসারকে কি বললে। পরমুহূর্তেই সিল্কের মোড়া পালগুলো এক এক করে খুলতে থাকে হাওয়ায়। 'কাউণ্টেস অফ সাদার্ল্যাণ্ড' একবার হেলে সোজা হয়ে ওঠে। তারপর তরতর করে এগোতে থাকে।

'লুক লুক, হাউ বিউটিফুল'! ক্যালকাটা মাস্ট বি মোর বিউটিফুল দ্যান ম্যাড্রাস।' আবার মিস ক্র্যাফটনের গলা।

ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়ানো শাদা হাফপ্যাণ্ট হাফশার্ট পরা মোটাসোটা হুগলি পাইলট চেঁচিয়ে বলে, 'উই আর পাসিং বজবজ।'

সত্যিই এবার অনবদ্য ভিউ ফুটে ওঠে। গঙ্গার গায়ে গায়ে কোম্পানির আমলা-দের বাগানঘেরা বাড়ি। সদ্যনির্মিত নির্জন ঘাটে মাথায় পাগড়ি আর মাল-কোঁচা আঁটা নিশ্চল ভারতীয় সান্ত্রী। আনন্দে উত্তেজনায় বুক দুরু দুরু করে

রাইটার ম্যাকিনটশের। তার কাকার মতো এই কলকাতায় আট দশ বছর বাস করতে পারলেই নবাব। কোম্পানি আমলাদের কতো নবাবি কাহিনী সে তার কাকার মুখে শুনেছে। সেগুলোর অর্ধেক সত্যি হলেও তো যথেষ্ট। তবে একটা ব্যাপারেই সজাগ থাকতে হবে। এখানে যখন তখন লোক মরে যায়, যথেষ্ট বৈভব সত্ত্বেও। কাকার এক বন্ধুকে সে চিনত, বিশাল লম্বা চওড়া লোকটা। সেই দশাসই পুরুষ দেহ রেখেছে গত বছর কোনো এক রাস্তার পাশে কবরখানায়, রাস্তাটার নামই বেরিয়াল গ্রাউণ্ড রোড। তবে ঝুঁকি নিতেই হবে। গত তিন বছর টাউনশেণ্ড এক্সপোর্ট কোম্পানির কেরানিগিরি করেও সে বিবাহের যোগ্যতা অর্জন করতে পারে নি। আর সেই বিরাট কাঠের বাড়ির ঠাণ্ডা অন্ধকার ঘরখানার কথা ভাবলে এখন এই ভাদ্রের গরমে আর হাওয়াতেও তার শরীর হিম হয়ে আসে। কিছু বলা যায় না। ইতিমধ্যেই তার কাকা বলতে সুরু করেছে কোম্পানি এবার ভারতবর্ষের রাজা হবে, বেঙ্গল নিয়ে আত্মসন্তুষ্টি মানে এক ধরনের আত্মহত্যা। কাকার চিঠিটার কথা মনে পড়ে যাওয়ায় সে তার অজান্তেই কোটের বুক পকেটে হাত দেয়। এখানে সে শুনেছে, ঠিক জায়গায় যোগাযোগই আসল ব্যাপার। অনেক তরুণ এসে এই ঠিক জায়গায় যোগাযোগের অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত জাহাজঘাটায় পর্তুগীজদের চটিতে আশ্রয় নিয়ে পাঁড় মদ্যপে পরিণত হয়েছে, ইংরেজ জাতির কলঙ্কের কারণ ঘটিয়েছে।

'ইয়েস স্যার', একটা ট্রেতে কাটগ্লাসের বাহারে চ্যাপ্টা বোতল।

'ইউ মে গো।'

'উই হাভ এ গুড কোয়ান্টিটি অফ ম্যাডেরিয়া,' স্টুয়ার্ড তরুণ যাত্রীটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বলে।

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

এমন সময় মহিলাদের কেবিন থেকে সম্মিলিত আর্ত কণ্ঠ ভেসে আসে। ম্যাকিনটশ নির্বিকারভাবে স্মেলিং সল্ট শোঁকে। হাওয়াটা পালে এবার ভালই লেগেছে, তর তর করে জাহাজ চলেছে। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায় ইংরেজ যুবক। যদি তার কাকা না থাকত কিংবা থেকেও দয়াপরবশ না হত তাহলে? ভাবতেই সেই অন্ধকার ঠাণ্ডা কাঠের ঘর ভেসে আসে। রাস্তার মোড়ে ধুমসো তিনটে মহিলা কাপড় কাচছে আর চেঁচাচ্ছে, মুখভর্তি কালিঝুল মেখে রাস্তায় ছোকরারা জটলা করছে আর বয়স্কদের মধ্যে সেই অন্তহীন

আলোচনা, আমেরিকা আমাদের তাঁবে থাকবে কি না।

'মাই প্যারাসোল! ও মাই ওয়েডিং গাউন!' মিস ক্র্যাফটন ক্যাপ্টেনের প্রায় গায়ে এসে পড়েছে।

শাদা আঁট সিল্কের কোটে হলুদ এমব্রয়ডারি করা ফুলে হাত দিয়ে ক্যাপ্টেন নর্টন উদাসীন গলায় বলে, 'ইয়েস?'

'আই গট ইট ফ্রম প্যারিস।'

'রিয়ালি?'

এরপর ক্যাপ্টেনকে নিয়ে মহিলাদের কেবিনে তোলপাড়। একটা রুপোর ট্রে নিচের ডেকে ঠন ঠন শব্দে এসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ঢল ঢল চেহারা চোর লুসির চিৎকার, 'ইট ওয়াজ কেপট ইন মাই লকার বাই দ্যাট বিচ। লুক অ্যাট হার বিচি লুক!' ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনেই ব্যাপারটা ঘটে। হঠাৎ মিস ক্র্যাফটনের লম্বা ফ্রিল আঁটা বাহু বিদ্যুতের মতো খেলে যায়, ক্যাপ্টেনের পাশে দাঁড়ানো লুসি মডলিনের গাল তার নখের আঁচড়ে রক্তাক্ত। লুসি, যার চৌর্যখ্যাতি ইতিমধ্যেই সারা জাহাজে ব্যাপ্ত, সে তাঁর মোটা ভারি শরীর নিয়ে আছড়ে পড়ে মিস ক্র্যাফটনের দিকে। কোনোমতে টাল খেয়ে ক্যাপ্টেন নর্টন নিজেকে সামলায়। 'শ্যেম্ শ্যেম্!' অত্যন্ত বিপন্ন গলায় চেঁচিয়ে ওঠে ক্যাপ্টেন।

ম্যাকিনটশেরও খারাপ লাগে। বিশেষ করে তাদের জাহাজে আধা-পর্তুগীজ ও তেলেঙ্গি মাল্লারা যখন ইংরেজ ললনাদের এই ঝটাপটি দেখে চোখ মটকায়, নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ জাতির ভাবগম্ভীর ইমেজ যেন হঠাৎ চোট খায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে কাকার সাবধানবাণী। কখনো সে যেন হেঁটে চৌরঙ্গী কি তার কাছাকাছি ঘোরাফেরা না করে। ঘোড়া, পাল্কি কিংবা জুড়ি ছাড়া ইংরেজদের চলাফেরা অপমানকর। যদি হাঁটতে ইচ্ছে করে তবুও হাঁটবে না, অঙ্গ সঞ্চালনের প্রয়োজনে ঘোড়ায় চড়বে। হাঁটে নেটিভরা।

খানিকটা ঝটাপটি করে মহিলা দুটি আপাততঃ শান্ত, অবশ্য চোর লুসি মিস ক্র্যাফটনের এক খাবলা সোনালি চুল তুলে নেবার পরই ব্যাপারটা মেটে। কেপ অব গুড হোপে মিস ক্র্যাফটনের এমারেল্ড রিং হারিয়েছিল, এমন কি বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের দোলায় যখন ক্রমাগত গা ঘোলানোয় তাদের খাওয়া দাওয়া দু-তিন দিন প্রায় বন্ধ সে অবস্থাতেও প্যারিস থেকে আনা মিস ক্র্যাফটনের ড্রেসিং গাউন হারিয়ে যায়। দুই মহিলাই ম্যাকিনটশের মতো ভারতবর্ষের

মাটিতে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে। ম্যাকিনটশের খবর দুই অবিবাহিত কাউন্সিল মেম্বারকে গাঁথতে তারা চলেছে।

বজবজের সেই সুরম্য বিদেশী কলোনি পেরতে না পেরতেই আবার নদীর দু-ধারে ঘন বন, বনের মাথায় মাথায় নারকেলগাছের আন্দোলিত মাথা।

পাইলট চেঁচিয়ে বলে, 'যদি তোমরা আরও ওপরের দিকে যাও, যেমন ব্যারাক-পোর, দেখবে বাড়ি তৈরির ধুম পড়েছে……গো টু ব্যারাকপোর, ইট লুক্‌স অলমোস্ট লাইক ইংল্যান্ড।'

সাত মাসের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বেশ একটা সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। এখন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তা ভেঙ্গে চুরমার হবে। বোঝা যাবে সে তার কাকার যোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র কিনা। কেবিনে সোনালী কাঠের ফুল তোলা নিচু কার্ড টেবিলের দিকে সে এগোয়। তারপর নিস্তব্ধভাবে কেবিনের দেয়ালে ঝোলানো জর্জ দ্য থার্ডের বহু পরিচিত ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। চিত্রবিচিত্র ফ্রেম, ফাটা একদিকে—জিব্রালটারের কাছে ঝড়ে পড়ে গিয়েছিল মেঝেতে। কেবিন সংলগ্ন বাথরুমে রাখা পিস্‌পটে হিসি করতে করতে ম্যাকিনটশ প্রবল আত্মীয়তাবোধ করে তার এই সাত মাসের বাড়িটার সঙ্গে। বলতে কি তার এই তেইশ বছরের জীবনে এই জাহাজে এসেই সে প্রথম স্বাতন্ত্র্য অর্জন করেছে। সব সময় জ্যাবড়াভাবে থাকতে হত একগুচ্ছের ভাই-বোনের সঙ্গে, পুরনো নড়বড়ে কাঠের বাড়ি সর্বদা পায়ের আওয়াজে কাঁপত। একমাত্র এই জাহাজে এসেই সে তার যৌবরাজ্যে প্রবেশ করেছে। কার্ড টেবিলে আধখোলা উপন্যাস ট্রিসট্রাম শ্যান্ডি বইখানার দিকে চেয়ে চেয়ে সে অসোয়াস্তি বোধ করে। সাধারণ জীবনযাত্রা বড়ই দরিদ্র, বড়ই একঘেয়ে। সবাই তারা বেরিয়েছে অ্যাডভেঞ্চারের সন্ধানে, মিস ক্র্যাফটন, চোর লুসি, সে নিজে। কিন্তু সে কি পারবে সামলাতে? তার কাকার তার সম্পর্কে প্রথম সন্দেহ কাটাতে লেগেছে অনেক দিন। 'ইউ আর র‍্যাদার এ বুকিশ টাইপ চার্লস। ডোন্ট বি এ ডিসগ্রেস টু আওয়ার কাণ্ট্রি। আই ওয়ার্ন ইউ।'

ক্যাপ্টেন নর্টন কেবিনে এসে ঢোকে। 'মোটের ওপর আমাদের সমুদ্রযাত্রাটা ভালই হয়েছে, কি বল?' কার্ড টেবিলের ওপর বইখানা তুলে নিয়ে বললে, 'ইউ আর এ স্কলার? স্কলার্স হ্যাভ নো প্লেস ইন ইণ্ডিয়া।'

ম্যাকিনটশ ভুরু কোঁচকায়। এ ধরনের কথা ক্যাপ্টেন আগেও তাকে বলেছে। ভারতবর্ষে এখন গর্বিত পুরুষসিংহের প্রয়োজন। সবাই তাল করছে বাণিজ্যের

ক্ষেত্র থেকে ইংরেজকে হটানোর জন্যে। দক্ষিণে হায়দার আলি, এদিকে ফরাসি। নবাবও চুপ করে বসে নেই। এই সব কথাগুলো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে থাকে ক্যাপ্টেন নর্টন।

'আবার কবে ফিরবে?' প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে ম্যাকিনটশ বলে।

ক্যাপ্টেন সেদিকে কান দেয় না। 'তোমার ব্যানিয়ান কে?'

'গোকুল মুখার্জি।'

ক্যাপ্টেন ভুরু তুলে বললে, 'সেই গ্রেট গোকুল। খুব সাবধান। খুব গড়বড়ে লোক।'

'তার মানে?'

'না না, আমি তোমাকে নার্ভাস করতে চাই না। ব্যানিয়ানরা যেরকম হয়, তুমি তো শুনেইছ তোমার কাকার কাছে। চমৎকার লোক ছিল তোমার কাকা।' একটু থেমে বললে, 'এ রিয়াল ব্রিটন।'

দাঁড়িয়ে উঠে জানলার বাইরে সার সার নারকেলগাছের দিকে চেয়ে হঠাৎ ক্যাপ্টেন চেঁচিয়ে ওঠে, 'লুক লুক দ্য ডিয়ার! দ্য স্পটেড ওয়ানস।'

এক পাল চিতল জল খাচ্ছে। ক্যাপ্টেন শিকারের গল্প শুরু করে। চৌরঙ্গী থেকে বেশি দূর যাবার দরকার নেই। আধঘণ্টা ঘোড়ায় চেপে গেলেই মেজর টলির সদ্য খোঁড়া নালার গা দিয়েই বাঘের আস্তানা।

'আই গট ওয়ান লাস্ট ডিসেম্বর—এ রিয়াল রয়াল বেঙ্গল।'

'তুমি কবে ফিরবে?'

'তুমি তো জানো চার্লস, ফরাসিরা আমাদের পেছনে কাঠি না দিলে আমেরিকার এত বাড় বাড়ত না। অথচ জানো, ফ্রান্সের বাজার ছাড়া আমাদের চলে না। সমস্ত ফ্রান্সে আমাদের কটন. পিস গুডস্ ছেয়ে গেছে। প্যারিসে বেঙ্গল কটন পিস গুডসের দারুণ খাতির। মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় হয়। ফ্রান্সের বাজার ছাড়লেই মুশকিল।'

কৌতূহলী তরুণ মুখটির দিকে চেয়ে ক্যাপ্টেন বলে, 'বুঝতে পারছ না? এই কটন পিস গুডসে আমরা হাজার হাজার পাউণ্ড নেটিভদের হাতে তুলে দিচ্ছি; তাদের গ্রামগুলো প্রসপার করছে। কিন্তু তাতে আমাদের কী? আর এখানকার কাপড়ের ব্যবসায়ীরা! কী গ্রাউণ্ড! তোমার নিশ্চয় কৃষ্ণগোপালের সঙ্গে দেখা হবে। চৌরঙ্গীর গায়েই বিরাট বাড়ি তুলেছে। একটা প্যালেস। চাকর-বাকর, লোক-লস্কর। নাচ গান, ম্যাডেরিয়া, গার্ডেন পার্টি। ওর পার্টিতে

গিয়ে সত্যিই বেস্থার লাগছিল। নেটিভদের হাতে এত টাকা থাকবে কেন ?'

একটু আত্মসচেতনভাবে আবার ক্যাপ্টেন বললে, 'জাহাজ চালাই, এত খবরের কি দরকার !'

ম্যাকিনটশ তার কাকার একটা কথা কোট করলে, 'আমরা এখানে যে যেখানেই থাকি না কেন সবাই ব্যবসায়ী।'

'দ্যাটস রাইট, দ্যাটস রাইট !' উৎসাহে ছলবল করে ওঠে ক্যাপ্টেন।

সামনের রোববার কৃষ্ণগোপালের সঙ্গে আমার কথা হবে। তবে ভীষণ প্রাউড লোক। হয়ত মাসখানেক অপেক্ষা করতে হবে। গত বছর দু হাজার টন কটন গুডস ফরেন ইয়োরোপে চালান দিয়েছে—আই মিন ফ্রান্স, হল্যান্ড, ডেনমার্ক। তোমাদের কোম্পানি যাই পাঠাক আমার তো নিজের টেন পার্সেন্ট রাখতে হবে।'

'নেটিভরা ইংরেজদের কী চোখে দেখে ?'

ক্যাপ্টেনের পাতলা ঠোঁটের পাশে চাপা হাসি খেলে। 'হোয়াট ডাজ ইট ম্যাটার ?' কেবিনের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে নর্টন। তার এখন কল্পনা উদ্দীপ্ত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে করুণাও করে এই আনাড়ি তরুণটিকে। মনে মনে বলে, 'ঠেকে শেখো বাবা। ঠেকে শেখো। আমাকেও অনেক ঠেকে শিখতে হয়েছে।' শান্তভাবে বললে, 'ওয়ান থিং ম্যাটার্স। ইয়েস ওনলি ওয়ান থিং। ওয়ারেণ হেস্টিংস।'

'কিন্তু……'

'আমি জানি হোমে অনেক কথা হচ্ছে। কিচ্ছু ম্যাটার করে না। কোম্পানির ইনডিসিশন, এই পরস্পর খাওয়াখাওয়ি এগুলো দূরমুশ করতে পারে একজন লোক। ফ্রান্সিস তো ভেড়ুয়া। ওর অনেক ল্যাংবোট আছে, খুব সাবধান। তুমি যেরকম বুকিশ ইনট্রসপেক্টিভ তুমি ওদের খপ্পরে পড়ে যেতে পার। তাহলেই সর্বনাশ। নেটিভরা একটা ছড়া কাটে, শুনেছ কাকার কাছে ?'

কৌতূহলী হয়ে ম্যাকিনটশ তাকায়।

'আমি ওদের গড ফরসেকন ল্যাংগুয়েজ বলতে পারি না, তবে অনেকটা এইরকম—

> হাটি পর হাওডা ঘোড়ে পর জিন
> জলদি বাহার যাটা ওয়ারেণ হেস্টিন।

'ইন্টারেস্টিং না ? উই আর নিয়ারিং ক্যালকাটা।'

কেবিন ছাড়বার মুখে তার লম্বা শরীরখানা ঝুঁকিয়ে বললে, 'ইয়েস, এ রিমার্কেবল ম্যান।'

২

জাহাজঘাটায় গেঞ্জাম, সেজন্যে তারা অর্ধবৃত্তাকারে অগ্রসর হয়। সামনে ইলিশের নৌকোয় হুড় করা ইলিশ রোদ্দুরে ঝলকায়। দাঁড় বাইতে বাইতে শীতল হাঁকে, 'কী দর ?'

'পণে সিকি', জেলে বইঠা থেকে হাত তুলে মাথায় ঠেকায়।

'আমরা কোথায় যাচ্ছি সুরথদা ?'

'কে জানে ?' সুরথ হাল থেকে জবাব দেয়।

বৃদ্ধ সুরথের কোঁচকানো চামড়া আর শির বের করা ঢিলে চামড়ার পেছনে সত্তর বছরের স্মৃতি। নবাবের সময়, কোম্পানি বাহাদুরের সময়, তার সমস্ত জীবনটা জুড়ে। আগে যেটুকু সুবিধে ছিল তা এখন আর নেই। তবে সুযোগ থাকলেও সাধ্য ছিল না। যখন তাদের বাল্যকালে হাটে এক পয়সায় পাঁচ সের চাল বিকিয়েছে তখনও তারা পেট চাপড়িয়েছে। এখন তো চাপড়াবেই।

এমন সময় গড় থেকে তোপ পড়ে। বজরার অভ্যন্তরে ব্যানিয়ান গোকুল মুখোপাধ্যায় গড়ের দিকে একটু কাৎ হয়ে বসে। কারণ 'বামে শব, শিবা, কুম্ভ দক্ষিণে গো, মৃগ, দ্বিজ, সম্মুখে উত্তমা স্ত্রী, দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ' ইত্যাদি সুনিমিত্ত বলে পরিগণিত। তোপ আর শঙ্খ একই। আর সাহেবপাড়ায় মড়ক লেগেছে। আজ সকালে জুড়িতে আসার সময় অন্ততঃ দুটো কফিন ঘোড়ার ঠেলায় চাপিয়ে দুই মিছিল বাঁ দিক থেকে কবরখানার দিকে আসতে সে দেখেছে। হবেই তো, নিজের মনেই হাসে, ব্যাটারা গণ্ডেপিণ্ডে খায়, খেয়েই ভেদবমি। আর কোম্পানির ডাক্তার কোথায় ? ডাক্তারও তো গোমস্তা। সবাই কমিশন গুণছে। গড়গড়া থেকে মুখ নামিয়ে গোকুল হাঁকে, 'জোরে টান, জোরে টান। কী ব্যাড় ব্যাড় করছিস।'

এবার একটা জাহাজের গা ঘেঁষে নৌকো এগোয়। গোকুল জানলা দিয়ে দেখতে থাকে বত্রিশটা কামান আঁটা হাজার টনের ফ্রিগেট 'হারকিউলিস'। বাদামি ওক কাঠের গায়ে গঙ্গার পলি। মাস্তুলে মাস্তুলে গোটানো পাল। রয়াল নেভির এক ক্যাপ্টেন দূরবীন দিয়ে আলো ঝলমলে কলকাতা শহর দেখছে।

'আমাদের গাঁয়ে কাল সতী হল। আঃ! চোদ্দ বছরের মেয়েটাকে জ্বালিয়ে মারলে। চিতা থেকে লাফ দিয়ে পড়েছিল গো।'

'ওসব কত দেখলাম' সুরথ বেজারভাবে বলে।

'কোথায় যাবে দাদা? আগে ছিল ফৌজদার। এখন আমলা আর গোমস্তা।' গলা নামিয়ে শীতল বলে, 'দেশগাঁয়ে খুব লুটপাট হচ্ছে। লোকে কী করবে? বাঁচতে তো হবে।'

'আর ভাবিস না। জানিস, বেশি ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যায়। সবাই আমাদের রাজা বানিয়েছে। ফৌজদারের লোকেরা এসে বললে আমাদের রাজা বানাবে, জমিদারের লোকেরা বললে, এবার সব কর মকুব হয়ে যাবে, কোম্পানি বললে, নবাব গেছে, এবার সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। এখন কর দিতে দিতে গায়ের চামড়া খুলে গেল গো।'

এই সময় গোকুল বেরিয়ে আসে। তার কপালে দইয়ের ফোঁটা। শুভ কাজে সকালে পুজোপাঠ করে সে এসেছে। রোদ্দুর ঠেকাবার জন্যে চোখের ওপর হাত রেখে দাঁড়ায় দীর্ঘ ফর্সা লোকটি। বয়স তিপ্পান্ন-চুয়ান্ন কিন্তু দেখায় তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ।

মালটানা 'লণ্ডন' জাহাজে বস্তা বস্তা সোরা উঠছে। কামানের গোলায় এই পাথুরে লবণ খুব কার্যকরী। আর কলোনি নিয়ে যুদ্ধের পরিস্থিতি যতই ঘোরাল হয়ে উঠছে ততই এই পাথুরে লবণের রপ্তানি বাড়ছে কলকাতা বন্দর থেকে। তার পাশে 'ক্যালকাটা' নামে বিশাল যুদ্ধজাহাজ। গোকুল জানে এ রণতরীর কামানের সংখ্যা চুয়াত্তর। পৎ পৎ করে ইউনিয়ন জ্যাক উড়ছে মাস্তুলের মাথায়। তার পাশে 'লেডি পোর্টার'—কোম্পানীর এই বাণিজ্য সাংহাই বন্দরের সঙ্গে। আফিমের পেটি উঠছে জাহাজে। গোকুল আন্দাজ করে, এ জাহাজকে গার্ড দিয়ে নিয়ে যাবে 'ক্যালকাটা'। সম্প্রতি চীনা কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একতরফা অবিরল আফিম আমদানিতে বাধা আসছে। সেইজন্যে গানবোটের প্রয়োজন। এরপর 'সুলতানা' আর 'ফ্রেণ্ডশিপ। 'ফ্রেণ্ডশিপে' কটন পিস গুডস উঠছে। কৃষ্ণগোপালের মাল উঠছে। কৃষ্ণগোপাল দু-হাজার পাউণ্ডের অর্ডার পেয়েছে সম্প্রতি। ব্যানিয়ানের কাজের সঙ্গে সঙ্গে আফিমের ব্যবসায় নামলে কিরকম হয়? গোকুল চিন্তা করে।

বাফ্‌তার পাগড়ি মাথায় ঠিক করে বসাতে বসাতেই তাঁর নজরে আসে 'কাউণ্টেস অফ সাদাল্যাণ্ড' জেটিতে গেঞ্জামের জন্যে মাঝনদীতে অপেক্ষমান।

জাহাজের গায়ে আরও দুটো বড় হাউসবোট। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মহিলারা একটা হাউসবোটে নেমেছেন। গোকুল তার মুখচেনা। তার দিকে চোখ পড়তেই নর্টন হাঁক দেয়. 'চার্লস, ইওর ব্যানিয়ান হ্যাজ কাম।'
তরতর করে দীর্ঘদেহ গোকুল মুখোপাধ্যায় গ্যাংওয়ে দিয়ে জাহাজে উঠে আসে। তারপর ডেকে অপেক্ষমান—তরুণ ইংরেজটিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্নিশ করে বলে, 'গুড মর্ণিং স্যার। আই গোকুল মুখার্জি ব্যানিয়ান স্যার।'
'গুড, ভেরি গুড, ওয়েট।'
'ইওর প্যালাঙ্কিন রেডি, হাউস রেডি, সার্ভেন্টস রেডি, এভরি থিং রেডি।'
'থ্যাঙ্ক ইউ, আই অ্যাম কামিং।'
কেবিনে ঢুকে আর একবার চারদিক চেয়ে সংলগ্ন বাথরুমে ঢোকে ম্যাকিনটশ। উত্তেজনায় তার হিসি পেয়ে গিয়েছে। সব মালই সাজানো আছে। র‍্যাক থেকে হাকলুটের ভয়েজ, বেকনের রচনাখণ্ড, ট্রিসট্রাম শ্যান্ডি বইগুলো হাতে নিতেই গোকুল মুখোপাধ্যায় হাত বাড়িয়ে দেয়, 'আই টেক।'
গ্যাংওয়ে দিয়ে নামতে নামতে রোদ্দুরে ঝলমল বাদামি জলের ওপর এক ঝাঁক পাক খাওয়া চিলের ওপর দৃষ্টি রেখে থমকে দাঁড়ায় চার্লস। ওপরে হাওড়ার দিকে ঘন নারকেলগাছের সারি, ঘাট, মাঝে মাঝে মন্দির। নিজের মনে মনে বলে, 'এ স্ট্রেঞ্জ ল্যাণ্ড।'
'ইয়েস স্যার, এ হেভেন ফর ইংলিশম্যান' পেছন থেকে গোকুল বলে।
মাথায় মাথায় সিন্দুকের পেটি উঠছে পাশের জাহাজে। একটা লোক ওপর থেকে চিৎকার করে গুণছে। পঁয়তাল্লিশ, ছেচল্লিশ, সাতচল্লিশ।' পাশের জাহাজে আফিম। চারদিক গমগম করছে। মাঝে মাঝে ইংরেজি বাংলা মেশানো সাহেবি গর্জন, দখুনে বাংলায় চেঁচামেচি, হিন্দুস্থানি সব মিলে সরগরম।
'সব শেষ হয়ে যাবে', সেদিকে চেয়ে শীতল বললে। 'কিছু লোকের ঘরে পয়সা আসছে। আমাদের বাবুর তো টাকা ধরছে না। ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল গো।'
'ওসব কথায় আমাদের কাজ কি। আমরা তো আর রামরাজ্যে বাস করছি না।'
'তোমার রামরাজ্যেও এইরকম ছিল সুরথদা। কিছু লোকের ঘরে টাকা জমত। আর সবাই আমাদের মতো পেট চাপড়াত।'
গ্যাংওয়ে থেকে এক লাফে চার্লস নামল বজরায়। তার খুব হাঁটতে ইচ্ছে করে, ছুটতে ইচ্ছে করে। শীতলের জায়গায় বসে দাঁড় বাইতে ইচ্ছে করে। শীতলের

কুচকুচে কালো মুখে সাদা খোঁচা দাড়ি আর একজোড়া কোমল চোখের দিকে এক নজর তাকিয়ে ভারবাহী পশুর কথা তার মনে হয়।
'ফোর্ট স্যার,' গোকুল সদ্য লাল ইঁটে বাঁধানো গঙ্গার পাড়ে দুটো কামানের দিকে সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
'ক্যালকাটা রণতরী পাশ করে তাদের নৌকো এগোতেই শীতল হাঁক দেয়, 'হট যাও, হট যাও।' সামনে এক আশ্চর্য দৃশ্য। দুটো লম্বা ছিপের মতো নৌকো আড়াআড়িভাবে তাদের পথ আটকে, সামনে একটা হাজারমণি নুনের নৌকোয় বাধা পড়েছে। নৌকোয় লম্বা কাঠের খাঁচা এবং সারি সারি দাঁড়ানো মানুষ— স্ত্রী-পুরুষ-বালক। তাদের মাথা কামানো, কাজেই দূর থেকে তাদের পুরুষ বা স্ত্রী বলে ঠাওর করবার উপায় নেই। তবে কাছ থেকে কয়েকজনের ময়লা চাদর ঠেলে উন্নত স্তনের অস্তিত্ব ভুল করার উপায় নেই। কপালে সকলের পোড়া ছেঁকার দাগ। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি। সকলের মুখ চোখে অপরিসীম অবসাদ। কেউ কেউ এত রোদ্দুরেও চোখ বুজে ঘুমোয়।
চার্লস ম্যাকিনটশের চোখ ঠিকরে পড়ে কৌতূহলে। 'হোয়াট ইজ দিস? হু আর দিজ পিপল?'
'স্লেভ ট্রেড স্যার। দে ব্রিং ইউ মানি।' গোকুল শান্তভাবে জবাব দেয়।
'দ্য কম্পানি কাণ্ট স্টপ ইট?'
'হোয়াই স্যার? দে ব্রিং দ্য কোম্পানি মানি। ওয়ান স্লেভ ফোর রুপি ফোর আনা স্যার।'
নুনের নৌকা সরতে প্রায় তিন চার মিনিট লেগে যায়। অবসাদে সামনের নৌকোর কোনো কোনো যাত্রী পিঠে পিঠ দিয়ে জিরোয়। একটি বালক চেঁচিয়ে কাঁদতে থাকে।
'ডিজগ্রেসফুল।' চার্লস ম্যাকিনটশ অপেক্ষা করে।
'দে আর গুণ্ডাস স্যার!'
'গুণ্ডাস?'
'কিল পিপল।'
চার্লস ম্যাকিনটশের বিস্ময় ধরে না। 'দিজ উইমেন?' দে কিল পিপল?'
গোকুলের অনেক কথা মনে এসেছিল। কিন্তু তা ভাষান্তরিত করা তার সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া তরুণ ইংরেজরা কলকাতার মাটিতে পা দিয়ে অনেক ব্যাপারেই অবাক হয়ে পড়ে, তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই একেবারে কোম্পানি

বাহাদুরের মার্কামারা আমলা, নিজের কমিশন ছাড়া আর কোনো দিকে নজর দেবার অবকাশ থাকে না। বিহ্বল চার্লসের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওপিয়াম ব্রিংস মানি, সল্ট ব্রিংস মানি, কটন ব্রিংস মানি, সিল্ক ব্রিংস মানি, স্লেভ ব্রিংস মানি।'

'আই সি।' বিস্মিত ইংরেজ তরুণটি বলে।

নতুন বাঁধানো ঘাট ঝকঝকে তকতকে; ঘাটের ওপর সেন্ট্রি বক্স। ঘর্মাক্ত অনাবৃত কালো চকচকে শরীরগুলোর আশেপাশে এক আধটা গোকুলের মতো চোগা চাপকান আঁটা বঙ্গসন্তান এবং চার্লস ম্যাকিনটশের মতো গুটি কয়েক লাল আঁটসাট কুর্তা আর ধবধবে সাদা প্যাণ্ট পরা ইংরেজ।

'হোয়্যার ডু উই গো বাবু? টু দ্য ফোর্ট?'

'নো স্যার, হাউস।'

চার্লস ম্যাকিনটশের মুখে আবার বিস্ময় ফুটে ওঠে। তার সঙ্গে সন্দেহ উঁকি মারে। সেদিকে চেয়ে গোকুল তাড়াতাড়ি বলেন, 'নো ফোর্ট স্যার, হাউস স্যার।'

'বাট আই ওয়াজ টোল্ড…'

গোকুলের উত্তরটা গলার কাছে ঠেলে ওঠে কিন্তু ভাষাজ্ঞানের অভাবে জিভের ডগায় পৌঁছায় না। হঠাৎ তার চিঠিটার কথা মনে পড়ে যায় এবং নিজের অনবধানতার জন্যে নিজের ওপর রাগও জন্মায়। তাড়াতাড়ি পাশপকেট থেকে বোর্ড অফ ট্রেডের সভ্য ম্যাকডাওয়েলের চিঠিখানা বার করে এগিয়ে দেয়। তার কাকার বন্ধুর চিঠি, প্রকৃতপক্ষে যে তার এবং অনেকেরই বস। 'গোকুল উইল লুক আফটার ইউ। হি হ্যাজ অ্যারেঞ্জড এ হাউস। উই নো লংগার লিভ ইন দ্য ফোর্ট। রেস্ট টু ডে—ম্যাকডাওয়েল।'

ঘাট থেকে উঠেই চার্লস দেখলে ঘোড়ায় করে ক্যাপ্টেন নর্টন শহরের দিকে ধাবিত। সিল্কের চাদর মোড়া রঙবেরঙের তিনটে পাল্কিতে মিস ক্র্যাফটন ও অন্যান্য মহিলারা উঠলেন। মোষের গাড়িতে মাল উঠছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর উঁচুপিঠ চেয়ার, কার্ড টেবিলের মাথায় একটা রুপোলি কেটলি আঁটা দীপাধার, ঝাড়িতে বড় বড় বেলজিয়ান গ্লাস। রোজ উডের নিচু টেবিল। ঘাটের গায়েই পর্তুগীজ শুঁড়িখানা। সুরার গন্ধে বাতাস আমোদিত। শাদা আদমিদের সঙ্গে কালো আদমিরা বসে পান করছে, বেশির ভাগই মাল্লা। পর্তুগীজ মাল্লাদের পরণে নীল পোশাক, মাথায় ছুঁচলো টুপি।

'দিস ওয়ে স্যার', গোকুল পথ দেখায়।

এমন সময় ঘুঙুরের আওয়াজ এবং সঙ্গে সঙ্গে শিঙা ও ঢোল। শিঙা থেকে বিলাপের আওয়াজের সাথে ঢোলের ক্রমাগত চাপড়। একটা রঙদার মিছিল আসছে। সামনে অশ্বারোহী ইংরেজ ক্যাপ্টেন, হাতে খাড়া তলোয়ার। তারপর গাদা বন্দুক নিয়ে সারি সারি মালকোচামারা খালি-পা ভারতীয় সেপাই। তারপর একদল নর্তকী, বাজনদার। একটা ক্ল্যারিওনেটও বাজতে থাকে, সঙ্গে ফ্রেঞ্চ হর্ণ। বোধ হয় চার্লস ম্যাকিনটশকে দেখেই নর্তকীরা থামে, তারপর হাত তুলে গা দুলিয়ে দুলিয়ে নাচতে থাকে। মাঝে মাঝে ঘোমটায় মুখ ঢাকে, আবার ঘোমটা সরায়। কেউ কেউ ফিক ফিক করে হাসে।

'হোয়াট ইজ দিস ?' আবার বিস্ময় রাইটার ম্যাকিনটশের গলায়।

'কিংস বার্থডে স্যার।'

'আই সি।'

'এভরি ডে এ প্রোসেশান স্যার ইন ক্যালকাটা। কিংস বার্থডে প্রোসেশান, হেস্টিংস বার্থডে প্রোসেশান, আরও কতো কি! দে সে ক্যালকাটা এ সিটি অফ প্রোসেশান।'

'আই সি', আবার চার্লসের কণ্ঠে বিস্ময়।

পাল্কির সামনে এসে বললে, 'হাউ ডু আই গেট ইন।'

গোকুল মুখোপাধ্যায় নিচু হয়ে পা ভাঁজ করে তড়াক করে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসে।

'লাভলি স্যার! লাভলি!'

'আই সি!' রাইটার ম্যাকিনটশ মাথা নিচু করে পাল্কি চাপে।

আট বেয়ারার পাল্কি দুলতে দুলতে এগোয় ওল্ড কোর্ট হাউস ধরে। সামনে আটদশজন লোক। দুজন পাইক ও দুজন চোবদারের হাতে বর্শা, মাথায় পাগড়ি, তারপর কয়েকজন হরকরা পিওন। খানিক দূর এগোতেই বিদ্যুৎ চমকায়। ঠাণ্ডা হাওয়া ওঠে। পাশ দিয়ে ক্বচিৎ মোষের গাড়ি, ক্বচিৎ ঘোড়ায় চেপে ইংরেজ পুরুষ, নচেৎ পাকা চওড়া রাস্তা ফাঁকা। মেঘলায় কখন আকাশ ঢাকা পড়েছে এবং মাঝে মাঝে মেঘভাঙা রোদ্দুরে চুনোটের ধবধবে সাদা থাম আর ভিনিশিয়ান জানলায় মোড়া সদ্যনির্মিত বাড়ির সারি মুগ্ধ করে চার্লসকে। এবার বাঁক নেয় পাল্কি। একটা মস্ত উঁচু একতলা বাড়ির গায়ে লেখা, 'স্লেভ ওয়্যারহাউস'। সামনে ফুলবাগান। একটু এগিয়ে চামর-

আঁটা এক জোড়া পাল্কি, বোধ হয় কোনো সম্পন্ন নেটিভের। বেয়ারারা হাত বদলায়। পাশে জোসেফ কোম্পানির দোকান। বাইরে একটা মস্ত ব্ল্যাকবোর্ডে খড়িতে লেখা: The following fresh goods have just been opened out and all very moderately priced, viz, Bridal Fans, Mourning Fans, Pearl and Bone Buttons, Gent's Scarfs, Sponges, Hosiery, Combs and Brushes, fashionable Lace Goods, Long Cloths, Dress Improvers, Cotton Sheeting—100 inches wide, Sola hats……

শেষটা পড়তে পারে না চার্লস ম্যাকিনটশ, কারণ ইতিমধ্যেই বড় বড় দানায় বৃষ্টি নামে। হাওয়া আর বৃষ্টির তোড় বাড়ে। গঙ্গানদীতে ইতিমধ্যে অনেক জল বয়ে গেছে, অনেক জীবনের উত্থান-পতন ঘটেছে, অনেক স্বপ্ন জেগেছে, মরেছে কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী, উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীতে ঠিক এই সময়, সেপ্টেম্বর মাসে, কখনও জল, কখনও রোদ ঠিকই চলছে। আজকের মতো, সতেরশ তিরাশি সালেও জলঝড় এমনি ছিল এবং এমনি এক জলঝড়ের দিনে রাইটার চার্লস ম্যাকিনটশের কলকাতায় প্রবেশ।

৩

সারা রাত জাহাজের দোলায় দুলতে থাকে চার্লস ম্যাকিনটশ। স্বপ্নে কখনও তার জাহাজ ঝড়ে পড়ে যেমন জিব্রাল্টারের মুখে পড়েছিল, আবার ভারত মহাসাগরের প্রবল তরঙ্গাঘাতে দোল খায়। একা বিরাট হলের এক কোণে মস্ত উঁচু মেহগিনি কাঠের পালঙ্ক জাহাজে রূপ নেয়। মাঝে মাঝে মেঘ গুড় গুড় করে, বৃষ্টির ছাট আসে বারান্দায়। চোবদার রামসিং রোহিলখণ্ডের মানুষ। বাইরে বর্শা কাঁধে ঝিমোয় আর মাঝে মাঝে হাঁকে, 'হঠ যাও, হঠ যাও!' পোঁ পোঁ করে মশা ওড়ে। আর চড়াৎ চড়াৎ করে রামসিংয়ের চাপড়ের শব্দ আসে। কিন্তু স্বপ্নে কলকাতার স্থান নেই। সেখানে ক্যাপ্টেন নর্টন তার ছুঁচলো দাড়ি নিয়ে জাহাজের গলুইতে দাঁড়িয়ে, মিস্ ক্র্যাফটনের গলা বাজে, 'মাই প্যারাসোল! মাই প্যারাসোল!'

গঙ্গার ধারে নতুন কাছারিবাড়ি থেকে সকাল সাতটার ঘণ্টা পড়তেই চার্লসের ঘুম ভাঙে। জানলায় পোকামাকড়, মশা আটকাবার জাল-আঁটা। ঘাড়ে গুড়া-পোকার দাঁড়ায় ঘা হয়ে তার কাকাকে খুব ভুগতে হয়েছিল। জানলায় ঢাকাই

মসলিনের ট্যাপেস্ট্রি, তাতে বোধ হয় ফরাসি প্রিন্ট—ফ্লুটবাদনরত মেষপালক ও মেষপাল। দেয়ালে কর্তাদের মস্ত মস্ত তৈলচিত্র। নিচে টানাহাতের কারুকার্যে লেখা কয়েকটা নাম। চার্লস চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে—হ্যারি ভেরেলস্ট, জন কার্টিয়ের, কর্নেল রিচার্ড স্মিথ, ফ্রান্সিস সাইক্স, রিচার্ড বেশের। এরা ক্লাইভের সময় সিলেক্ট কমিটির সভ্য ছিল না? আর একখানা স্বতন্ত্র তৈলচিত্রে স্যার ইলাইজা ইমপে তার দিকে প্রচণ্ড আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে চেয়ে আছে।

বাথরুমে যাবে কি যাবে না চার্লস ভাবছিল, এমন সময় গেট খুলবার শব্দ আসে। কারা যেন সামনের লম্বা বারান্দায় উঠে আসছে। চওড়া বারান্দার এক কোণে একটা পালিশহীন ন্যাড়া টেবিল. তার ওপর কাগজপত্তর। নিচে শীতলপাটি, সেখানে কারা এসে যেন বসেছে। বোধ হয় মুন্সি আর সরকার। রান্নাঘরের দিকে পদধ্বনি। বোধ হয় বাবুর্চি আর তার সাঙ্গপাঙ্গ। রামসিংয়ের ডিউটি এখন ওভার। আরও চোবদার বোধ হয় এল। বারান্দার এক কোণে তাদের ভারি বন্দুক ও বল্লম রাখার আওয়াজ আসে। চার্লস দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলে, এই-সব ঝামেলার মুখে কি না গেলেই হত না? কাল যখন পাল্কিতে তুলে ব্যানিয়ান গোকুল পাশে রাখা ছোট রুপোর গড়গড়ার নলটা হাতে তুলে দিয়ে বললে, 'লাভলি স্যার, লাভলি, টেক ইট', তখনই এক অবাস্তব স্বর্গরাজ্যে তার মতো সাধারণ মর্তবাসীর প্রবেশে প্রায় এক আত্মিক বিদ্রোহ এসেছিল। এইভাবে আটটা লোকের ঘাড়ে চেপে যাওয়ার চেয়ে কি ঘোড়ায় চেপে বা হেঁটে যাওয়াও স্বাভাবিক নয়? এক-একবার ভয়ও হয়েছিল, যদি উল্টে যায়, কিন্তু তার সামান্য সম্ভাবনা যে নেই কিছুক্ষণ যেতেই বুঝেছিল। এমনকি ঘাড় বদলানোর সময় বেহারারা এত সতর্ক যে সামান্য দোলও খায় নি পাল্কি। কিন্তু এ তারা কী করছে? ভারতবর্ষে এক নবাবের বদলে আর এক নবাব আর তার পারিষদদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করছে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টাউনসেণ্ড কোম্পানির অন্ধকার কালো কাঠের ঝুলভরা অপরিষ্কার বাড়িটা তার চোখের সামনে জেগে ওঠে। ছেলেবেলায় স্কুলপাঠ্যে ইংল্যাণ্ডের অনেক বৈভবের কথা সে পড়েছে কিন্তু নাগরিক জীবন, অন্ততঃ লণ্ডন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে-জীবন সে পালন করেছে, তা ক্রমশঃই যেন ক্লিন্ন, দরিদ্র। আর একটু বড় হলেই সে শুনেছে, ইংরেজকে বাঁচতে হলে এবং ইংল্যাণ্ডকে বাঁচাতে হলে ইংরেজকে স্বদেশ ত্যাগ করতে হবে। তাছাড়া ফ্রান্সের সঙ্গে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবং প্রতিবেশীর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিতে ইংল্যাণ্ড এমন কোণঠাসা

যে তার মতো ঘরকুনো লোককেও ঘর ছাড়তে হয়েছে এবং বিকল্প কোনো পথ নেই। তার চেয়ে কাকার কথামতো চলাই ভালো নয় কি? দশ-বারটা বছর যদি দাঁত চেপে কাটিয়ে দেওয়া যায় তা হলে স্বদেশে আবার নতুন জীবন। কাকার মতো সেও বাড়ি কিনবে, বাটলার রাখবে, পার্লামেণ্টের সদস্য হয়ে, হয়ত মিস্ ক্ল্যাফটনের মতো সুন্দরী বৌ—পেটাঘড়িতে ঢং করে সাড়ে সাতটা বাজে। লণ্ডনে সে সাড়ে আটটায় উঠত, কোনোদিন শীত বেশি পড়লে দশটাও বেজে যেত। তবে আজ প্রথম দিন। তা ছাড়া কয়েক মিনিট হল তলপেটে বেশ চাপ বোধ করছে। বরাবর তার কোষ্ঠকাঠিন্য, ইণ্ডিয়াতে এসে কাটতে পারে। রাইটার ম্যাকিনটশ আত্মচিন্তায় মগ্ন হয়ে কমোডে বসে।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে শরীরটা তার বেশ ঝরঝরে লাগে। জাহাজে কোষ্ঠকাঠিন্য বেড়ে গিয়েছিল, তারপর বঙ্গোপসাগরে কয়েকদিন ক্রমাগত বমি, মাথা ভার। টেবিলের ওপর নতুন 'গেজেট'। গঙ্গাতীরে নতুন ফোর্ট উইলিয়ামের চিত্রসহ বিবরণ। রিপোর্টার লিখেছেন—নবাবের কলকাতা আক্রমণের অভিজ্ঞতায় কোম্পানি আজ ঠেকে শিখেছে যে ঘিঞ্জির মধ্যে দুর্গের অসুবিধা অনেক। কারণ অনেক প্রাইভেট বাড়ির মাথায় কামান বসিয়ে তোপ দাগতে হয়েছিল, সৈন্যদের দৃষ্টি ছিল আবৃত। কিছু বুঝবার আগেই বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে নবাবের অশ্বারোহী ঢুকে পড়ে এবং তখন আত্মরক্ষার উপায় থাকে না। এই-সব বিবেচনা করে এখন আরও দক্ষিণ দিকে খোলামেলায় গড় স্থাপন করা হয়েছে। কোম্পানির অনেক কর্মচারী আগে গড়ের মধ্যেই ছিলেন কিন্তু এখন ইংরেজ পতাকা সারা চব্বিশ পরগণায় শুধু নয়, ক্রমশঃ আরও এলাকায় উড্ডীন হতে চলেছে। কাজেই তাঁরা গড়ের বাইরে অনায়াসে থাকতে পারেন। তবে সাবধান, ব্ল্যাক টাউনের ভেতরে না থাকাই ভালো। কারণ সচরাচর শান্তিপ্রিয় নেটিভদের মধ্যে কেউ কেউ আজকাল বিপথগামী হয়েছে। তা ছাড়া কলকাতার আশেপাশে ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। গত শনিবার এই ডাকাতদের সঙ্গে মোকাবিলায় একজন কোম্পানির অফিসার এবং একজন দিশি সিপাইয়ের মৃত্যু হয়েছে। কাজেই বাঘ শিকারের জন্যে ইংরেজ অধিবাসীদের শহর থেকে খুব দূরে না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় রিপোর্টে কলকাতায় কলেরার প্রাদুর্ভাব এবং জল ফুটিয়ে খাবার জন্যে নির্দেশ। একমাত্র সুরক্ষিত ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের জলই নিরাপদ। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের জলের ওপর একটা রিপোর্টও চার্লস মন দিয়ে পড়ে। রিপোর্টার লিখেছেন, হিন্দুরা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ব্রাহ্মণরা যা

বলে তাই তাদের কাছে একমাত্র মান্য। কাজেই ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের জল সুপেয় হওয়া সত্ত্বেও তা তাদের পানের অযোগ্য, কারণ ম্লেচ্ছের স্পর্শদোষে তা দুষ্ট। তবে আনন্দের কথা এই কুসংস্কার ভেঙে পড়েছে। সম্পন্ন কলিকাতার ব্যানিয়ানবাবু, সরকার ও তাদের কর্মচারীরা বোধ হয় সরকারের সুনজরে থাকার জন্যে এই জলপানে হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। তার ফলে এক মশক জল এক পয়সার বদলে দু পয়সায় বিক্রি হচ্ছে।

নীল চাষের ওপর আর-একটি বিবরণও চিত্তাকর্ষক। চোরাপথে হাজার হাজার পেটি বাংলাদেশের নীল ফ্রান্সকে নীলাভ করে তুলেছে। কর্তৃপক্ষ প্রচণ্ড বাধা দিয়েও চোরাচালানকারীদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। ফ্রান্সের পতাকা থেকে, তাদের ইউনিফর্ম এবং মহিলাদের পেটিকোটেও বাংলাদেশের নীল। হায়দার আলির সঙ্গে ক্রমাগত রক্তক্ষয়ী ও অসমযুদ্ধে কোম্পানীর যে অজস্র খরচ তার একমাত্র সুরাহা আরও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষ ও নীল রপ্তানি। বস্তুতঃ 'ফরেন ইউরোপে' নীল এবং চীনে আফিং রপ্তানি কোম্পানির মূল বাণিজ্যনীতি হওয়া প্রয়োজন। তারপর সেন্ট জনস চার্চে এক প্রার্থনার বিবরণ। পেছনের পাতায় শিপিং ইন্টেলিজেন্স, আগামী এক মাসে কলকাতা থেকে লণ্ডন সমুদ্রযাত্রায় জাহাজের নাম ও সময়। তাছাড়া কয়েকটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয় চার্লস ম্যাকিনটশ। এরকম বিজ্ঞাপন সে স্বদেশে পড়ে নি।

Wanted—A Coffree boy; any person desirous of disposing of such a boy and can warrant him a faithful and honest servant, will please apply to the printer.

Strayed—From the house of Mr. Robert Duncan in the China Bazar on Thursday last, a Coffree girl about 14 year old, named Indu; whoever brings back the same shall receive reward of one gold mohur.

To be sold—A fine Coffree boy that understands the business of a butler, Kitmutgar and cooking. Price three hundred Sicca rupees. Any gentleman wanting such a servant may see him and be informed of further particulars from the printer.

এরপর ফরাসি চন্দননগর থেকে বিশেষ সংবাদদাতার রিপোর্ট: We under-

stand Monsieur Montigny, Governor of Chandernagore, has lately issued a proclamation prohibiting all persons within the jurisdiction of the French Government from purchasing or transporting any of the natives of these provinces as slaves. To prevent this infamous practice a reward of forty rupees is offered to any person who shall give the information about the offender, besides the sum of ten rupees to be given to each slave who shall be released in consequence.

এখন খুব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। গতকাল গঙ্গাবক্ষে দু নৌকা-ভর্তি ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী, অবসন্ন ঘুমন্ত মুখে দুপুরের রোদ, বালকের বিলাপ। অস্পষ্টভাবে সেও শুনেছে তার কাকা এবং কাকার বন্ধু ম্যাকডাওয়েলও এই বাণিজ্যে লিপ্ত। কারণ ক্রীতদাস, ইণ্ডিগো, আফিং, কটন পিস গুডস্, কোম্পানির চোখে সব এক। রাইটার ম্যাকিনটশ বিহ্বলভাবে চেয়ে থাকে প্রধান বিচারপতি স্যার ইলাইজা ইম্পের স্পর্ধিত দৃষ্টির দিকে। স্বদেশ ত্যাগের আগে তার কাকা তাকে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল—আমরা শুধু ইংল্যাণ্ডের পতাকাই ভারতবর্ষের মাটিতে পুঁততে চাই না, আমরা ইংল্যাণ্ডের আইন-আদালত, সভ্যতা সমস্তই প্রবর্তন করতে চাই যাতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। দরজার কাছে হঠাৎ ফুসুর-ফুসুর গুজুর-গুজুর আওয়াজ আসে। কতকগুলো লোক একসঙ্গে কথা বলছে। বিছানায় শুয়ে কাগজ পড়ার অভ্যাসটা তার ইংল্যাণ্ডেই ছিল। আজ বিছানায় বসে বসে গেজেট পড়তে বেশ আরাম লাগে। চার্লস ম্যাকিনটশ ঠিক স্পষ্ট করে বুঝতে পারে না কিন্তু তার কাকা যে রাস্তা ধরে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্টে উপস্থিত হয়েছে সে পথ বড্ড দুস্তর দুর্গম লাগে। ঠিক এই সময় কাছারি থেকে আটটার ঘড়ি পেটার আওয়াজ আসে এবং মুহূর্তে দরজার কাছে অস্পষ্ট আওয়াজ একটা প্রকাণ্ড কলরব হয়ে তার ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ে।

প্রথমেই ঢোকে হেড-জমাদার ও বেয়ারারা, মেঝের দিকে অনেকখানি মাথা ঝুঁকিয়ে তিনবার কুর্নিশ করতে করতে তাদের প্রবেশ। দীর্ঘ শক্ত দেহ, দুজনেই রোহিলখণ্ডের মানুষ, তাদের মাথায় রঙিন পাগড়ি, সবুজ কুর্তার ওপর লাল মখমলের কোমরবন্ধ। এরপর বেনারসের রাজার সভা থেকে আগত দুজন

চোপদার, গতকাল ভারি বল্লম কাঁধে তারা পাল্কির সামনে ছিল। হুঁকোবরদার ও খানসামার মাথায় সাদা টুপি, ছাগলদাড়ি, তাছাড়া সরকার, হরকরা, মুন্সি, এরা বঙ্গদেশীয়, প্রত্যেকেরই কোমরবন্ধ বিভিন্ন পেশানির্দেশক—লাল, বেগুনি, নীল, গাঢ় হলুদ, কমলা হলুদ, কালচে সবুজ। চোপদারদের কানে মাকড়ি, চোখে সুরমা। মুন্সির গায়ে ধবধবে সাদা লম্বা গলাবন্ধ, হরকরার গলায় কণ্ঠি। প্রায় প্রত্যেকেই বেশ বলবান এবং যে-কথাটা অস্পষ্টভাবে ম্যাকিনটশের মনে হয়, প্রত্যেকের গায়েই নবাবি আমলের গন্ধ। তার কাকা যাই ভাবুক, ইংরেজরা এখনও দেওয়ান, ভারতবর্ষ কি কোনোদিন ইংরেজদের আওতায় আসবে যেখানে এত কোটি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মানুষের বাস?

এ-সব চিন্তা শেষ হতে না হতেই সকলের কুর্নিশের পালা সাঙ্গ এবং একই সঙ্গে তিন-চারজন মানুষের প্রসারিত হাত তার দিকে। একজন তার সবল হাত দুখানা দিয়ে সাহেবের লম্বা ড্রয়ার আলগা করে, আর একজন হাঁটু গেড়ে বসে তার পা থেকে ড্রয়ার খুলে নেয়। একই প্রক্রিয়ায় তার বক্ষদেশ অনাবৃত এবং তাকে বিশেষ স্থান পরিবর্তন না করিয়েই একে একে ধোয়া ধবধবে সার্ট, ব্রিচেস, লম্বা মোজা, স্লিপার পরিয়ে দেওয়া হয়। তার ঘাড়ে পিঠে পশ্চাদ্দেশে তল-পেটে সর্বত্র অপরিচিত ভারতীয় আঙুল খেলা করে। স্ট্যাচুর মতো বসে থাকে চার্লস ম্যাকিনটশ। এরপর নাপিত আসে। অবলীলাক্রমে ম্যাকিনটশের আঙুলগুলো টেনে নখ কাটতে থাকে। বলতে নেই দিন পনের কুড়ি নখ না কাটায় বড় বড় নখের গোড়ায় নীল ময়লা জমেছিল। এরপর একটা বড় মাটির গামলা একজন মুখের নিচে ধরে এবং সাবানের ফেনায় তার গাল ভরে যায়। পুতুলের মতো চুপচাপ বসে থাকার সময় তার গাল চকচকে ঝকঝকে হয়ে ওঠে। আর একটা বড় গামলা ও তোয়ালে হাতে নাপিতের পেছনে একজন। সে তার আঙুল আর মুখে জল ঢেলে তোয়ালে দিয়ে ঘসে ঘসে মুখ সাফ করে। এরপর সাহেবকে উঠিয়ে দাঁড় করানো হয় এবং পার্শ্ববর্তী ডাইনিং হলে ম্যাকিনটশ পৌঁছয় যন্ত্রচালিতের মতো। প্রাতরাশ প্রায় শেষ করে চায়ে চুমুক দিতে শুরু করলেই পেছন থেকে একজন হাঁটু গেড়ে নিচু হয়ে তার ঠোঁটের কাছে গড়গড়ার নল এগিয়ে দেয়। হুঁকোবরদারের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয় হেয়ার-ড্রেসার ঢুকেছিল। জার্মান ফরাসি সুগন্ধি বোতল থেকে ওডিকোলোন ও পমেটম মাখানো হয় তার চুলে কাঁধে। তারপর সুনিপুণ আঙুলের কসরৎ চলতে থাকে তার মাথায় ঘাড়ে। চমৎকার আবেশে আবিষ্ট হয়ে থাকে চার্লস

ম্যাকিনটশ। মাঝে মাঝে গুড়ুক-গুড়ুক করে গড়গড়ায় টান দেয়।

'গুড মর্ণিং স্যার', গোকুল মুখোপাধ্যায় নিচু হয়ে অভিবাদন করে।

'গুড মর্ণিং গোকুল'।

'রেডি স্যার?'

'ইয়েস রেডি।'

বাইরে অপেক্ষমান দু-রকমের দুটো পাল্কি। পরবর্তীকালে অবলুপ্ত মেজানা, ছোট চ্যাপ্টা হাল্কা গোলাকৃতি, সাদা ফরাশ আর বালিশ, এতে পা গুটিয়ে দিশি কায়দায় বসতে হয়, পেছনে সাহেবের জন্যে লম্বা চওড়া বাক্স-পাল্কি যাতে দীর্ঘাকৃতি মানুষও পা ছড়িয়ে বসে গড়গড়া সেবনে মগ্ন থাকতে পাবে। দুটোই কারুকার্যমণ্ডিত। ব্যানিয়ানের পাল্কিতে রুপোর বেঁকানো হাতল।

তখনও স্ট্র্যান্ড রোড বসে নি। গঙ্গার ধারে ধারে কাপড় মসলিনের ব্যবসায়ীদের নতুন নতুন বাড়ি ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জায়গীরদারদের বাড়ি ওঠার ধুম পড়েছে। মাঝে মাঝে অবশ্য ঘন জঙ্গল। তার মাঝখান দিয়ে সর্পিল গতিতে পাল্কিবাহকেরা পথ করে নেয়। একবার চার্লস ম্যাকিনটশের নাকের কাছে বাতাবিলেবু এমনভাবে ঝুলতে থাকে যে, হাত বাড়ালেই ছিঁড়ে নেওয়া যায়। ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কাছে অবশ্য অনেকখানি খোলা মাঠ। গেটের সামনে দশ-বারখানা ঘোড়ার গাড়ি, গরুতে টানা রথ, গাড়ির ছুই চুড়ো-করা মন্দিরের মতো। গেটের সামনে ভিস্তিদের ভিড়, চেঁচামেচি, কয়েকজন পর্তুগিজ নাবিক, তাদের গায়ে কালো আঁট কুর্তা, মাথায় ছুঁচলো কালো টুপি। জমিদারদের পুরনো আমলের পুকুরটা সম্প্রতি আবার খোঁড়া হয়েছে, লম্বা সদ্যানির্মিত সিঁড়ির ধাপে গাদা বন্দুক হাতে তলোয়ার ঝুলিয়ে দুজন সান্ত্রী। আবার কিছু দূর এগিয়ে সার সার খড়ের বাড়ি, একটা বাড়ির সামনে দীর্ঘদেহ এক সাধু দুই হাত আকাশে তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যানিয়ান চিৎকার করে বলে, 'ঊর্ধ্ববাহু স্যার', কিন্তু হাওয়ায় কথা ভেসে যায়। খড়ের ঘরের দাওয়ায় একজন স্বাস্থ্যবান যুবক অনাবৃত গায়ে বীণ বাজায়। বীণে ভোরের সুর চার্লসকে যেমন আকৃষ্ট করে তেমনি প্রবল অপরিচিত জগতের সুদূরতা তার বুকে ভার হয়ে থাকে।

ট্যাঙ্ক স্কোয়ারের কিছুটা দক্ষিণে চারপাশে জংলায় এই খড়ের বাড়ি এবং তারই মধ্যে এক বীণাবাদনরত যুবক। তার এই সাতসকালে বসে তন্ময় হয়ে ভোরের আলাপে মগ্ন থাকায় এক চমৎকার বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়। চারপাশে কোম্পানি

আমলাদের ব্যস্ততা আর তার পাশে এই তন্ময় বীণাবাদনরত যুবক—যেন কলকাতার নতুন কর্মকাণ্ডের কোনো মানে নেই, তা কিছুতেই ভারতবর্ষের এই লক্ষ লক্ষ গ্রামে একাকার চৈতন্যাগ্রে সামান্য টালও খাওয়াতে পারবে না। চার্লস অবশ্য এই সব ভাবনা খুব স্পষ্টভাবে ভাবতে পারেনি কিন্তু এই শহরের মাঝখানেই, বলা যায় প্রাণকেন্দ্রে বাঁশবন, খড়ের বাড়ি ও বীণে ভোরের আলাপ তার মনটা ভারি করে তোলে। চারদিকে হাওয়া উঠেছে—ইউনিয়ন জ্যাকের তলায় মানুষরা কেমন হবে ? তারা কি কর্মপটু ব্যানিয়ান গোকুল মুখোপাধ্যায়ের মতো হবে, না এই বীণাবাদনরত অনাবৃতদেহ তরুণটির মতো হবে ?

বাঁশবন পেরলেই ফাঁকা এবং নবনির্মিত ফোর্ট উইলিয়ামের সারি সারি ব্যারাক গুদামের মাঝখানে সেণ্ট অ্যান চার্চের চুড়ো তখনও অক্ষত, একই সঙ্গে গঙ্গাবক্ষে বাণিজ্য ও রণতরীর অগণিত মাস্তুল এবং এসপ্ল্যানেডে কোম্পানি অফিসিয়াল-দের সুরম্য বাড়ির-সারি। হঠাৎ তড়বড় করে একজোড়া ইংরেজ অশ্বারোহী-সমেত একেবারে তাদের পাল্কির গায়ে এসে পড়ে। গোকুল চিৎকার করে ওঠে, চোপদার হাঁক দেয়, চারপাশে আরও পাল্কি, ঘোড়া, রথ, চৌপাল, ডুলি, এক্কা। শহরের প্রাণকেন্দ্রে তারা উপস্থিত। বেহারারা হাঁটার কদম বাড়িয়ে দিয়েছে, একটানা মুখ দিয়ে আওয়াজ করতে করতে প্রায় ছুটছে, এক পাল্কি আর-এক পাল্কির সঙ্গে রেস দিচ্ছে। এক ঘোড়া আর-এক ঘোড়াকে ওভারটেক করছে। বীণের আলাপ একেবারে উবে যায় চার্লস ম্যাকিনটশের মন থেকে। পাল্কির আয়নায় নিচু হয়ে নিজের মুখখানা দেখে, একটি সজীব তেইশ বছরের মুখ, প্রায় ঘাড় পর্যন্ত বাবরি, হলুদ ফুলকাটা লাল মখমলের কুর্তা। গভর্নর-জেনা-রেলের তরুণ বয়সেও কি অবিকল এই চেহারা ছিল না ?

'ইণ্ডিয়া ইজ এ গোল্ডমাইন', ইয়াংম্যান', প্রথম সম্ভাষণেই তাকে জড়িয়ে ধরে ম্যাকডাওয়েল বলে।

'ইয়েস, এ স্ট্রেঞ্জ ল্যাণ্ড। ভেরি স্ট্রেঞ্জ', চার্লস অস্পষ্টভাবে বললে।

এবং জবাব দেবার সময় জানলা দিয়ে তার চোখ পড়ে হাতির ওপর। মাহুতের পেছনেই নেড়ামাথা পৈতে ঝোলানো খালি-গা পুরুতমশাই পিতলের মস্ত ঘড়ায় গঙ্গাজল নিয়ে চলেছেন। তার গায়েই উটের পিঠে আফিং-এর বাক্স, আর্মেনীয় বণিক।

আরকের গন্ধে ভুরভুর ম্যাকডাওয়েল তার বিরাট টাক দুলিয়ে বললে, 'দেয়ার আর মেনি কণ্ট্রাডিকশানস্, বাট আই সে ইট ইজ এ প্যারাডাইস।'

তারপর কোম্পানির দৈবতনীতির ওপর ঝাড়া আধঘণ্টা বক্তৃতা দেয় ম্যাকডাওয়েল এবং মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসাচিহ্ন রাখে, 'হোয়াট ডু ইউ থিংক অফ ইট, ইয়াংম্যান?' ম্যাকডাওয়েলের মূল বক্তব্য ভারতবর্ষ, বিশেষ করে বাংলাদেশ ইংরেজ তরুণদের স্বর্গ। সাধারণ রাইটারের পদে ক্লাইভের আগমন আর তের বছর যেতে-না-যেতেই জেনারেল। আর ক্লাইভ কেন, যত তরুণ রাইটার-ফ্যাক্টর আছে সবাই পাঁচ-সাত বছর যেতে-না-যেতেই লাখপতি।

'আমরা যা মাইনে পাই—'

ম্যাকডাওয়েল ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'মাইনের কথা কে বলছে? কোম্পানির লোকেদের হাতখরচও চলে না মাইনেতে। তোমার যে ব্যানিয়ান, যে তোমাকে ধার দিয়ে খাওয়াচ্ছে, পরাচ্ছে, হাতে, পায়ে চাকর, বরকন্দাজের ব্যবস্থা করেছে সে-ধার তুমি মাইনে দিয়ে শুধবে? তুমি কি পাগল হয়ে গেছ চার্লস?'

'ইংল্যাণ্ডে স্যার আমাদের কার্যকলাপ নিয়ে অনেক কতাবার্তা হচ্ছে।'

'আরে সব টাকা খেয়ে বলছে, সব টাকা। অপোসিশান সুবিধে করতে পাচ্ছে না। কেউ কেউ খিঁচছে, সবাই পারছে না, সেইজন্যে যত গণ্ডগোল। তুমি ভাবতে পারো কি দারুণ দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে কোম্পানি চলেছে, এদিকে ফ্রান্স, ওদিকে হায়দর আলি-মারাঠা—সব একটা লোককে সামলাতে হয়েছে। সব একটা লোক, বিশ্বাস করো. একদিকে যেমন কঠোর আর একদিকে তেমনি কোমল। আর এটা জেনে রাখবে, ম্যানম্যান করলে ইণ্ডিয়াতে থাকতে পারবে না। এর আগের গভর্ণর-জেনারেলগুলো ছিল ম্যাদামারা—ওরা রাজা, ওরা মহারাজা, ওরা জমিদার, ওদেরকে চটাব না, ওদের কাছ থেকে ট্যাক্স নেব না। কাপুরুষরা ইংল্যাণ্ডে থাকবে। কাপুরুষ হলে তুমি টাউনশেণ্ড কোম্পানিতে কেরানি হয়ে সারা জীবন কাটাতে। তুমি কাপুরুষ নও। তুমি ঠিক কারেক্ট ডিসিশান নিয়েছ। হেস্টিংসের আগে যারা ছিল তারা সব ম্যাদামারা। এই দ্যাখো বড্ড বাড় বেড়েছিল চৈৎ সিংয়ের, এখন হেস্টিংস গিয়ে ঠাণ্ডা করে এসেছে। টাকা দেবে না কি? হেস্টিংসের কথা না-মানবে এরকম কারো ঘাড়ে মাথা আছে ইণ্ডিয়াতে?'

'কিন্তু আমরা তা ট্রেডার্স স্যার', আমতা আমতা করে চার্লস বললে।

'ইউ আর টকিং লাইক অ্যান এজেণ্ট অফ ফ্রান্সিস।'

'আই অ্যাম এ হামবল সার্ভেণ্ট অফ দ্য কোম্পানি।' ম্যাকডাওয়েলের রাগ পড়ে যায়। ইণ্ডিয়ার ব্যাপারটা বুঝতে সত্যিই তরুণ ইংরেজদের বেগ পেতে

হয়। বাইরে নবাবের অনুগত ভৃত্যমাত্র, কলকাতা আর চব্বিশ পরগণা অঞ্চলে কিছু বাড়ি-ঘরদোর বানিয়ে ব্যবসা করছি, তোমার ফরমান ছাড়া এক পাও নড়ি না এবং দরকার হলে তোমার ফরমান জাল করে কার্যসিদ্ধি করি এবং সর্বদা তোমার ফৌজদারদের সম্মান দেখাই, কিন্তু তলে তলে আমি তোমার পায়ের নিচের মাটি কেড়ে নিচ্ছি, মুর্শিদাবাদ থেকে কাছারি তুলে এনেছি, জেলায় জেলায় ভারতীয় রাজকর্মচারীদের বরখাস্ত করে ইংরেজ অফিসার বসাচ্ছি। এখন আর দেওয়ানি নয়, রাজ্যশাসনও আমাদের হাতে। নবাব আর তোমার আমলারা আসলে ঠুঁটো জগন্নাথ। এই দুমুখো বৈপ্লবিক নীতি নবনিযুক্ত রাইটারের আয়ত্তের বাইরে। আরে মশাই, যুদ্ধ করতে গেলে টাকা, ব্যবসা করতে গেলে টাকা। টাকা আসবে কি করে? ভিক্ষে করে? নেটিভদের কাছে হাত পেতে? নেটিভদের হাত মুচড়ে টাকা নিতে হবে।

'আমার কি মাঝে মাঝে মনে হয় জানো, আমাদের কোর্ট অফ ডিরেকটার্সদের মধ্যে ফরেন এজেন্ট আছে।'

ম্যাকিনটশ অবাক হয়ে বললে, 'তার মানে?'

'তার মানে বুঝছ না? যে কোন ভালো কাজ গভর্ণর-জেনারেল করবে অমনি বাগড়া আসবে কোর্ট থেকে। তবে দ্য গভর্ণর-জেনারেল ইজ এ গ্রেট ম্যান। তার পাশে, বিশ্বাস কর, ইংল্যাণ্ডের প্রাইম মিনিস্টার একটা লিলিপুট। তবে এবারে শুনছি ব্যাপারটার একটা হেস্ত-নেস্ত করবে হেস্টিংস। কোর্টে এখন হেস্টিংসের লোক আসছে, আর চালাকি চলবে না।

'একটা কথা জিগ্যেস করব স্যার? ফিলিপ ফ্রান্সিস নিয়ে আপনারা এত ভাবিত কেন?'

'কারণ সে একটা বাগড়া মাস্টার, ট্রেটার!' তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'প্রচণ্ড ক্লিকবাজ। ওর এজেন্টরা এ অফিসেও আছে। কি করে কোম্পানিকে আরও দুর্বল করা যায় সব সময় ফন্দি আঁটছে। ওর ভাবখানা, ও যেমন রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান বোঝে তেমন আর কেউ বোঝে না। প্রত্যেকটা ব্যাপারে বাগড়া দেয়, কোর্টের লোকদের সঙ্গে সমানে ক্লিক করছে। বাইরে ইমেজ তৈরি করছে, ব্যাটা যেন একটা চ্যাম্পিয়ন অফ দ্য অপ্রেস্ড। ফ্রান্সিস-এর কথামতো চললে আজ ইংরেজ পতাকা দিকে দিকে উঠত না। নেটিভদের সামনে হাত কচলিয়ে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত ফ্রেঞ্চরা আমাদের কান ধরে তাড়াত।'

ম্যাকডাওয়েল উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে থাকে। 'আর একটা ব্যাপার ইয়াংম্যান, পরিষ্কার বলছি', কাছে এসে বন্ধুর ভাইপোর পিঠে হাত রাখে—যেন একটা বেআইনি কাজে লিপ্ত হবার জন্যে আহ্বান, 'ইংলিশ ল এখানে চলবে না, এটা তোমাকে সর্বান্তেই মেনে নিতে হবে।'

'এখানেও ত ল আছে।'

'ই 'ডয়াতে? তা আছে—' অস্পষ্ট উত্তর আসে। 'ওদের কাজি আছে, পণ্ডিত আছে, কিন্তু আসলে ওসব ম্যাটার করে না। তলোয়ার বল্লম দিয়ে নবাবরা শাসন করত, আমরা বন্দুক দিয়ে শাসন করব।'

আবার উত্তেজিত হয়ে পড়ে ম্যাকডাওয়েল, 'ইংলিশ ল থাকলে তুমি এদেশে বাণিজ্য করতে পারবে? আমরা ইণ্টার্ণাল ট্রেডে হেভি ডিউটি চাপিয়ে দিয়েছি, আমরা নিজেরা ফ্রি। এই ইনইকুয়ালিটি ইংলিশ ল-তে বরদাস্ত করবে না আমরা জানি। অথচ এই ইনইকুয়ালিটি না থাকলে কোম্পানিকে তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। বি প্র্যাকটিক্যাল, বি প্র্যাগমাটিক, বি লাইক ইওর আংকল, চার্লস।'

চাপা অনুনয় ম্যাকডাওয়েলের কণ্ঠে। চার্লস ম্যাকিনটশ সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, '*সার্টেনলি স্যার, সার্টেনলি। আই উইল ডু মাই বেস্ট।*'

ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। সামনে রাস্তার ঠিক মাঝখানে একটা ষাঁড় ধীরে মন্থরগতিতে উঠে দাঁড়ায়। ডুলি পুলওয়ার তাঞ্জামের বেয়ারাগুলো জোর-কদমে পা চালায়। বাগিতে চেপে জনৈক ইংরেজ তরুণ পাশ্বর্বর্তী ইংরেজ তরুণীর মাথায় ছাতা ধরে।

'দিস ব্লাডি রেইন্!'

চড়বড় চড়বড় করে মোটা দানায় বৃষ্টি নামে। দেয়ালঘড়িতে একটা বাজার আওয়াজ আসে।

'গড, উই উইল বি লেট।'

ডক্টর ডিকির বাড়িতে লাঞ্চের ব্যবস্থা। 'চার্লস, ইউ উইল মিট দ্য ক্রিম অফ ক্যালকাটা সোসাইটি।'

'খুব ভালো ডাক্তার?'

ম্যাকডাওয়েল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। 'ডক্টর ডিকি ভালো ডাক্তার—ওর সবচেয়ে আপন বন্ধুও বলবে না চার্লস। তবে ও একজন চমৎকার ট্রেডার। দারুণ ব্রেন। গত পাঁচ বছর মাত্র ও ডাক্তারি ছেড়ে ট্রেডে নেমেছে।

ফ্যাবুলাস টাকা পিটেছে।' তারপর অল্প একটু হেসে বললে, 'তা ছাড়া ডক্টর ডিকির জীবন সম্বন্ধে আগ্রহ খুব বেশি।'

এই হাসির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ইশারা ছিল যা লোকে সহজেই বুঝে নেয়। চার্লস ম্যাকিনটশও হেসে ফেলে। হঠাৎ এক ধরনের হাসি যেন দুজনের বয়সের ব্যবধান ঘুচিয়ে দুজনের মাঝখানে সেতু স্থাপন করে। 'জীবনটা বড্ড একঘেয়ে, জানো চার্লস। আর ইউরোপীয় মহিলা তুমি কোথায় পাচ্ছ? একজনকে ঘিরে মাছির মতো ভন্ ভন্ করছে সবাই। অবশ্য হাফ-কাস্ট পর্তুগীজ মন্দ না। ওদের কালো চুল, কালো চোখ। সাম অফ দেম আর কোয়াইট ফ্যাসসিনেটিং।' একটু থেমে যেন একটু বাধো বাধো ভাবে বললে, 'একটা কথা বলব? তুমি অবশ্য সবে ইংল্যাণ্ড থেকে এসেছ। আমি তোমাকে সাজেস্ট করব, তুমি নেটিভ মেয়েছেলে ট্রাই করো। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হতে পারে। কিরকম একটা গন্ধ আছে গায়ে, একরকম মশলার গন্ধ। কিন্তু তারপর জানো, ঐ গন্ধটার জন্যেই ভালো লাগে।'

ঝমঝম করে একনাগাড়ে বৃষ্টি হবার পরই আকাশ ফর্শা। মাঝে মাঝে গুড়গুড় করে মেঘ ডাকে। একজোড়া চকচকে ঘোড়া লাগানো বাগি সিঁড়ির গায়ে এসে লাগে।

'তুমি আমার বাগিতে এসো।'

'আমার পালকি?'

'ও, দে উইল ফলো।'

ম্যাকডাওয়েলের বাগিটা খুব বাহারে। পিতলের ঝকঝকে বাতিদান। দরজায় চিত্রবিচিত্র কোম্পানির কোট অফ আর্মস। ঘোড়াগুলোর গায়ে ভারতীয় কায়দায় পিতলের ঘুঙুর, রেশমের নিশান। পেছনের পাদানিতে বল্লম হাতে দুজন চোপদার।

'আই গট ইট ফ্রম ইংল্যাণ্ড। টুয়েণ্টি পাউণ্ডস'।

পাঁচ বিঘে জমির ওপর ডক্টর ডিকির গোল থাম আর ভিনিশিয়ান জানলা-শোভিত বাড়ি। একতলায় গুদাম এবং কালো লোহার বাতিদান ও মর্মর নর্তকী-খচিত চওড়া সিঁড়ি। একজোড়া ফিটন, বাগি, গোটা তিনেক পালকি, চৌপালা, সিঁড়ির পেছনে। মেঘের পর রোদ্দুরে ঝলমল করছে পঙ্কের পালিশ। চার্লস ম্যাকিনটশ চোখ বোজে। এত আলো সে আগে কখনো দেখে নি।

মস্ত ওভাল টেবিলের চারপাশে নিশ্চল ভারতীয় খানসামার দল। নিচে চার

কোনায় চারজন হুঁকোবরদার ক্রমাগত ফুঁ দেয় গনগনে আগুনে। ঘরজোড়া মস্ত টানা পাখা। হাওয়ায় আর অস্পষ্ট অন্ধকারে ঘরখানা অনেকটা ঠাণ্ডা। প্রথমেই চোখে পড়ে ক্যাপ্টেন নর্টন, তার পাশে মহিলার দল, একজনের হ্যাণ্ডফ্যানে মুখ ঢাকা পড়েছে। চার্লসের বুকটা হঠাৎ ছলাৎ করে ওঠে। মিস্ ক্র্যাফটন না ?

ডক্টর ডিকি চিৎকার করে স্বাগত জানায়, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, এ নিউ অ্যাডভেঞ্চার ইন দ্য ল্যাণ্ড অফ প্যারাডাইস।'

সবাই মুখ ফিরিয়ে তাকায়, মিস ক্র্যাফটনও। তার সঙ্গে সেই চোর মহিলাও আছে।

মেজর ফাউলারও এগিয়ে আসে। তিনিও চার্লসের কাকার বিশিষ্ট বন্ধু।

'ওয়েলকাম ইয়ংম্যান', জাঁদরেল গোঁফ, গম্ভীর গমগমে গলা ভদ্রলোকের।

'আমরা কি ইণ্ডিয়াতে এসেছি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারি খোলার জন্যে।' ডক্টর ডিকি সুরু করলেন। ছোটখাটো চটপটে চেহারা। মিসেস ডিকির মাথা নেড়া, গরম সহ্য করতে পারেন না। নেড়ামাথা ঢেকেছেন মুক্তাখচিত ফরাসি ভেল দিয়ে।

'ডোণ্ট গেট একসাইটেড মাই ডিয়ার।' স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দেয়, 'ইউ উইল গেট দ্য বাইল।'

ক্যাপ্টেন নর্টন আলোচনাচক্রে যোগ দেয়। 'কাল জাহাজ থেকে নেমেই আমি স্ট্রেট কৃষ্ণগোপালের বাড়ি যাই। সাংঘাতিক ডিনার দিলে মশাই।' একটু থেমে বললে, 'হি লুক্‌ড লাইক এ কাউন্সিল মেম্বার।

গতকালও কৃষ্ণগোপাল দে-র বৈভব নর্টনের মনে দাগা দিয়েছে। বারে বারে এক কথা বলে, 'ফ্যানটাস্টিক্যালি রিচ।'

ম্যাকডাওয়েল বললে 'ওদেরকে যদি আমরা একছত্র ট্রেড করতে দিই তাহলে আমাদের তল্পিতল্পা গোটাতে হবে। ইংল্যাণ্ডের ডিরেক্টারগুলো মাথা-মোটা। আমার দুঃখ হয় কিসে জানো ?' বলে অপেক্ষমান ওয়েটারের ট্রে-কে ম্যাডেইরার বোতল থেকে পানীয় ঢালে ম্যাকডাওয়েল। 'আমার সবচেয়ে দাগা লাগে যখন দেখি ডিরেক্টারদের চাপে আমাদের গভর্ণর-জেনারেলও যেন একটু একটু টলছে। আমরা নাকি খুব অত্যাচার করছি নেটিভদের ওপর', চোঁ করে আধখানা গ্লাস খালি করে বললে, 'আমি ত ভাবছি কবে সেই দিন আসবে যখন কৃষ্ণগোপালরা বুড়ো আঙুল চুষবে। আর এই বেঙ্গল কটন,

বেঙ্গল সিল্ক, ঢাকাই মসলিন-এর এজেন্ট হয়ে আমরা কদ্দিন থাকব ?'
কথা বলতে বলতে সে আরো উত্তেজিত হয়ে পড়ে। অনাগত ভবিষ্যৎ যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পায়। ইংল্যান্ড থেকে জাহাজ ভর্তি করে তৈরি মাল তারা এখানে আনছে, আর কৃষ্ণগোপালরা সেই পেটি নামাচ্ছে। সেদিন কবে আসবে ? নীচু গলায় বললে ফিসফিস করে, 'আমাদের কোম্পানির ট্রেড আর প্রাইভেট ট্রেড—খুব কি ফারাক আছে এ-দুটোর মধ্যে ?'
ম্যাকডাওয়েলের যুক্তি দুর্বোধ্য ঠেকে মেজর ফাউলারের কাছে। 'ইউ আর টু সাটল, জিম' ভারী গমগমে গলায় বলে।

'দিস ইজ নট এনাফ, দিস ইজ নট এনাফ,' গেলাস খালি করে ম্যাকডাওয়েল বলে তার মোটা আঙুলগুলো তুলে। 'ওদের হাত-পা আমরা বেঁধে দিয়েছি ঠিক। লাস্ট উইন্টারে ঢাকায় গিয়েছিলাম। দেখি, মসলিনের তাঁতীরা কাজ ছেড়ে দিচ্ছে। কারণ এত ট্যাক্স চাপছে যে, বিক্রি করে লোকসান হচ্ছে। আমি বলি? এই ত সময়।' আরো উৎসাহের সঙ্গে বলে, 'গোল্ডেন অপারচুনিটি !'
'আচ্ছা, তোমাদের হল কি ! সব সময় বিজনেস, সব সময় বিজনেস'। ইয়াংম্যান তুমি এদিকে এসো', মিষ্টি হেসে মুক্তো ঝলমলে মিসেস ডিকি চার্লস ম্যাকিনটশের হাত ধরে।
মহিলা প্রচণ্ড মুটিয়েছে, তবে আগে সে ছিল সুন্দরী। ফরাসী সেন্টের গন্ধে ভুরভুর মুখখানা তুলে বললে, 'কাম টু আওয়ার বাজরো দিস ইভনিং। উই উইল হ্যাভ নচ গার্লস দেয়ার।'
তারপর বিস্টলি ওয়েদার সম্পর্কে অনেকক্ষণ সে বলে। এখন তো তার নিজের ত্বককে নিজের বলেই বিশ্বাস হয় না। বছরের পর বছর যদি ঘামে সেদ্ধ হতে হয়, গরমে পচতে হয়, তা হলে কি চেহারা থাকে ? নইলে কি তার 'ফেমাস কার্লস' বাধ্য হয়ে ফেলে দেয় ? অসম্ভব ! মাথায় চুল রাখা অসম্ভব। এক একবার তার সাধ হয় চুল ছোট করে পুরুষের মতো ছাঁটে। এখানকার নেটিভ মহিলারা কি করে এত লম্বা চুল রাখে ভেবে পায় না। অবশ্য নেটিভরা সব পারে। দরকার হলে 'দে ক্যান গো নেকেড।'
তারপর শুটিং পার্টিতে চার্লসকে নিমন্ত্রণ জানায় সে, 'ডিড ইউ নো, জিম হ্যাজ ব্যাগড্ থ্রি টাইগার্স ?'
আবার ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। মেঘ ডাকে। 'লুক অ্যাট দিস বিস্টলি ওয়েদার ! লাস্ট সান্ডে উই ওয়্যের কট ইন পোরিং রেইন।'

বলতে না বলতেই রুমালে ছিঁক করে হাঁচল চার্লসের শুভাকাঙ্ক্ষিণী। 'নেভার গো আউট ইন দ্য সান উইদাউট এ হ্যাট। ইউ মাস্ট গেট এ সোলা টোপী।' কিছুক্ষণ পরে বলল, 'ইউ মাস্ট মিট মিস্ বেইলি অ্যাট দি বারলোজ। শি ইজ সো প্রিটি। অ্যান্ড মাইন্ড, শি ইজ সো কালচার্ড।'

টেবিলে খাবার দেওয়া হয়েছে। গৃহকর্ত্রী সকলকে আহ্বান জানায়। চার্লসকে পাশে বসায়। প্রচুর খাবার এবং সবাই প্রচুর খায় এবং প্রচুর টানে। পোলাও, কাবাব, হাল্কা কষা মাটন, মনাক্কা, শুকনো আঙুর, পোরা মোরগ, আমের চাটনি, সব। তা ছাড়া প্লেটে প্লেটে চুড়োকরা পেস্তা-বাদাম, কিসমিস, আখরোট। ম্যাডেইরা, ক্ল্যারেট, হোয়াইট ওয়াইন, রেড ওয়াইন, রেনিশ ওয়াইনের বান ডাকে। হুঁকোবরদার কখন পেছন থেকে টুক করে তারই মুখের কাছে রুপোর নলটি ধরেছিল। খেয়াল নেই। গুড়ুক গুড়ুক করে চার্লস। রুপোর থালায় সোনালি রাংতামোড়া পানের ট্রে থেকে কোনো কোনো অতিথি পান তুলে নেন।

'ডোণ্ট ট্রাই দ্যাট নাউ। ইউ উইল লাইক ইট গ্র্যাজুয়ালি।' মাসীসুলভ সাবধানবাণী শোনায় মিসেস ডিকি।

চারদিকে উত্তেজিত কথাবার্তা, মহিলাদের ঢলানি, হেসে গড়িয়ে পড়া। ফিলিপ ফ্রান্সিসের ষড়যন্ত্র, মনস্টার হায়দার আলি, কৃষ্ণগোপালের ফ্যানটাস্টিক টাকা, মাথামোটা ডিরেক্টারদের আজগুবি হুকুম—এক হাজার টাকার বেশি উপঢৌকন নেবে না। রামজানীদের মধ্যে গহর জানের নাচ, গভর্ণর-জেনারেলের স্ত্রীর হীরের নেকলেস—এই সমস্ত প্রসঙ্গ চার্লস ম্যাকিনটশের আশেপাশে টানাপাখার হাওয়ায় উড়ে বেড়ায়। একটু একটু করে তার আত্ম-সচেতনতা কাটতে থাকে। অত চুলচেরা বিচার করে দেখার অভ্যাস তাকে ছাড়তে হবে। সত্যিই ত নাচতে গিয়ে ঘোমটা দেয়ার কি মানে। এই সব পোড়খাওয়া মানুষের অভিজ্ঞতা কি দামী নয়, দামী কেবল হাজার হাজার মাইল দূরে বসে থাকা কিছু মানুষের কিছু বায়বীয় লিবেরাল চিন্তা? তা ছাড়া কোম্পানি থেকে ইংল্যান্ডের এক্সচেকারে টাকা আদায় করার ব্যাপারে চাপ দিতে ত ইংল্যান্ডের সরকার পরোয়া করেন না। তবে? তবে?

এবার পানীয়ের বোতল তুলে নেয়ার পালা। ম্যাডেইরার বোতল থেকে চার্লসের শূন্য গ্লাসে পানীয় ঢালতে ঢালতে মেজর প্রাউডেন বললেন, 'টেক সাম মোর। দিস ইজ গুড ফর ইয়োর ডাইজেশ্যান।'

৫

ফেরার সময় পালকির দোলানিতে চোখ টেনে এসেছিল চার্লস ম্যাকিনটশের। তবে একটা ব্যাপার ক্রমাগত নজরে পড়ায় তার তন্দ্রা ভেঙে যায়। সাহেবপাড়া একেবারে খাঁ খাঁ. মাঝে মাঝে এক-আধটা নেটিভদের পাল্কি, ডুলি, কিন্তু একটিও ইউরোপীয় চোখে পড়ে না কারণ এখন সাহেবদের দিবানিদ্রার সময়। তিনটে থেকে পাঁচটা যে যার বাড়িতে নিদ্রামগ্ন। গঙ্গার ধারে পাল্কি ঘুরতে বিচিত্র শোভা চোখে পড়ে। নীল আকাশ জুড়ে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ। আর তার নীচে রকমারি নৌকোর সারি। পাল্কি রুখে বেরিয়ে আসে চার্লস। নৌকোগুলোর আশ্চর্য রকমারি গড়ন তাকে বিস্মিত করে। এত রকমারি নৌকো সে আগে কখনো দেখেনি। লম্বা ছুঁচলো পিনিশ আর ভাওলিয়া, একজন বেয়ারা হাত-পা নেড়ে বোঝায় যে, লক্ষ্মৌ থেকে কলকাতা আটশো মাইল এ নৌকো পার হয় মাত্র আট দিনে। পাশে পেটমোটা চিত্রবিচিত্র বজরা, ময়ূরপঙ্খী, মাদুরের ছই আঁটা ঢাকাই পুলওয়ার। ঢাকা থেকে মসলিন আসে। কোম্পানির আফিমের নীলের পেটিও কুঠি থেকে আসে জাহাজে। মুগাচারা, ফিলচারা, পেটোয়া, চট্টগ্রামের বালম। কোনোটার গলুই উঁচু, কোনোটার নীচু, কোনোটা বেঁটে পেটমোটা কেজো, কোনোটা ছিপছিপে তরোয়ালের খাপ। পর্তুগীজ, মুসলমান, বাঙালি, উত্তর ভারতীয় মাঝিমাল্লায় জমজমাট গঙ্গার তীর।

'হ্যাড এনাফ অফ বেঙ্গল টুডে'। পা টলে চার্লস ম্যাকিনটশের। পড়ন্ত রোদে মাথাটা গরম হয়ে যায়। কালকেই গোকুলকে বলতে হবে, একটা কক হ্যাট আর একটা সোলা টুপি।

শয্যাঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই চার্লস ম্যাকিনটশ ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমের মধ্যে চার্লস তার মাকে দেখে। তার শৈশবের মা, তখনও বেশ দুলদুলে, গায়ের চামড়া মোটেই কুঁচকায় নি। একটা মস্ত কল লাগানো কাঠের পিপের সামনে একরাশ কাপড়ে সাবান দিচ্ছে। বাবা দুম্ করে মরে যাওয়ার আর বাপের জায়গায় টাউনশেন্ড কোম্পানিতে কেরানির স্থল দখল করার মধ্যে যে পাঁচ-ছটা বছর সেটা ছিল কষ্টের সময়। এই ক-বছর তার আত্মীয় স্বজন পরিবেশ থেকে প্রায় নির্বাসিত জীবন। দেখা হলে কি-রকম

ভাবে তাকাত যেন এখনই তারা আত্মীয়দের কাছে টাকা চাইবে। ঠাণ্ডায় ছোট বোন মারা গেল। তুলতুলে নরম বিছানায় টানা পাখার নীচে শুয়ে চার্লস ম্যাকিনটশ তার সেই বোনের মৃত্যুর দৃশ্য আধঘুমের মাঝখানে দেখতে পায়। বাইরে বরফ পড়ছে, অনেক কষ্টে পাড়ার ডাক্তার ডাকা হয়েছিল, জবাব দিয়ে গেছে। ডবল নিউমোনিয়া। বড় বড় চোখ মেলে ডলি চেয়ে আছে কড়ি-কাঠের দিকে। তাকিয়েই মারা যায় তার বোন।

চটকা ভাঙে পেটা ঘড়ির আওয়াজে। আবার দরজার কোনায় খসখস শব্দ। সকালবেলার দৃশ্য মনে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা হুড়োহুড়ি। একটু পরেই তার খেয়াল হয় তার পা, পেট, পাছা তার নিজের নয়। দক্ষ আঙুলে তার লম্বা ড্রয়ার পরাবার সময় কিঞ্চিৎ কাতুকুতু লাগে। কালো ডিনার জ্যাকেট, স্কার্ফ ঠিক ঠিক জায়গায় পরানো হয়। এবার ওডিকোলোনের মিষ্টি গন্ধ। চুলে চটাপট ম্যাসাজের আওয়াজ, ঘাড় টিপুনি। বাঃ! আরামে চোখ বুজে আসে ম্যাকিনটশের। ঠিক সেই মুহূর্তে 'আইয়ে সাব' বলে হুঁকোবরদারের হাতে গড়গড়ার নল।

সন্ধ্যের পোশাকে সজ্জিত ম্যাকিনটশ বারান্দায় বেরতেই ব্যানিয়ান গোকুল সম্ভাষণ করে, 'গুড ইভনিং স্যার। ইওর বিল।'

'মাই হোয়াট?'

'স্যারভেন্টস স্যার, স্যারভেন্টস।'

একটা ছোট ছাপানো কাগজ। লোকজনদের মাইনে। বোধ হয় কোম্পানি থেকেই ঠিক করা হয়েছে।

'আই হ্যাভ নো মানি।'

'আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট মানি। গিভ মি ওনলি টু অ্যানা পার রুপি।'

'অল রাইট, অল রাইট।' লম্বা ঠ্যাং মুড়ে চার্লস ম্যাকিনটশ পালকিতে ওঠে। পালকিতে দুলতে দুলতে গোকুলের দেওয়া লম্বা কাগজের ফালিটা চোখের সামনে মেলে ধরে।

খানসামা	১২ টাকা
বাটলার	৮ "
খিদমৎগার	৬ "
পাচক	১৫ "
পাচকের জোগানদার	৬ "

মশালচী	৩ টাকা
পিয়ন ও হরকরা	৪ "
চুলফেলা নাপিত	২ "
৩ টাকা হিসাবে ৬ জন বেয়ারা	১৮ "
হেড বেয়ারা	৫ "
লোকজনদের বাড়িভাড়া	২৬ "
দাড়িফেলা নাপিত	২ "
হুঁকোবরদার	৫ "
নালি সর্দার	৪ "
সর্দারের অনুচর	৩ "
সহিস	৩ "
ধোবি	২ "
ইস্ত্রিওয়ালা	২ "
দর্জি	৩ "
	মোট ১২৯ টাকা

মাই গড! এর ওপর গোকুলের সুদ। এ ছাড়া খাওয়া-দাওয়া, কাপড়-চোপড়, পালকি, বাগি, বজরা, বাড়ি। তার ওপর টাকা জমানো। নাঃ, প্রাইভেট ট্রেড ছাড়া কোনো উপায় নেই। কোম্পানির মাইনেতে এ-সব হয় না। যদি সে এ-সবের মধ্যে না যায়। প্রশ্নটা মাথাচাড়া দিয়েই মিলিয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। তার কাকার সাবধানবাণী মনে আসে। ইণ্ডিয়াতে খাতির আদায় করে নিতে হয়, খাতির কেউ দেয় না। তুমি যদি নেহাৎ ভদ্রলোক হও পালকিতে বেয়ারা থেকে আরম্ভ করে ব্যানিয়ান পর্যন্ত সকলে তোমাকে করুণা করবে। ডাঁট দেখাতে হবে। ডাঁট না দেখালে ইণ্ডিয়াতে থাকতে পারবে না। আবার টাউণ্টশেণ্ড কোম্পানির বিরাট লম্বা ঠাণ্ডায় জমকাঠ বাড়িটার চেহারা চার্লস ম্যাকিনটশের মনের মধ্যে খেলে। নাঃ! ইণ্ডিগো অর কটন পিস গুডস্ যেটাতেই হোক যেতে হবে। নইলে অসম্ভব।

আবার ঝিমুনি এসেছিল। পালকি, ম্যাডেইরা, গড়গড়া এ-সবই এমন এক নিদ্রালু পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যে, জাহাজ থেকে নামবার সময় প্রাচ্যের এক

অপরিচিত শহর সম্পর্কে তার যে উদ্বিগ্নতা ছিল তা কেটে গিয়ে ভীষণ মায়া‍টে লাগে। বাটলারের পুরুষ্টু আঙুল যখন তার স্কার্ফ আঁটছিল তখন এক-একবার সন্দেহ ছলকে উঠছিল, এই স্বাস্থ্যবান থাবা দুটো সামান্য জোর দিলেই তো ফাঁস লেগে যেতে পারে গলায়। কিংবা পালকির বেয়ারাদের চকচকে কাঁধ থেকে যদি জোড়ায় জোড়ায় হাত বেরিয়ে আসে। ইংরেজদের কী এমন শক্তি? সারা ভারতবর্ষে সর্বসাকুল্যে হাজার পাঁচেকের বেশি ইংরেজ নেই। বাংলাদেশে বড় জোর আড়াই হাজার, কিংবা তারও কম। কামানের তো কোনো দরকার নেই, খালি হাতেও তো শেষ করা যায়। সত্যিই এই রকম কর্মঠ স্বাস্থ্যবান জোরাল চেহারার মানুষগুলো কি রকম মন্ত্রমুগ্ধভাবে তার বাড়ির ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছে সেটা কি তার চামড়ার রঙের জন্যে? শারীরিক শক্তিতে এদের এক-জনেরও সে সমকক্ষ নয়। তা ছাড়া ব্যানিয়ান গোকুলের মতো বুদ্ধিমান বিচক্ষণ মানুষও নিশ্চয় অনেক আছে। এরা কি একসঙ্গে হতে পারে না? হায়দার আলি বোধ হয় কিছু লোককে একসঙ্গে ভেড়াতে পেরেছে। সেইজন্যে এত বেগ দিচ্ছে ইংরেজকে, বাংলাদেশ বোধ হয় পারে নি। কিন্তু পারতেও তো পারে। রাইটার ম্যাকিনটশ ছেলেবেলা থেকেই একটু কল্পনাপ্রবণ। বাড়িতেও সে তার ভাইবোনদের থেকে বরাবর একা। বাংলাদেশে এসে বরঞ্চ, তার মজা লাগছে। ইংল্যাণ্ড সম্পর্কে তার একেবারেই নস্টালজিয়া নেই, ইংল্যাণ্ড মানেই টাউনশেণ্ড কোম্পানির লম্বা কাঠের বাড়ি, বাইরে টিমটিমে গ্যাস ল্যাম্প। এ দেশের সব কিছু তাকে প্রচণ্ডভাবে আবিষ্ট করছে, গত চব্বিশ ঘণ্টা তার গত তেইশ বছরের জীবনকে গিলে ফেলেছে। 'রীয়ালি মার্ভেলাস! মার্ভেলাস!' পালকি থেকে নামতে নামতে নিজের মনে বলে।

গঙ্গার ধারে সে-মুহূর্তে অপূর্ব শোভা। নতুন জাহাজ ভিড়ছে, তার পালে পালে সূর্যাস্তের রঙ। সূর্যাস্তের আবির-মাখা বজরা ভাওয়ালি পিনিশ, নৌকোয় নৌকোয় মশালচীদের হাতে মশাল জ্বলছে, তা ছাড়া চীনে লণ্ঠন। চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া উঠছে, ঘুঙুরের আওয়াজ আসছে নৌকো থেকে।

দুখানা বজরায় পাটাতন ফেলে জোড়া লাগানো হয়েছে। বড় বজরায় কার্পেট-মোড়া তাকিয়া, চেয়ারে এক দিকে কোম্পানির অফিসার ও তাদের পরিবার। ইতিমধ্যে প্রায় সকলেই রসস্থ। মাথা নিচু করে চার্লস ম্যাকিনটশ ঢুকতেই হৈ হৈ পড়ে। *এক খেপ নাচ হয়ে গেছে, রামজানীরা মেঝের কোণে বসে জিরোচ্ছে,* তবলচী ও সারেঙ্গিবাদকের সঙ্গে আলাপ করছে। বেয়ারাদের হাতে হাতে ট্রে।

কার্পেটে আরাম করে পা ছড়িয়ে বসে চার্লস। পাশে ডাক্তার-পত্নী নিচু গলায় বলে, 'দে আর দ্য ইনফিরিয়র টাইপস্, ইউ নো।' পাশে ম্যাকডাওয়েল, মেজর প্রাউডেন নিচু গলায় বিজনেস টক করে। জাহাজের ক্যাপ্টেনও আছে আর একটা চেনা চেনা মুখ না? আবার বুকটা ম্যাকিনটশের ছলাৎ করে ওঠে। মিস ক্র্যাফটন? আর একজন মাথাকামানো ভেলঢাকা মহিলার সঙ্গে আলাপ করতে করতে সে অকারণে মুখের সামনে জাপানি পাখা নাড়ছে যদিও ঘরের মধ্যে ফুরফুরে হাওয়া। রামজানীরা উঠে সেলাম করে দাঁড়ায়। তার মধ্যে একজনের লম্বা ধারালো চেহারা। ফিকে নীল মসলিনের সালোয়ার কামিজ, লক্ষ্নৌ থেকে এসেছে একুশ বছরের গহরজান। সারেঙ্গীর আওয়াজ আর তবলার বোল ভীষণ অপরিচিত ঠেকে কিন্তু শীঘ্রই গহরের অঙ্গভঙ্গিতে আকৃষ্ট চার্লস ম্যাকিনটশের চোখ ঠিকরে পড়ে। 'টেক ইট ইজি, দে আর ব্যাড টাইপস্,' মাসীসুলভ মিসেস ডিকির হাতখানা চার্লসের হাত স্পর্শ করে। কিন্তু যখন ওড়নার নীচ থেকে গহরজান ঘন ঘন কটাক্ষ হানে তখন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে চার্লস ম্যাকিনটশ। হাত থেকে গড়গড়ার নল পড়ে যায়।

রাত বাড়ে। আশেপাশের কয়েকখানা বজরা ময়ূরপঙ্খী থেকেও ঘুঙুরের আওয়াজ আসে। মশালচীদের হাত, ঘাড় টন টন করে। শীতল বলে, 'আর কতক্ষণ চলবে সুরথদা?'

'এখন মাল খেয়ে সবাই গরম। আবার সাহেব-ম্যামগুলোও নাচতে সুরু করে। এক একদিন রাত কাবার হয়ে যায়।'

মশালচী নিতাই বললে, 'আমাদের গাঁয়ে দাদা ছেলেধরার উৎপাত সুরু হয়েছে। ছেলেধরারা আবার কোম্পানির লোক।'

'চুপ কর নিতাই, এ-সব কথা আমাদের শুনতে নাই। আমরা কান থাকতেও কালা, চোখ থাকতেও অন্ধ, আমাদের কিছু করার নেই।'

নিভন্ত মশাল আবার জ্বালাবার আয়োজন করে নিতাই। 'আমি তোমার কথা মানি না। দুটো লোক এসেছিল আমাদের গাঁয়ে। মুড়ি বেচে রতনের মা, ছেলেটাকে এক টাকায় বেচলে। দুদিন খাওয়া হয় নি। আমরা লাঠি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলাম নদী পর্যন্ত। লোকগুলো দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে নৌকোতে উঠল। দেখি নৌকোয় উড়ছে কোম্পানির নিশান।'

'একটা ছেলেকে বিক্রি করলে কোম্পানির লাভ চার টাকা চার আনা,' শীতল বললে।

'আমি এ-সব কথার মধ্যে নেই। এই দ্যাখ,' মশালের আলোর নীচে তার পা টা তুলে পোড়া দাগ দেখায় সুরথ। 'বর্গীরা আগুন দিয়েছিল গাঁয়ে। আমরা পালিয়ে বেঁচেছি। তার পোড়া দাগ। আর এইখানে,' মাথার খোঁচা চুল ফাঁক করে দেখায়, 'এইখানে জমিদারের লাঠি। পিঠের ঘা এখনো শুকোয় নি। কোম্পানির বরকন্দাজ ঠুসো মারে দুবছর আগে বন্দুকের কুঁদোয়। আমার এই দেহে সবার চিহ্ন আছে, জমিদার ফৌজদার বর্গী কোম্পানি কেউ বাকি নেই।'

'আমার মনে হয় কি দাদা জানো, সাহেব-ম্যামদের ভগবানটা খুব জ্যান্ত। বেড়ে আছে দ্যাখো, মদ গিলছে, নাচ দেখছে, গাঁয়ে গিয়ে লুটপাট করছে। কোনো পাপপুণ্যের তোয়াক্কা নেই। আমাদের জন্যেই যত পাপপুণ্য তৈরি হয়েছে।'

'ও-সব ভাবিস নে শীতল। দেশের যত মান্যগণ্য লোক তারাই সব লাইন দিচ্ছে সাহেবদের সঙ্গে মোলাকাতের জন্যে। আমরা কোন্ ছার।'

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে গঙ্গায়। বজরা থেকে ঘুঙুরের আওয়াজ বন্ধ। কার্পেটের এক কোণে মিস ক্র্যাফটন ম্যাকডাওয়েলের কণ্ঠলগ্না। মিসেস ডিকির মাথার ভেল খসে যাওয়ায় তার মুখখানা পুরুষমানুষের মতো লাগে। পুরুষ-মানুষের মতোই তার নাসিকাগর্জন। কার্ড টেবিলের ওপর লম্বা ঠ্যাং মেলে ক্যাপ্টেন নর্টন নিদ্রামগ্ন। নীচে মেজর ফাউলার ও চার্লস ম্যাকিনটশ জড়াজড়ি করে শুয়ে। কেবল বজরার সিঁড়ির মুখে বল্লম কাঁধে দুজন নিশ্চল চোবদার। মশাল নিভে গেছে। মশালচী মাঝিমাল্লারা বজরা নৌকো ডিঙিতে কুঁকড়ে মুবড়ে শুয়ে। গলুইয়ে জলের ছলছল শব্দ আসে। একটা সাদা বেড়াল ভোরের আকাশে জ্বলজ্বলে তারাটার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে একজন ঘুমন্ত মানুষ টপকে শীতলের গা ঘেঁষে শোয়। কে একজন ছিঁক করে হাঁচি দেয়। তার পর একটানা গলুইয়ে জলের শব্দ।

দ্বিতীয় পর্ব

দুজন পতাকাবাহী ঘোড়সওয়ারের মাঝখান দিয়ে একজন ঘোড়সওয়ার গ্যালপ করে বেরিয়ে যায় ভোরের হাওয়ায়। সরু রাস্তার একপাশে জঙ্গলকাটা সুরঙ্গ হয়েছে। সেই ফাঁক দিয়ে দেখা গেল হাতির পিঠে পুরুতঠাকুর মস্ত পিতলের কলস ধরে আছে।

'গঙ্গাজল নিয়ে যাচ্ছেন?' ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থামিয়ে প্রশ্ন করে।

ঠাকুরমশাই উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ সাহেব, পতিত-তারিণী গঙ্গে।'

'কুড়ন্‌ট্‌ গেট ইট। কার বাড়ি যাচ্ছে?'

'কৃষ্ণগোপাল দে, সাহেব।'

'গোপাল ইজ এ গ্রেট ম্যান।'

ব্রাহ্মণের মুখে চাপা হাসি ফোটে। 'বাবু ব্যবসা ছেড়ে দেবে সাহেব। আপনারা দেশী লোকদের ব্যবসা করতে দেবেন না।'

হাতি চলতে শুরু করে।

ঘোড়সওয়ার চেঁচিয়ে বলে, 'দ্যাট্‌স রাইট। উই ওণ্ট এলাউ দ্য নেটিভস টু ফাংশান।'

হঠাৎ গরম হয়ে যান হেস্টিংস এবং বুঝতে পারেন তাঁর শরীর ভাঙছে। চেৎ সিং আর অযোধ্যার বেগম নিয়ে ইংল্যাণ্ডের কাগজগুলো বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। বারওয়েল একতাড়া প্রেস ক্লিপিং পাঠিয়েছে, তার মধ্যে একটা আজগুবি কার্টুন। পাঁচটি ভারতীয় নারীর মৃতদেহের ওপর গভর্ণর-জেনারেল। একজনের উদ্যত বাহুর ওপর তাঁর সবুট পা। 'ফ্যানটাস্টিক। ফ্যানটাস্টিক।' অবশ্য তাঁর মুরুব্বি ফক্স আছে, বিপদে ভরসা, কিন্তু নেমকহারামি না? জঘন্য নেমকহারামি! একটা বাংলা ছড়া হেস্টিংসের মনে খেলে যায়। কলকাতায় যখন প্রথম আসেন তখন ব্যানিয়ানের কাছে শুনেছিলেন, 'যার জন্যে করি চুরি সেই বলে চোর।' এই-সব বিশ্রী চিন্তা কাটাবার জন্যে আবার জোর কদমে ঘোড়া ছোটান হেস্টিংস। পাশে অনেকগুলো আটচালা। একটা উঁচু দোলচালা কাছারি, স্থানীয় কোনো জমিদারের। সকালে ভোরের সুরে বীণ বাজছে। বাদ্যকারকে দেখা যায়।

উন্নত স্বাস্থ্যস্বচ্ছল ঘাড়, বাহু। লোকটা তন্ময় হয়ে আলাপ করে। ঘোড়সওয়ার কদম কমায়। ভারতীয়রা এই রকম নিজেদের মধ্যে তন্ময় হয়ে থাক, নইলেই বিপত্তি। ক্লাইভের জার্নালের কয়েকটা লাইন মনে আসে ঘোড়সওয়ারের: সেদিন মুর্শিদাবাদের পথের দুধারে কাতার দিয়ে যে নরনারী শিশু ভিড় করেছিল তারা যদি সকলে একটা করেও মাটির ঢেলা ছুঁড়ত তা হলে একজন ইংরেজ সৈন্যেরও স্বদেশে ফেরা ছিল অসম্ভব।

উল্টো দিক থেকে জোর কদমে আসছে তরুণ এক ঘোড়সওয়ার। বোধ হয় পেছনে গভর্ণর-জেনারেলের পতাকা দেখে লাগাম টানে।

হেস্টিংস খুঁটিয়ে দেখেন মুখখানা। যেন নিজেকে দেখতে পান তিনি, পঁচিশ বছর আগেকার ওয়ারেন হেস্টিংস, সামনে অনিশ্চিত বসন্ত, প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবনটা ফাঁকা ফাঁকা; উচ্চাশার পেছনে তখন একটা কবিতা ছিল। এখনকার মতো ঘামে-ভেজা হাঁইফাঁই করা উচ্চাশা নয়।

তরুণটি ঘোড়া থামিয়ে মাথা নামিয়ে অভিবাদন করে।

'নিউ ফেস?'

'রাইটার চার্লস ম্যাকিনটশ, স্যার।'

'ভালো ভালো। সকালে ঘোড়া ছোটানো ছাড়া এদেশে চাঙ্গা থাকার কোনো উপায় নেই। ফার্সী কবিতায় কি বলেছে জানো, ভোরবেলা ভগবানের হাওয়া খেলে ঘোড়ার দুই কানের ফাঁক দিয়ে।'

'খুব ভালো বর্ণনা, স্যার।'

'তোমাকে নেটিভদের ওপর রাজত্ব করতে হলে নেটিভদের সব কিছু জানতে হবে। না হলে তোমার প্রতিপক্ষ কোন্ চাল চালছে বুঝতে পারবে না।'

'ইয়েস, স্যার।'

'তুমি কি পিটার ম্যাকিনটশের ভাইপো?'

'ইয়েস, স্যার।'

'কোম্পানির যে-কজন লয়াল সার্ভেন্ট হাতে গোনা যায় পিটার ম্যাকিনটশ তার মধ্যে একজন।'

'ইয়েস, স্যার।'

দুটো ঘোড়া পাশাপাশি চলতে থাকে। সাধারণ কাউন্সিল মেম্বারদের পক্ষেও যা অকল্পনীয় হেস্টিংসের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। হেস্টিংস যেন কতকগুলো স্বতন্ত্র মানদণ্ড তৈরি করেছেন যা অন্যদের পক্ষে প্রযোজ্য হলেও তাঁর ক্ষেত্রে

নয়। পেছনে দুজন ইংরেজ অশ্বারোহী গভর্ণর-জেনারেলের পতাকা কাঁধে করে কদমে চলে।

'চার্লস, এখানে তোমার দুটো ভবিতব্য। কী বল তো?'

'হয় আমি ওপরে উঠব, নয় গড়িয়ে পড়ব।'

'দ্যাখো, জীবনের সব ক্ষেত্রেই বোধ হয় কথাটা খাটে, কিন্তু ভারতবর্ষে ইংরেজদের পক্ষে এটা প্রধান গাইডলাইন। তোমার কাকা এই গাইডলাইন মেনে চলত। এখন পার্লামেণ্টের এম. পি.। গার্ডেন হাউস।'

'ইয়েস, স্যার। পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বাড়ি। ছেলেমেয়ের এনডাওমেণ্ট। বাটলার, বাগি।'

'তবে?' একটু থেমে হেস্টিংস বললেন, 'নদীর ধারটা ভালো করে ঘুরেছ? অনেকগুলো নেটিভদের মন্দির আছে। ওদের শিব একটা মস্ত ব্যাপার। গঙ্গার ধারে ধারে শিবমন্দির। তার গায়ে আমাদের রেসিডেন্সির কাছেই পর্তুগীজদের ট্যাভার্ণ দেখেছ? ঐখানে দুটো ভ্যাগাবাণ্ড আছে। আমার বিরাট সমস্যা ওদের নিয়ে। কোম্পানির অফিসিয়াল হয়ে এসেছিল এদেশে, কিন্তু কোনোদিন ভেতরে ঢুকতে পারল না। খালি আউটসাইডার হয়ে থাকল। দুজনেই বেশ ব্রিলিয়াণ্ট ছিল, কিন্তু এখন লুটপাট ছাড়া কিছু জানে না। ওদের একজন কোম্পানির টাকা লুটেছে।'

'স্ট্রেঞ্জ স্যার!'

'স্ট্রেঞ্জ! অনেক কিছু স্ট্রেঞ্জ এখানে ঘটে। ইংল্যাণ্ডের অনেক জিনিস এখানে ঠিক চলে না। যেমন ইংল্যাণ্ডের আইন, একেবারে অচল। কলকাতার চারপাশে লুটপাট চলছে। তুমি কাকে বিশ্বাস করবে? ফৌজদারের লোক করছে, জমিদারের লোক করছে। তুমি কাকে দয়া দেখাবে? দয়া দেখানোর দিন পরে আসবে। এখন আমাদের সমূহ বিপদ। কোম্পানিকে ধার করে চালাতে হচ্ছে। অথচ গোমস্তারা হাজার মোহর নজরানা আদায় করছে। এখানে খুব ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। শত্রুপক্ষ সব সময় তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আঁটছে।'

এবার নদীর ওপর জাহাজের মাস্তুল, পাল চোখের ওপর ভেসে ওঠে।

'এই বিস্টীল ওয়েদারে একটা জিনিসই হয়। টাকা রোজগার। টাকা রোজগার করো, টাকা রোজগার করো। তার পর ইংল্যাণ্ডে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে হার্ড ফ্রস্ট আর ফায়ার প্লেস।'

হেস্টিংস জোর কদমে এগিয়ে যান।

যেশুয়া রেনল্ডসের আঁকা ছবিটা ঘোড়ার জিনে বসে আছে, মাথার সামনের দিকে টাক, পাশে কার্ল, কিন্তু তেলরঙে একটা অস্বাভাবিক যৌবনের দীপ্তিও এসেছে। একটু নজর দিলেই দেখা যাবে হেস্টিংসের চেহারায় সে জৌলুস নেই। এখনো রেকাবে বসার কায়দা খাড়া, স্লো ট্রটে সামান্য নড়চড় নেই, কিন্তু মুখের ভাব শুকনো বেজার।

সামনে রাস্তায় বিরাট বিরাট গর্ত ঘোলাটে জলে ভর্তি। চৌরঙ্গীর কাদা ক্যানিং অঞ্চলের কাদার মত সড়সড়ে। ঘোড়া বিউটির পা হড়কায়। মাইশোরের ঝামেলা কাটবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতার রাস্তাঘাটগুলো হাতে নিতে হবে। নারকেলগাছের ঝোপের নীচে সারি সারি সিপাই গাদা বন্দুক কাঁধে কুচকাওয়াজ করছে। থামওয়ালা লম্বা সুপ্রীম কোর্ট বিল্ডিংয়ের সামনে ইতিমধ্যেই নানা ধরনের পালকি আসতে সুরু করেছে। হেস্টিংসের ভুরু কুঁচকায়। বাড়তি খাজনা ফাঁকি দেয়ার জন্যে ইতিমধ্যেই তিন তিনটে জমিদার কেস ঠুকে দিয়েছে। আর আশ্চর্য এই কোর্টের কারবার! ইংল্যান্ডের আইন দিয়ে জজসাহেবরা ভারতবর্ষ শাসন করবে? ফুঃ! ফ্যানটাস্টিক! এবার ট্রট ছেড়ে ক্যান্টার ধরে বিউটি। বাঁকে করে দুধ, দই, ঘি নিয়ে আসছিল গোয়ালারা। বিউটি কাদা-জল ছিটিয়ে দেয় তাদের গায়ে। সামনের বাঁধা জল লাফ দিয়ে পার হয় হেস্টিংস। কোর্টের সান্নিধ্যও যেন তাঁর কাছে অসহ্য। এদিকে লণ্ডন থেকে ক্রমাগত চাপ আসছে, আর খাজনার রেট চড়ালেই মামলা। এই অবস্থাটা আর বেশিদিন চালু রাখা যাবে না। আবার একটা আইন এনে গভর্ণর-জেনারেলের হাতে সমস্ত ক্ষমতা—হেস্টিংসের মুখ দিয়ে অদ্ভুত সুরেলা আওয়াজ বার হতে থাকে—বুম বুম বাম বাম…বুম বুম খাম। তারপর বেসুরো গলায় গাইতে থাকে—'আই লাইক টু গো সামহোয়্যার।' ঐ একটা ছবিই বার বার মনের মধ্যে খেলছে। মণি বেগমের উপঢৌকন হাতির দাঁতের খাটে শুয়ে থাকলেও ইণ্ডিয়া আর তাঁকে ধরে রাখতে পারছে না। আর আশ্চর্য! ঠিক যে সময় বিলিতি প্রেস তাঁকে নেটিভ বলে গালাগাল দিচ্ছে, ঠিক তখনই তিনি স্বপ্ন দেখছেন, বাইরে তুষারবৃষ্টি আর এক নির্জন ফায়ারপ্লেস।

কৃষ্ণগোপাল দেখা করতে চেয়েছে। সম্প্রতি কটন গুডসের ওপর যে ট্যাক্স বাড়ানো হয়েছে তাতে তার ব্যবসা তুলে দিতে হবে বলে জানিয়েছে, কিন্তু

দেখা করে কী হবে ? দেখা করে তো বলা যাবে না, হ্যাঁ, আমি তোমাদের ক্রাশ করতে চাই। তোমরাও ব্যবসা করে লাভ করবে আর কোম্পানির অফিসিয়ালরাও ব্যবসা করে লাভ করবে, এ দুটো একসঙ্গে চলে না। ইংল্যান্ডের প্রেস তাঁকে 'ক্রুয়েল টায়রেণ্ট' আখ্যা দিয়েছে, কিন্তু টায়রেণ্ট হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফ্রান্সিস তার ষড়যন্ত্রে সফল হলে কোম্পানিকে তল্পী গোটাতে হত। এখানে একটা সিদ্ধান্তে আসতেই হবে : কৃষ্ণগোপাল দে শাঁসালো ব্যবসা করবে না চার্লস ম্যাকিনটশ শাঁসালো ব্যবসা করবে? মানবতার কথা এখানে উঠছেই না। মানবতার জায়গা ইংল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ নয়।

ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট সম্প্রতি চওড়া করা হয়েছে, কিন্তু কাঁচা রাস্তায় জমে থাকা বৃষ্টির জলের ওপর ছলাৎ ছলাৎ শব্দে ঘোড়া এগোয়। হাতির পিঠে গোল ছাতার নীচে প্রাউডেন না? নীচে আট-দশ জন বল্লমধারী বরকন্দাজ। প্রাউডেন মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে। ত্রিশূলহাতে জটাধারী এক সন্ন্যাসী ছাড়া ভারতীয় পথচারী নেই। গোল ছাতা মাথায় একজোড়া সাহেব, এক-জোড়া ডালমেশিয়ান খেলা করছে। এক সার উটের পিঠে আফিমের পেটি চলেছে জাহাজঘাটায়। গত বছর চায়না ট্রেডে দশ লাখ টাকা লাভ হয়েছে, একটা সলিড লাভ। আফিংটাই আসল, তারপর নীল।

হেস্টিংস স্থির করে ফেলেন আজ অফিসে ঢুকেই প্রথম কাজ হবে, প্রত্যেক ইংরেজ গোমস্তাদের চিঠি লেখা : নীলচাষ জনপ্রিয় করে তুলতে হবে, নীল-চাষের ওপরই কোম্পানির ভবিষ্যৎ। ফ্রান্স এত চেষ্টা করেও নীল স্মাগলিং বন্ধ করতে পারে নি।

মোষের গাড়িতে কফিন আসছে সেণ্ট জনস্ চার্চের কবরখানায়। নিশ্চয় কোনো ইংরেজ। 'আ! দিস বিস্টলি ওয়েদার!' রোদ চড়েছে খেয়াল হয় হেস্টিংসের। একটা চিন্তা তাঁর মাথার মধ্যে খেলে, পর্তুগীজদের মধ্যে মৃত্যুর হার ইংরেজদের চেয়ে অনেক কম। এই গরমের দেশে নেটিভদের মতো থাকা দরকার। হেস্টিংস স্থির করলেন, নেটিভদের মতো একটু দই খেতে হবে খাওয়ার পর। পেটটা কিছুদিন হল গড়বড় করছে।

সত্তর দশকটা ছিল তাঁর যৌবনের দশক। একই সঙ্গে কত কাজ সম্পন্ন করা গেছে। তখন তো নিষ্ঠুরতা কিংবা শাঠ্যের কথা মনে আসে নি। শাঠ্য ত অপরিহার্য। শাসন মানেই শাঠ্য। এই যে দেওয়ানির আড়ালে বছরের পর

বছর ইউনিয়ন জ্যাকের প্রাধান্য বিস্তার—এটা শাঠ্য নয় ? বার বার মুখে বলছি আমরা বণিক মাত্র, কিন্তু তলে তলে ফৌজদার, আমিন আর নবাবের অন্যান্য কর্মচারীদের ক্লীবে পরিণত করে ইংরজ অফিসারদের প্রতাপ প্রতিষ্ঠা করা শাঠ্য নয় ? বাস্তবিক, বিচারের নামে নন্দকুমারের খুনে সামান্য আত্মগ্লানির স্থান ছিল না তাঁর। আত্মগ্লানি থাকলে নন্দকুমার জিতে যেত আর তাঁর বিরোধীরা নেকড়ের মতো একসঙ্গে তাঁর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। কোথায় থাকত রাজ্য-শাসন ? ফ্রান্সিসকে ডুয়েলে আহত করার ব্যাপারেও তাঁর সামান্য আত্মগ্লানি নেই। হেস্টিংস তাঁর নিজের অভিনয়ে নিজেই অবাক হয়েছিলেন। বোকা ফ্রান্সিস কখনো পিস্তল চালায় নি, সে ঝকঝকে পিস্তলের ধাতব সৌন্দর্য তারিফ করেছিল আর হেস্টিংস তো গলার স্বর সামান্য না কাঁপিয়েও বলেছিলেন পিস্তল চালানোর ব্যাপারে তিনিও একদম আনাড়ি। ইংল্যাণ্ডে যারা চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলছে তারা তুফানই তুলুক, কিন্তু রাজ্যশাসন আর শাঠ্য একেবারে অবিচ্ছিন্ন, এ কথাটা ইংল্যাণ্ডের লোক একদিন বুঝতে পারবেই।

সেণ্ট জন্‌স্‌ চার্চের বাগানে থোলো থোলো একাশিয়ার গোলাপী সাদা হাওয়ায় দোলে। চৌপাল থেকে কে নামে ? মিস ক্র্যাফটন না ? মিস ক্র্যাফটন তার সাদা সিল্কের হ্যাট দুলিয়ে হাত তুলে অভিবাদন করে। মাথার টুপি তুলে হেস্টিংসও প্রত্যাভিবাদন জানান। তাঁর ভুরু কুঁচকায়। ম্যাকডাওয়েল না ? ম্যাকডাওয়েল এগিয়ে এসে মিস ক্র্যাফটনের হাত ধরে। ব্যাটা বাগিয়েছে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মারিয়ানের মুখখানা ভেসে ওঠে। স্থির করে ফেলেন বিউটিকে পাঠিয়ে দেবেন চুঁচড়োয় যেখানে গিন্নি গিয়েছে শরীর সারাতে। মাদাম ইমহোপকে এত বছর পরও ঠিক গিন্নি ভাবতে পারেন না, এটা কি তাঁর চারিত্রিক দোষ ? মাদাম ইমহোপ ঠিক আর পাঁচটা কোম্পানির অফিসিয়ালের স্ত্রীর মতো নয়, সব সময় যেন সে নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। আর যত বয়স বাড়ছে হেস্টিংস যেন আরো স্ত্রৈণ হয়ে পড়ছেন। তাঁর স্ত্রৈণতাও তাঁর বিরুদ্ধে শত্রু-পক্ষের অন্যতম যুক্তি। চুঁচড়োতে গত সাত দিনে স্পেশাল মেসেঞ্জার মারফৎ চারখানা চিঠি লিখেছেন। অযোধ্যার নবাব নয়, হায়দার আলি নয়. মারিয়ান মারিয়ান……হেস্টিংস ঘোড়ায় ক্যানটার করতে করতে তাঁর বাড়ির সামনে ফুলের টব বসানো চ্যাটাল সিঁড়ির গায়ে ঘোড়া থামান।

সান্ত্রীদের খটাখট সেলাম চার দিকে। সোলাটুপি আর খাকি হাফ শার্ট হাফ প্যাণ্ট পরণে; হাতে উদ্যত তলোয়ার ইংরেজ সান্ত্রী টানটান হয়ে দাঁড়ায়।

হেস্টিংস সোজা অফিস-ঘরে এসে ঢোকেন। দেয়ালে মস্ত বড় এলিজা ইমপের অয়েলপেণ্টিং আর তাঁর টেবিলের ঠিক ওপরেই মাদাম ইমহোপ মস্ত বড় সিল্কের হ্যাটের ভেতর থেকে নিঃশব্দ কৌতুকে চেয়ে আছে।

টেবিলের ওপর চব্বিশ পরগণার ইংরেজ গোমস্তার রিপোর্ট।

'ইজ হি দেয়ার? কল হিম্,' হেস্টিংস এডিসিকে হুকুম দিয়ে রিপোর্টে চোখ বোলান।

লম্বা ইংরেজ ছোকরা এসে খট্ করে মিলিটারি কায়দায় সেলাম ঠোকে।

'হোয়াট্ হ্যাপন্‌ড্? ইউ কান্‌ট্ প্রোটেক্ট আওয়ার ট্রেশারি।'

ছোকরা ঠিক গুছিয়ে বলতে পারে না। একটা বাক্যই ঘুরে ফিরে বলে, ফৌজদার গেভ নো প্রোটেকশান স্যার। টু অফ আওয়ার সিপাইজ ওয়্যের কিল্ড। উই হ্যাভ ফিউ মেন।'

'হোল্ড অন উইথ ইওর মেন। হাউ মেনি ইংলিশমেন দেয়ার?'

'ওনলি সেভেন স্যার।'

'এনাফ! এনাফ ফর টু মোর ডেজ। ইউ উইল গেট রিয়েনফোর্সমেণ্ট অন ওয়েডনেসডে।'

ছোকরা গলা পরিষ্কার করে। 'দেয়ার ইজ আনরেস্ট স্যার। দ্য নেটিভস সে কোম্পানি ইজ একজ্যাকটিং টু মাচ।'

হঠাৎ গলার স্বর চড়ে যায় হেস্টিংসের। 'হাউ লং আই অ্যাম গোয়িং টু স্পুনফিড ইউ? হাউ লং? হোয়াই কাণ্ট ইউ মেক ইওর ওন ডিসিশ্যান?'

'ইয়েস, স্যার।'

'ইউ মে গো।'

আশ্চর্য। এই ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের সবকিছু যেন একটা মানুষের ওপর, আর সবাই তা মেনেও নিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধপক্ষরা শুধু একটা মানুষকে হটাবার জন্যে ইংল্যাণ্ডে, ভারতবর্ষে উঠে পড়ে লেগেছে আর তাঁর সমর্থনকারীরা হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে কখন একটা মানুষের কাছ থেকে হুকুম আসবে। দুটো টাকা খরচ করলেই একটা মুন্সীকে দিয়ে নবাবের দস্তাক জাল করা যায়, এই সাধারণজ্ঞানটুকু যাদের নেই তারা ছমাস জাহাজে চেপে দু হাজার মাইল দূরে দেশ শাসন করতে এসেছে। ঘণ্টি দিয়ে হেস্টিংস তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডাকেন।

'টেক ডাউন।'

সংক্ষিপ্ত সার্কুলারটা গড় গড় করে বলে যান হেস্টিংস। ইংরেজ গোমস্তাদের এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানির প্রভাব-প্রতিপত্তি যেখানে অটুট, সেখানেই নীলচাষের জন্যে সযত্ন চেষ্টা চালাতে হবে। গত বছর নীলচাষে কোম্পানির যে লাভ হয়েছে তা আশাতিরিক্ত হলেও এবার দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধের জন্যে কোম্পানির টাকার প্রয়োজন অনেক বেশি। চাষীরা যদি নীলচাষে উৎসাহিত না হয় তা হলে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা দাদন দিয়ে ধানের জমি নীলের জমিতে পরিণত করা দরকার। যদিও এই চাষ নতুন প্রবর্তিত হয়েছে কিন্তু কোম্পানির অর্থাগমের পক্ষে নীলচাষের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আগামী দু মাসের মধ্যে গভর্ণর-জেনারেল অফিসে এ সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিলের আদেশ দেওয়া হয়।

গতকাল জাহাজ এসেছে। ইংল্যাণ্ডের ডাক খোলা হয় নি। কেমন একটা অবসাদ এনেছে তাঁর। ইংল্যাণ্ডের ডাক মানেই তাঁর বিরুদ্ধে নিত্য-নতুন কেচ্ছার সংবাদ। সারা দেশটা কি ক্ষেপে গেল? ফক্স কী করছে? সব চেয়ে আপত্তিকর কার্টুনগুলো। সেগুলো আবার যত্ন করে কেটে তার কাছে পাঠিয়ে দেয় শুভাকাঙ্ক্ষীরা। 'মারিয়ান, হোয়্যার আর ইউ?' ফটোর দিকে চেয়ে টেকো মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে লোকটা বিড়বিড় করে ওঠে।

'ব্যানিয়ান গোকুল মুখার্জি স্যার', প্রাইভেট সেক্রেটারি দরজার কাছ থেকে বলে।

'কল হিম্।'

গোকুল মুখার্জি মাথা নুইয়ে তিনবার কুর্ণিশ করে এগোয়।

'ইয়েস গোকুল।'

'কৃষ্ণগোপাল স্যার!' গোকুল মুখার্জি উত্তেজনায় হাঁপায়।

'ইয়েস?'

'কৃষ্ণগোপাল ট্রেডিং উইথ ডাচ স্যার।'

'হুঁ? ভেরি ব্যাড! ভেরি ব্যাড!'

'ফাইভ থাউসেণ্ড পাউণ্ড অর্ডার স্যার!'

'হুঁ? ভেরি ব্যাড। আই উইল সী হি ডাজণ্ট গেট ইট।'

'ইয়েস স্যার। ডোণ্ট ফরগেট মাই কেস স্যার।'

'চায়না ট্রেড? ওপিয়াম?'

'ইয়েস স্যার।'

'আই শ্যাল টক টু মেজর ফাউলার।'

'ইয়েস স্যার।'

'ইউ মে গো।'

হেস্টিংস ঘণ্টি দেন। প্রাইভেট সেক্রেটারি আসতেই যান্ত্রিক গলায় হুকুম দেন, 'টেক ডাউন।'

'ৗসজ কৃষ্ণগোপালস্‌ কটন পিস গুডস প্রসীডিং টু হুগলী। স্পেশাল মেসেঞ্জার।'

'ইয়েস স্যার।'

হেস্টিংস নির্জনে খস খস করে লিখতে থাকেন কালিতে কলম ডুবিয়ে ডুবিয়ে:

প্রিয় এলিজা,

তুমি জানো সেই পাগলা হতচ্ছাড়া হিকি তার কাগজে আমার বিরুদ্ধে আবার যা-তা কেচ্ছা রটিয়ে বেড়াচ্ছে। সবচেয়ে আপত্তিকর আমার পারিবারিক জীবনে যা সবচেয়ে মহৎ, যা সবচেয়ে আদরণীয়, তার গায়ে ক্রমাগত কাদা ছোড়া হচ্ছে। ফ্রিডম্‌ অফ প্রেস আমি মানতে রাজি আছি কিন্তু তা হওয়া উচিত গঠনমূলক। হিকি আমাকে ও ইংরেজ সরকারকে জনসাধারণের সামনে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে।

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমাদেরই স্বদেশী অ্যাটর্ণি আর এক হিকি সাহেব পাগলা হিকির সঙ্গে জেলে গিয়ে দেখা করেছেন, তাঁর কেস লড়ছেন। তুমি তো আমার সঙ্গে একমত যে-আইন সরকারের হাতের মুঠোর মধ্যে নয় সে-আইন গ্রাহ্যও নয়। তুমি এমনভাবে পাগলা হিকিকে কেসে জড়াবে যাতে সে খালাস না পায়, দরকার হলে জুরীকেও প্রভাবিত করবে।

আমি আমার ব্যক্তিগত মেসেঞ্জার দিয়ে চিঠি পাঠালাম। চিঠি পড়েই তা নষ্ট করে ফেল। আদালতে আমার 'বন্ধু'র ত অভাব নেই।

লেডী এলিজাকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। তুমি আমার হয়ে বলো কাজের চাপে গত শনিবার ওঁর বল-নাচের আসরে আমি যেতে পারি নি। সামনের শনিবার নিশ্চয় যাব। —হেস্টিংস।

দেয়ালঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজে। হেস্টিংস হাই তোলেন। গত কয়েকদিন থেকে পেটটা ব্যথা ব্যথা করছে। ডক্টর ক্যাম্পবেলকে সন্ধেবেলা আসতে বলতে হবে।

হেস্টিংস গা মোড়ামুড়ি দেন। বয়স বাড়ছে এ কথাটা হাতের কব্জি ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে ভাবেন। হাত-দুটো আগের চেয়ে একটু চিমড়ে হয়ে গেছে। ডক্টর ক্যাম্পবেলকে একটা টনিকের কথা বলতে হবে। দেয়ালে শিকারের তৈলচিত্র। একটা ছোট জলার ওপারে বাঘ। কতকগুলো ইংরেজ অশ্বারোহী লাফিয়ে এগোচ্ছে সে দিকে, ঘোড়ার আগে একপাল হাউণ্ড। চিত্রকরও সেই শিকার-পার্টিতে ছিল। প্রায় ফটোগ্রাফির নিভুলতায় হেস্টিংসকে সে এঁকেছে। সেই লাফানো ঘোড়সওয়ারের দিকে চেয়ে তাঁর ঈর্ষা হয়, তখনো তিনি গভর্ণর, গভর্ণর-জেনারেল হন নি, তখনো তাঁর নাম ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড তোলপাড় করে না, কিন্তু তখন জীবনটা যেন হাতের লাগামের মধ্যে ছিল, তার পিঠে চেপে সমস্ত খানাখন্দ লাফ দিয়ে পার হওয়া যেত। এখন জীবনটা বেরিয়ে যাচ্ছে হাতের মুঠো থেকে।

দরজার কাছে কাশির আওয়াজ। হেস্টিংস খাড়া হয়ে বসেন, 'ইয়েস ?

'দে আর ওয়েটিং স্যার।'

হেস্টিংস ভুরু কুঁচকান। মস্ত এক কাঠের টেবিলের পেছনে ব্ল্যাকবোর্ডে খড়ি দিয়ে লেখা গভর্ণর-জেনারেলের দৈনন্দিন কর্মতালিকার দিকে চোখ পড়েঃ প্রাইস অ্যাণ্ড রিচার্ডসন।

'কল দেম্, কল দেম্!' হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলার এক খিট্‌খিটে বুড়োর গলা আবিষ্কার করে লজ্জা পান।

সত্যিই কি অবস্থা, ওদিকে ফরাসীদের চ্যালেঞ্জ এখনো শেষ হয় নি। আর এনারা এখানে এঁদের মর্যাদার খেলা খেলছেন।

আবার কাশির আওয়াজ।

'উইল দে কাম ওয়ান বাই ওয়ান ইওর একসেলেন্সি ?'

হেস্টিংস আবার সেই খিটখিটে বুড়োর গলায় খেঁকিয়ে ওঠেন, 'টুগেদার! টুগেদার!'

তারপর মনে মনে অঙ্ক কষেন। কোম্পানির তিনখানা মালটানা জাহাজকে যুদ্ধের জাহাজে পরিণত করতে সাত-আট লাখ টাকা ইতিমধ্যেই খরচা হয়ে গেছে যখন কোম্পানির টাকাকড়ির ভয়ঙ্কর অবস্থা, কিন্তু এই টাকাগুলো খরচা করা হয়েছে দুটো ছাগল পোষার জন্যে ?

শেরিফ রিচার্ডসন এবং প্রাইস দুজনেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে।

'তুমি ত শেরিফ, তোমাকে তো কমোডোর করা হয়েছে ?'

তিন-চার বার কথার মধ্যে 'ইওর একসেলেন্সি' ছিটিয়ে রিচার্ডসন বললে,

'আপনিই আমাকে ব্রিটানিয়া আর ন্যান্সি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছেন। কাজেই আমারই কমোডোরের ফ্ল্যাগ ওড়াবার অধিকার।'

পেছন থেকে এক পা এগিয়ে আসে প্রাইস। যদিও মর্যাদায় সে রিচার্ডসনের নীচে, তবু হেস্টিংসের সে ল্যাংবোট। তার হাবভাবে তাই রিচার্ডসনের জড়তা নেই। হেস্টিংস তাকে আফিংয়ের ব্যবসায় মদৎ দিয়েছেন, কলকাতার নবনির্মিত কয়েকটা কলে ক্রীতদাস চালান দিয়ে মোটা রোজগারে সাহায্য করেছেন। অবশ্য হেস্টিংসের নিজের কমিশন ছিল শতকরা পঁচিশ, কিন্তু অন্তরঙ্গ লোক দেখে মানুষ যেমন খুশি হয় তেমনি চটেও যায় কারণ অন্তরঙ্গতা ত কুকর্মেরও সাক্ষ্য।

'আমাকে রেজলিউশান জাহাজ দেওয়া হয়েছে। আপনিই কমোডোর বানিয়েছেন। আমি তাই আপনার কথামতো কমোডোরের ফ্ল্যাগ উড়িয়েছি।' বেশ আত্মস্থ গলায় ধীরে ধীরে বলে প্রাইস।

'এগুলো কী?'

হেস্টিংস হঠাৎ সুদূর হয়ে যান প্রাইসের কাছেও।

দুজনেই বিহ্বলভাবে তাকায় তাঁর দিকে।

'এগুলো আপনাদের কিসের জন্যে দেওয়া হয়েছে?'

'ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্যে।' পেছন থেকে রিচার্ডসন বলে ফস করে।

'তাই বলুন। আমি ভাবছিলাম, আপনারা বুঝি ভাবছেন এগুলো আপনাদের খেলনা, খেলবার জন্যে দেওয়া হয়েছে।'

রিচার্ডসনের মুখ থমথমে লাল দেখায়, প্রাইসও ভ্যাবাচ্যাকা। হেস্টিংসকে যতখানি কাছের মানুষ ভেবেছিল ততখানি যে তিনি নন এই উপলব্ধিতে তাকে বেশ বোকা বোকা দেখায়।

তীক্ষ্ণ গলায় সামনের দিকে ঝুঁকে বলেন হেস্টিংস, 'এগুলো খেলনা নয়। বুঝেছেন? কী বুঝেছেন?' 'এগুলো খেলনা নয়'। প্রাইস হাবার মতো পুনরাবৃত্তি করে।

'যদি ভাবেন খেলনা, খেলনা আমি কেড়ে নিতে জানি।'

আবার একটা অস্বস্তিকর পরিবেশ।

'আপনারা কি স্থির করেছেন ফ্ল্যাগ ওড়ানো নিয়ে ডুয়েল লড়বেন?'

'ইওর একসেলেন্সি!...'

রিচার্ডসনকে থামিয়ে দিয়ে হেস্টিংস বলেন, 'ও-দিকে ফরাসীরা তৈরী হচ্ছে

পণ্ডিচেরী থেকে আমাদের আক্রমণের জন্য, আমাদের কাছে সাহায্য চেয়ে পাঠানো হয়েছে। আর আপনারা ফ্ল্যাগ ওড়ানো খেলছেন?' একটু থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'ব্রাভো! ব্রাভো!'

এবার গম্ভীরভাবে বললেন, 'মাদ্রাজ যাবার জন্য তৈরি হও। এটা খেলার সময় নয়।'

মাথা হেঁট করে হেডমাস্টারের ঘর থেকে দুই অপরাধী ছাত্র বেরিয়ে গেল।

একলা ঘরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন হেস্টিংস। সত্যি বেড়ে আছে কলকাতায় তাঁর স্বদেশবাসীরা, তাদের অন্তহীন পার্টি, শ্যাম্পেন, ক্ল্যারেট ও ম্যাডেইরা উৎসব, নাচ, পার্টি, তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভ্যানিটি, কিন্তু ইংরেজরা ভারতবর্ষের মাটিতে থাকবে না যাবে? এ ব্যাপারে কেউ মাথা ঘামায় না। এখানে আইনজীবীদের কারবার দেখলে মনে হয় কলকাতা যেন ইংল্যাণ্ডের একটা শহর, ইংল্যাণ্ডের আইন এখানে আগাগোড়া চালু না হলেই সর্বনাশ। ও-দিকে হায়দার আলি মরলেও ঝামেলার অন্ত নেই। ইংরেজরা কী ভাবছে বোঝাই যায় না। কোর্ট অফ ডিরেক্টর্স কি ভাবছে ইংরেজরা কলকাতা আর চব্বিশপরগণা নিয়েই থাকবে? অযোধ্যা, রোহিলখণ্ড যেখানেই অগ্রসর হয়েছেন সেখানেই প্রবল বাধা। এখন তাঁর ডেকান পলিসি নিয়ে তুলকালাম চলেছে লণ্ডনে। কী ব্যাপার? 'মারিয়ান, আই অ্যাম ফেড্ আপ্।' নিচু গলায় চেঁচিয়ে ওঠেন মাদাম ইম্‌হোপের ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে।

আবার দরজায় কাশির আওয়াজ। প্রাইভেট সেক্রেটারি ঘরে ঢুকতেই হেস্টিংস বললেন, 'আচ্ছা জন, তুমি ছাগলের মতো কাশো কেন? যা তোমার বলার দরকার সোজা এসে বলবে। আমি তো তোমাকে বার বার বলেছি, ফাটবাজি আমার কোনো কালে ভালো লাগে না। ফিলিপ ফ্রান্সিসের ফাটবাজি আমার কাছে ছিল অসহ্য। তোমার যা বলার বলবে, কিন্তু তোমার ঐ ছাগলের মতো কাশি আমি স্ট্যাণ্ড করতে পারি না।'

জনের নাকের ডগা লাল দেখায়। নিচু গলায় বলে, 'মিসেস লেয়ার্ড, ইওর একসেলেন্সি।'

'আঃ আমার কি সৌভাগ্য! একজন সুন্দরী মহিলার সান্নিধ্য! ডেকে আনো, ডেকে আনো।'

ফ্রিল আঁটা বিরাট সবুজ গাউনে ঢাকা বপুখানা সামনের চেয়ারে কোনোমতে ঢোকে, বেশির ভাগ অংশ বেরিয়ে থাকে। ক্রমাগত কান্না আর স্মেলিং সল্ট

গ্রহণে চোখমুখ বিভ্রান্ত।
'মাই হাসবেন্ড ইজ ডেড!' ভদ্রমহিলা ভ্যাঁৎ করে কেঁদে ফেললে।
হেস্টিংস বারে বারে জিজ্ঞাসা করেও কোনো কূলকিনারা করতে পারলেন না।
দীর্ঘশ্বাস এবং কান্নার মাঝে মাঝে 'ক্যাপ্টেন মরিসন। ও ক্যাপ্টেন মরিসন।
একটা গানের ধুয়োর মতো ঘুরে ফিরে আসে।
'ইয়েস? হোয়াট ডিড হি ডু?
'ও মাই ডিয়ার হাসবেন্ড!'
দূরে দাঁড়ানো জন এগিয়ে আসে।
ইতিমধ্যেই খবরটা সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে। ডিনারে পেলেটিং বা রুটির টুকরো পাকিয়ে অন্যের গালে ছুড়ে মারা তখন কলকাতায় ইংরেজ সমাজের এক রগড় ছিল। রগড়টা একটু বেশী হয়ে গেছে এক্ষেত্রে। ক্যাপ্টেন মরিসন এই পেলেটিং মোটেই পছন্দ করতেন না কিন্তু যেখানে আপত্তি সেখানেই রগড় বেশি এই বিবেচনায় তার চোখ টিপ করে রুটির গুলি ছুড়েছিলেন লেয়ার্ড এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাংস প্লেটখানা উড়ে এসে লাগে তার কপালে। কপাল কেটে রক্ত এবং ডিনার পার্টিতেই ডুয়েল। লেয়ার্ড মারাত্মক আহত, কিন্তু মৃত নয়।
শুনতে শুনতে প্রবল অবসাদে হেস্টিংসের চোখ বুজে আসে। আর কিছুদিন যাবৎই যা হচ্ছে, চোখ বুজলেই দেখেন বরফ পড়ছে, ইংল্যান্ডের এক গ্রামে ফায়ার-প্লেসের সামনে বসে আছেন। বেজারভাবে জনের দিকে চেয়ে থাকেন।
'আপনি চীফ জাস্টিসের কাছে যান। এ ব্যাপারটা আমার এক্তিয়ারে নয়।
ভদ্রমহিলা শোনেন না। শেষকালে জন মিসেস লেয়ার্ডের সঙ্গী এক আত্মীয়কে ডেকে পাঠায়। যখন ঘর খালি হল তখন ঢং ঢং করে দুটো বাজে।
'আর কেউ আছে?'
'আমি বলেছি কাল আসতে।'
'ধন্যবাদ। বড্ড খিদে লেগেছে।'

২

'এই মালটা দেখুন ক্যাপ্টেন,' কৃষ্ণগোপাল দে হাত বাড়িয়ে ঢাকাই মসলিনের থান এগিয়ে দেন।
আড়ষ্টভাবে উঁচু চেয়ারে পিঠ দিয়ে ক্যাপ্টেন নর্টন বসে। তার চোখ কৃষ্ণ-

গোপালের হাতে রাখা বেগনির ওপর সাদা ঢাকাই মসলিন যেন দেখেও দেখে না। পাশে বসে থাকা কৃষ্ণগোপালের ভাই প্রাণগোপালের কোলের ওপরও রেশম। দাবাখেলার বোর্ডের মতো মার্বেলের সাদা কালো মেঝেতে নানা রকমারি রেশম ছড়িয়ে। গঙ্গার ওপরেই কৃষ্ণগোপালের নবনির্মিত প্রাসাদ।

'এই যে এইটা দেখুন। গত বছর প্যারিস আমস্টার্ডামে এই মাল দু হাজার পেটি পাঠিয়েছি। আপনার মনে আছে নিশ্চয়?'

কৃষ্ণগোপাল চমৎকার ইংরেজী বলেন। কোনো কোনো মানুষের ভাষাজ্ঞান খুব সহজেই আসে। নইলে সংস্কৃত, ফার্সী ছাড়া ইংরেজীচর্চা বিশেষ করেন নি, কিন্তু সাহেবদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুনতে শুনতে অনেকখানি আয়ত্ত করেছেন। এমনকি ছোট্ট রসিকতা বর্ণনা এগুলোও চালিয়ে যেতে পারেন বিদেশীদের সঙ্গে।

ক্যাপ্টেন মস্ত বড় জানালা দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকে। তিন-চার-শ-টনি মালটানা কয়েকটা জাহাজের প্রায় গায়েই মাদুরের ছইওয়ালা ঢাকাই পুলওয়ার। সাধারণতঃ এগুলো মসলিন নীল আফিংয়ের পেটি নিয়ে আনাগোনা করে ঢাকা থেকে কলকাতায়।

'গত এক বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

কৃষ্ণগোপাল কথা বলেন না। দরজার গোড়ায় রোগা, ছিপছিপে, ফর্সা সেলিম দাঁড়িয়ে থাকে পাথরের মূর্তির মতো, মেঝেতে একমনে বৃদ্ধ সরকার হিসেব করে, প্রাণগোপাল আড়চোখে দাদার দিকে এবং সাহেবের দিকে তাকায়।

সাদা সার্টিনের ঝালর দেওয়া কোটের হাতায় হাত বুলোতে বুলোতে ক্যাপ্টেন নর্টন বলে, 'এক এক পেটি এক এক হাজার টাকা।'

'এটা আপনি কী বলছেন ক্যাপ্টেন? তার মানে ব্যবসা আমাদের তুলে দিতে হবে।'

ক্যাপ্টেন নর্টন নিজের হাতের আঙুলের দিকে চেয়ে কথা বলে, 'এর বেশি আমার এজেন্টের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না।'

'আপনার এজেন্ট ইউরোপে এক এক পেটি অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকায় বেচবেন। এটা আপনিও জানেন, আমিও জানি।'

'তা ঠিক। আমার এতে কোনো ইণ্টারেস্ট নেই বাবু। আমার শুধু ফ্রেটের ওপর টেন পার্সেণ্ট।'

'গত বছর ফাইভ পার্সেণ্ট ছিল।'

'গত বছর বোর্ড অফ ট্রেডের মেম্বার ম্যাকডাওয়েল ছিল না। তার কমিশনের রেট দ্বিগুণ হয়েছে এক বছরে। আমাদেরও বাড়াতে হয়েছে।'

'আপনাদের গভর্ণর-জেনারেল এ-সব খবর রাখেন?' 'একটা লোকের ওপর কত কাজ, কত ভাবনা চাপাবেন? গভর্ণর-জেনারেলের এখন মাইসোরের লড়াই নিয়ে ভাবনার শেষ নেই। তা ছাড়া, আপনারাও ত কটন গুডস রেশমে ভালোই রোজগার করছেন।' ক্যাপ্টেন নর্টন তাঁর ঢোলা সার্টিনে মোড়া পা নাচায়।

'দিশী লোকদের ওপর বড্ড অবিচার হচ্ছে।'

'কোর্ট আছে। কোর্টে আবেদন করুন।'

'এ-সব ব্যাপার কোর্টে ফয়সালা হয় না ক্যাপ্টেন। আপনারা ব্যবসাটা আমাদের হাত থেকে তুলে নিতে চান।'

'আমি জাহাজ বুঝি, রাজনীতি বুঝি না।'

'জাহাজ আমিও বানাচ্ছি ক্যাপটেন। আমাদের দেশের টিক্ আপনাদের ওক কাঠকে হারিয়ে দেবে।'

'অসম্ভব!'

'ক্যাপটেন ওয়াটসনও তাই বলে।'

'ও একটা পাগলা লোক। এ দেশের এই সোঁদা মাটিতে লাখ লাখ টাকা ঢালছে। জাহাজ বানাবে। ও-সব কিছু হবে না। আর কোম্পানি কেন করতে দেবে? আপনাদের সাহেব বানাবার জন্যে ত কোম্পানি ব্যবসা করতে বসে নি।'

কৃষ্ণগোপালের কালো বিষাদভরা চোখ ক্যাপটেন নর্টনের মুখের ওপর থেকে নড়ে না।

'কিছু মনে করবেন না। আমি যা বুঝি তাই বলছি। আমার মনে হয় রেশম কটন পীস গুডস এ-সব ব্যবসা পড়ে যাবে। নীলের চাহিদা খুব বেড়েছে। নীল আর আফিং। আগামী বছর থেকে আমি সম্পূর্ণ চায়না ট্রেডে চলে যাব।'

'কিন্তু কেন?'

'আমি ত রাজনীতি করি না বাবু।'

'আপনাদের কোম্পানির লোকেরা নিজেদের কোলে ঝোল টানছেন। টাকা ফাঁকি দিয়ে কোম্পানীকে লাটে তুলছেন। এগুলো কি নেটিভদের দোষ?

নেটিভদের ব্যবসার ওপর ক্রমাগত কর চাপানো হচ্ছে, কোম্পানির অফিসিয়ালরা এক পয়সা দেবেন না, দিতে রাজি হলেও ফাঁকি দেবেন। এটা কী ধরণের জাস্টিস? আপনারা উঠতে বসতে জাস্টিসের কথা বলেন, সেইজন্যেই বলছি।'

'জাস্টিস নেটিভদের জন্যে নয়।'

'ভুল কথা, মস্ত ভুল কথা। জাস্টিস সকলের জন্যে।'

ক্যাপ্টেন নর্টন তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়। 'আপনার সঙ্গে বচসা করার জন্যে আমি আসি নি। আমার এজেন্টের টার্মস আপনাকে বললাম। আপনার পছন্দ হল মাল পাঠাবেন, নইলে পাঠাবেন না।'

কৃষ্ণগোপালও দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'আমাদের বাদ দেন। তাঁতীরা না খেয়ে মরে যাবে। এই যে সেলিম ঢাকা থেকে এসেছে, ওর মুখেই শুনুন।'

ফর্সা ছিপছিপে লোকটি এগিয়ে আসে। ধীরে মৃদু গলায় বলে, 'আমাদের তাঁত বন্ধ হয়ে যাবে।' রেশমী বেগনি লুঙ্গির ওপর সিল্কের গলা উঁচু পাঞ্জাবী, মাথায় ফেজ। ঢাকার লোকটির চেহারায় এমন এক স্বাচ্ছল্য ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ যে নর্টন বিরক্ত হয়।

'আপনাদের ব্যবসা কেমনভাবে টিঁকিয়ে রাখা যাবে তার জন্যে আমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই।'

কৃষ্ণগোপালের পুরু গোঁফের ওপর ভালবাসা বিষাদে ভরা চোখ দুটো জানালার বাইরে চেয়ে থাকে। তার, প্রাণগোপালের এবং মেঝেতে বসে থাকা সরকারের মাথায় হলুদ রেশমের টুপি। হুঁকোবরদার গড়গড়া হাজির করে এবং সঙ্গে ক্ল্যারেটের বোতল।

'ডাচ ক্ল্যারেট, ক্যাপটেন। আমার এক বন্ধু কয়েক পেটি উপহার পাঠিয়েছে। ডাচ ক্ল্যারেট ঢক ঢক করে গলা দিয়ে নামাতে নামাতে ক্যাপ্টেন নর্টন কিছু পরিমাণ স্থির হয়। এতক্ষণ কৃষ্ণগোপালের পরিবেশে কথাবার্তায় যে প্রবল স্বাচ্ছল্য ও আত্মবিশ্বাসের ছাপ ছিল তা তার পক্ষে ছিল পীড়াদায়ক। বাস্তবিক লোকটা খুব ভদ্র, কিন্তু লোকটার সম্পর্কে ক্যাপ্টেনের একমাত্র আপত্তি প্রত্যেক ইংরেজ কিংবা ইউরোপীয়ানের সঙ্গে সে সমান পর্যায়ে মেশে। সেই হাত কচলানো কাঁচুমাচু ভারতীয় ভঙ্গিটি তার ক্ষেত্রে একেবারে অনুপস্থিত।

আধ বোতল গলায় ঢালবার পর দীর্ঘশ্বাস ফেলে ক্যাপ্টেন নর্টন বললে, 'দেড় হাজার পর্যন্ত উঠতে পারে আমার এজেন্ট। তার বেশি অসম্ভব।'

প্রাণগোপাল নিচু গলায় বললে, রাজি না হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই

দাদা। না হলে সবটাই লোকসান। এতগুলো টাকা খাটানো হয়েছে।'

ক্যাপ্টেন নরম হয়ে বললে, 'তুমি যে জাস্টিসের কথা বললে ব্যক্তিগতভাবে আমি তোমার সঙ্গে একমত, কিন্তু জাস্ট হলে তো বাণিজ্য করা যায় না।'

কৃষ্ণগোপালের সামনে বিগত আট-দশ বছরের ইতিহাসটা ভূতুড়ে লাগে। মারাঠাদের ক্রমাগত উপদ্রব সহ্য করতে না পেরে মেদিনীপুর অঞ্চলের জমিদারী ছেড়ে তাঁর বাবা উঠে আসেন কলকাতায়। ফৌজদার লুটছে, মারাঠারা লুটছে, কাজেই কলকাতা একমাত্র ন্যায়বিচারের পীঠস্থান ভাবেন। কামানের গোলায় তখন সোরা লাগত। সোরা সাপ্লাইয়ের একটা বড় অর্ডার পেয়ে গেলেন তাঁর বাবা কোম্পানির এক মাঝারি গোছের অফিশিয়ালের সঙ্গে বখরার ভিত্তিতে। তার পর রেশম কটন পিস গুডস—বড়বাজারে তাঁর বাবার ইণ্ডিয়ান সিল্ক কোম্পানি। ক্লাইভের কলকাতা পুনর্দখলের তিন-চার বছরের মধ্যেই তাঁদের কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। গত দশ বছরে কৃষ্ণগোপালের হাতে ব্যবসার হু-হু বিস্তৃতি, গঙ্গার ধারে তাঁর বিশাল থামওয়ালা দু-বিঘে জমির বাগানে ঘেরা এই বাড়ি, ওয়াটগঞ্জে সাহেবদের কাছ থেকে কেনা বাগানবাড়ি, বাগী চ্যারিয়ট ফিটন, গঙ্গায় বেড়াবার জন্যে ক্ষিপ্রগতি চোদ্দদাঁড়ির পানসি, পাগলী হেমার গলায় পান্নায় ডিমের মতো মুক্তোর মালা, হীরে জড়োয়ার সেট, সাহেবদের ডিনার দেবার জন্যে একসঙ্গে পঞ্চাশজন বসবার উপযোগী ওয়ালনাটের টেবিল, লাল মখমল আঁটা পঞ্চাশখানা চেয়ার, দেয়ালজোড়া কার্পেট, আয়না, রোজ-উডের আলমারি ওয়াড্রোব, ব্রোঞ্জের ঝাড়লণ্ঠন সমস্ত কিছুই ভূতুড়ে লাগে।

'আমি আপনার বন্ধু বলেই বলছি,' আর এক গেলাস ভর্তি করতে করতে ক্যাপ্টেন বলে। 'আমি কোম্পানির অফিশিয়াল নই, তাই বোধ হয় খোলাখুলি বলতে পারছি। আমরা ইংরেজরা এখানে প্রধানতঃ পয়সা করতে এসেছি।'

'আমরা ত বাধা দিচ্ছি না, সহযোগিতা করছি।'

'একটা লায়ন্স শেয়ার আপনাদের পকেটে চলে যাচ্ছে। যেমন ধরুন, আপনি জাহাজ বানাবেন বলছেন। একটা দুটো বানালেনও, কিন্তু যদি জাহাজের ব্যবসা আপনাদের হাতে চলে যায় আমরা খাব কী? আমরা নেটিভদের কর্মচারী হয়ে কাজ করব?'

'তাতে আপনার আপত্তি কী? আপনি এখন যা মাইনে পাচ্ছেন তা থেকে বেশি পাবেন।

'সেরকম একটা দুটো কেস হতে পারে। যেমন আপনার কেস আলাদা।

আপনি অনেকদিন হল কোম্পানীর বন্ধু, অসময়ে টাকা ধারও দিয়েছেন। কিন্তু…'

হঠাৎ কী একটা মনে করে ক্যাপ্টেন চুপ করে যায়। তার মনে হতে থাকে কৃষ্ণগোপালের কাছে এমনভাবে পেট খালি করে বলা ঠিক হচ্ছে না, কিন্তু বোধ হয় ক্ল্যারেটের তাড়না আছে। আগে ক্যাপ্টেন ভেবেছিল বলবে না কিন্তু বলে ফেলে। 'আপনার মাল আটক করার হুকুম হয়েছে, খবর পেয়েছেন?'

'তার মানে?'

'তার মানে তাই। আর আপনার দেশের লোকের কথাতেই তা হয়েছে।'

'চুঁচড়োয় মাল পেঁছয় নি?

'না, মাঝপথে আটক হয়েছে।'

'কার অর্ডার?'

'খোদ বড় কর্তার। আসলে কি জানেন? ক্যাপ্টেন এখন বেশ রসস্থ, ক্ল্যারেটের আধিক্যে চোখ মুখ ঝলমলে দেখায়, 'আপনাদের দেশটা যদি একটু ছোট হত ভালো হত।'

'দেশ বড় হলেই ত দেশের ক্ষমতা আরো বাড়বে।'

'ঠিক উল্টো বলছেন আপনি। দেশ বড় হলে দেশের সমস্যা আরো বাড়ে। তার চেয়ে আরো বড় কথা, কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। এ কথাটা সবচেয়ে ভালো কে বোঝেন জানেন? আমাদের বড়কর্তা।'

হঠাৎ ক্যাপ্টেন নর্টন উঠে পড়ে। তার ছুঁচলো দাড়ি থেকে ক্ল্যারেট গড়িয়ে পড়ছে। 'আমি জাহাজের লোক। আপনার সঙ্গে অনেকদিনের কারবার। আমার টেন পার্সেণ্টেই আমি খুশি। কি বলুন?'

কৃষ্ণগোপালও দাঁড়িয়ে ওঠেন। ক্যাপ্টেনের পা সামান্য টলে যায়। কৃষ্ণগোপাল হাত বাড়িয়ে দেন। ক্যাপ্টেন ভুরু কুঁচকে বলে, 'ঠিক আছি, জাহাজের লোক। দু বোতলেও কিছু হবে না। আপনাকে বন্ধু হিসাবে বলছি, আপনার শত্রু অনেক। এদেশের লোকই আপনার শত্রু। হট করে কিছু করবেন না, হট করে কিছু করবার নেই।'

'আপনার জাহাজ কবে ছাড়ছে?'

'সামনের বুধবার।'

'ঠিক আছে, আপনার এজেণ্টকে বলবেন তার কথাতে আমি রাজি।'

'আমার টেন পার্সেণ্ট?'

'রাজি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, গুড বাই।'

মাল খালাসের ধান্দায় দুপুর গড়িয়ে যায়। দুপুরে এক ঝলক অন্দরমহলে খেতে গিয়েছিলেন। হেমা বললে, 'মুখটা এমন বেগুন পেঁচা করে আছো কেন?'

'দিন কাল ভালো নয় হেমা।'

'তার মানে নতুন হীরের সেটটা দিচ্ছো না, এই ত?'

'সেটা ত অর্ডার হয়ে গেছে। সেকরা আসে নি?'

কোথায়? কাল সারা বিকেল বসেছিলাম।'

'আসবে, আজকেই আসবে।'

আটাশ বছরের হেমা সত্যিই বিদ্যুৎবল্লরী। তাঁদের বয়সের ফারাক যথেষ্ট। প্রথম বিয়ের এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই কৃষ্ণগোপালের স্ত্রী-বিয়োগ। দ্বিতীয় বিবাহ অনেক পরে। ব্যবসা-বাণিজ্যের যে অ্যাডভেঞ্চার তা তাঁর সমস্ত যৌবন জুড়ে। এ অ্যাডভেঞ্চারের পাশে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কেমন ফিকে লাগে। হেমার গর্ভের তাঁর আট বছরের ছেলে তাঁকে খানিকটা টানে, কিন্তু সে টান বোধ হয় যথেষ্ট নয় এবং ঠিক এই কারণেই পরিবার সম্পর্কে কৃষ্ণ-গোপালের এক ধরণের দোষীভাব আছে। স্বামী হিসেবে তিনি একেবারে অভ্রান্ত স্বামী হতে চান, কোথাও কোনো ফাঁক রাখতে চান না। হেমার স্বাচ্ছন্দ্যে সামান্য অভাব না ঘটে সে বিষয়ে কৃষ্ণগোপাল সর্বদা সজাগ।

'আজ সন্ধেবেলায় কীর্তন আছে। মনে আছে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, দানখণ্ড না?' আন্দাজে ঢিল মারেন।

হেমা ঠোঁট তুলে বললে, 'বাঃ, এরই মধ্যে বেমালুম ভুলে গেলে। দানখণ্ড ত শেষই হয়ে গেল, এবারে ত নৌকাবিলাস। তুমি বড্ড শেষে আসো। কেমন বিচ্ছিরি দেখায়। কীর্তনীয়ারা কিন্তু কিন্তু করে।' একটু থেমে বললে, 'আসলে তো তুমি আমাকে ভালোবাসো না।'

'তোমার মতে কাকে ভালবাসি?' একটু বিপজ্জনক কথাবার্তা, তবু বলে ফেলেন কৃষ্ণগোপাল।

হেমা হঠাৎ মুখের সামনে হাত নাড়িয়ে বলে ওঠে, "কেন তোমার পেথম বউ, সেই চোদ্দ বছরের ছুঁড়ি! এখনো তার ধ্যান করছো!' হেমা স্বামীর গরদের

পাঞ্জাবীর মধ্যে হাত চালিয়ে তার বুকের চুল টানতে থাকে।

'লাগছে লাগছে! কী করছ?'

'বেশ করবো, আরো করবো। বলো, আমাকে ভালবাসো, বলো।

হাত ছাড়াতে না পেরে কৃষ্ণগোপাল এক ঝটকায় বুকের ওপর হেমাকে টেনে নিয়ে বলেন, 'এবার আমি চাপি?'

'চাপো, আরো চাপো।'

এক পশলা আলিঙ্গন, চুম্বনের পর হেমা বললে, 'আমাদের বাগানবাড়িটা কেমন যেন ভূতো-ভূতো।

'বেশি সাজানো বাগান ভালো নয়।'

'না না, আমাদের বাগানে বড্ড গাছ, অন্ধকার হয়ে থাকে। গেটের গায়ে বড় বাদামগাছটা কেটে দেবে। আর বড্ড জংলা। হিকি সাহেবের মতো লন বানাতে পারো না?'

'ওখানে ওরা চা খায়। তুমি তো লনে বসে চা খাবে না।'

'কেন খাব না? লন বানালেই খাব। আসলে হিকি সাহেব তার জমাদারনীকে নিয়ে চা খায়, তাতে তার লজ্জা নেই। কারণ সে জমাদারনীকে ভালোবাসে। আর তোমার আমাকে নিয়ে বসতেই লজ্জা!'

আবার বিপদের জলভরা মেঘ আকাশে হানা দিয়েছে। 'আচ্ছা, আচ্ছা, লন বানিয়ে দেব। আসলে কি জানো? আমাদের পুকুরপাড়, কলাবাগান, নারকেলগাছ, আম, কাঁঠাল, বেত এগুলোর চেহারা এমন মায়াটে যে কাটতে ইচ্ছে করে না। হিকি সাহেবের বাগানটা বড় নেড়াবোঁচা।

চালিয়াৎ চন্দর এটর্ণি হিকি সাহেব বিপত্নীক, সম্প্রতি কৃষ্ণগোপালের বাগান-বাড়ির পাশেই একটা বাগানবাড়ি কিনেছেন। বেশ সংস্কৃতিবান পুরুষ। তবে এক হিন্দুস্থানী জমাদারনীর সঙ্গে থাকেন। অনেকদিন কৃষ্ণগোপাল স্ত্রীর কাছে কথাটা ঢাকা চাপা দিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু এ-সব খবর হাওয়ায় ওড়ে।

'তুমি একটা কথা শুনলে খুব রাগ করবে আমার ওপর।'

'রাগ!' কৃষ্ণগোপাল তাঁর স্ত্রীর হাত ধরে বলেন, 'আমি ত রাগ করি নি।'

'তুমি শুনেছ তা হলে। দ্যাখো, শেঠদের ছোটগিন্নী হীরে দিয়েছে কীর্তনিয়াকে। আমি সেই সোনার সাতনরীটা, ওটা আমি পরি না, বড্ড ঝলমল করে, কি রকম যেন সেকেলে সেকেলে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। রুপু কোথায় ?'

'ঘুমচ্ছে। তুলে দেব ?'

'না না, আমি এখন উঠছি। একটু কাজ আছে। আমি আসব ঠিক, তবে দেরি হবে।'

'তোমার সব সময় কাজ কাজ।' হৈমন্তী তার ঠোঁটফোলানো ভাবখানা দেখায় যে ভাবখানা তার স্বামীর খুব পছন্দ।

'আমি যে একটা লোক বাড়িতে সারাদিন বসে থাকি……।'

কৃষ্ণগোপাল হেসে বললেন, 'সব সময় ধ্যান করছি আমি সেই কথা।'

'একেবারে মিথ্যে কথা। তুমি ধ্যান করছো তোমার কাপড়ের গাঁইট।'

'ঠিক বলেছো। এবারে ঠিক বলেছো।' কৃষ্ণগোপাল স্ত্রীর নাক মলে দেন। উঠে পড়ে বলেন, 'আমি ঠিক এসে যাব। ঠাকুরমশাই, সরকারকে বলে দিয়েছি। গতবারের চেয়ে আরো জাঁকালো সভা হবে।'

বাচ্চা ছেলের হাতে যেমন লজেঞ্চুস কিংবা চকোলেট গুঁজে দিয়ে লোকে কান্না থামায় কৃষ্ণগোপাল স্ত্রীর সঙ্গে অনেকটা সেইরকম ব্যবহার করেন।

লম্বা মার্বেল করিডোর দিয়ে অফিসঘরের দিকে আসতে যে কথা বহুবার মনে হয়েছে সে কথাটাই কৃষ্ণগোপালের মনের মধ্যে উঁকি দেয় : সাহেবদের মতো বাড়ি বানাচ্ছে এদেশীরা কিন্তু ঘর ও বাইরের মাঝখানের যে দুর্লঙ্ঘ্য দেয়াল তা ভাঙে নি। অন্দরমহল মানে রাস, দোল, কীর্তন, তের পার্বণ আর বাহির মানে রেশমের কাপড়ের পেটি, বিদেশীদের ক্রমবর্ধমান পরাক্রমের সামনে এদেশী বণিকদের কারিগরের ক্রমাগত পরাজয়, কিন্তু মাঝখানে কোনো সেতু নেই। হৈমন্তী তাঁর আদুরে বউ, কিন্তু তাঁর চিন্তার সঙ্গিনী নয়। কোনো কোনো ইংরেজবাড়িতে গিয়ে মনে হয়েছে ওরা মাঝখানে একটা সেতু বাঁধতে পেরেছে। ওদের মহিলারা যে সাংঘাতিক পড়াশোনা করেছে এমন নয়, বড়-জোর চিঠিপত্তর লিখতে পারে, কিন্তু বাইরের জগৎ সম্পর্কে আরো ওয়াকিবহাল। দুজনের আনন্দ, দুশ্চিন্তার একটা আদানপ্রদান ঘটে। হৈমন্তীর সঙ্গে আচরণে তাঁর ত্রুটি আছে। হৈমন্তী আট-দশ বছরের মেয়ে নয়, সে আটাশ বছরের প্রাণবন্ত তরুণী, কিন্তু তার তারুণ্য তার সারা শরীর ছাপিয়ে যেমন ঝলমল করে উঠছে, তেমনি তার মনে নানা দিকে শাখাপ্রশাখা ছড়াতে সাহায্য করে নি। সংস্কৃত সাহিত্যে যে নারীর বর্ণনা কৃষ্ণগোপাল পড়েছেন তাতে বড্ড শরীর, শরীর দিয়ে অনেকটাই বাজি মাৎ করা যায়,

তবে সবটা যায় না। অথচ হেমার মনটাকে তিনি জাগাতে পারছেন না। তাঁর সব সময় ভয়, সত্যি কথা সাফ সাফ বললে ঝগড়াঝাঁটি হবে এবং তাঁর স্ত্রীর যেরকম ঝটিকাপ্রীতি, সহজেই পারিবারিক ঝড় উঠবে; কিন্তু এটা বোধ হয় ঠিক হচ্ছে না, এই রকম শিশুর হাতে মোয়া গুঁজে দেওয়ার অভ্যাস তাঁকে ছাড়তে হবে।

সেদিন দুপুরে প্রাণগোপাল বোর্ড অফ ট্রেডের অফিসে ম্যাকডাওয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে, কিন্তু ভেতরে কোম্পানির অন্য অফিসার থাকায় বসে থাকতে হয় ওয়েটিং রুমে অনেকক্ষণ।

ভেতরে নতুন ঘোড়ার আড় ভাঙার জন্যে ঘোড়সওয়ার যেমন আপ্রাণ চেষ্টা করে, তেমনি চেষ্টা চালিয়ে যায় ম্যাকডাওয়েল। মনে মনে আশ্চর্যও হয়, কারণ চার্লস ম্যাকিনটশের কলকাতা-বাস এক মাস পার হয়ে গেছে অথচ এখনো তার অনেক প্রশ্ন এবং সন্দেহ। সে কি বিলেতে থাকতে রাজনীতি করত? ফিলিপ ফ্রান্সিসের অনুচরদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করত এরকম সন্দেহ ম্যাকডাওয়েলের মনে খেলে।

ম্যাকিনটশ বললে, 'আমি গত এক মাস কোম্পানির কাগজপত্তর ঘাঁটলাম। গভর্ণর-জেনারেল কখনো লিখিতভাবে লুটপাট করতে বলেন নি। বরঞ্চ উল্টো বলেছেন, লুটপাট করে নেটিভদের সামনে কোম্পানির ইমেজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তিনি পরিষ্কার একটা চিঠিতে জানাচ্ছেন, মস্তানি করে দেশ শাসন করা যাবে না।'

'তুমি লুটপাট কাকে বলছ?'

'লুটপাট মানে লুটপাট। তা ছাড়া, আপনি কিছু মনে করবেন না, এই ক্রীতদাস-ব্যবসা কোম্পানি মদৎ দিচ্ছে, এটাও আমি মেনে নিতে পারছি না।'

'তুমি রাজনীতির কথা বলছ। কোম্পানির অফিসাররা রাজনীতির কথা বলে না চার্লস।'

'আমি জানি না, এটা রাজনীতি কি না, রোজ সকালে গঙ্গার ধারে গেলেই সেই এক ছবি। লম্বা পানসিতে সার সার বুকে মাথায় ছেঁকা-লাগানো ছেলে-মেয়ে-বুড়ো বিক্রির জন্যে কলকাতায় আসছে। প্রতি ক্রীতদাস-পিছু চার টাকা চার আনা। এই চার টাকা চার আনার ব্যবসা আমরা ছাড়তে পারি না কাকা?'

'চার্লস, তুমি আজ খুব বিপজ্জনক কথা বলছ। এটা আমাকে বলেছ আর কাউকে বোলো না। আর কাউকে বললেই তোমাকে সামনের জাহাজে লণ্ডন

ফিরে যেতে হবে।'

চার্লস তাড়াতাড়ি বললে, 'তুমি ঠিকই বলেছ কাকা। আমি হয়ত একটু বাড়াবাড়ি করছি, কিন্তু এই এক মাসে এই দেশটা আমার খুব ভালো লেগে গেছে। এখানে এত রকমারি লোক, চার পাশে এত চোখ-ধাঁধানো সবুজ। এমন-কি; এই বিস্‌টলি ওয়েদার, তাও আমার ভালো লাগছে। এরকম ঝড় আমি দেখি নি। আকাশ যখন আঁধি করে আসে...'

'তুমি কবিতা আওড়াচ্ছ চার্লস। আমরা এখানে বাণিজ্য করতে এসেছি।' একটু থেমে বললে, 'বাণিজ্য কেন, দেশ শাসন করতেও এসেছি। পুরনো নবাবের নবাবী চলে গেছে। আমরা এখন নতুন নবাব। আমরা কী করছি না করছি তার ওপরেই ভারতবর্ষের, এমন-কি, ইংল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎও নির্ভর করবে।'

'আপনি কাকা গভর্ণর-জেনারেলকে কোট করছেন।'

'প্রত্যেক ভালো অফিসারই তাই করে চার্লস।'

'কি জানি, কোথায় আমার একটা যেন বাধা আছে।'

'সেটা তোমার শিক্ষার দোষ চার্লস।'

'তা হবে', চার্লস ম্যাকিনটশ চুপ করে যায়।

হঠাৎ চোখ কুঁচকে ম্যাকডাওয়েল বললে, 'গোকুল তার বিল দিয়েছে?'

'না, এখনো দেয় নি। আমি চেয়েছিলাম। ও বলেছে অত তাড়া কি।'

'বিলটা চেয়ে নিও। আর তা হলেই বুঝবে আমাদের অবস্থাটা।'

'তার মানে?'

'তার মানে খুব সোজা। তুমি কত টাকা মাইনে পাচ্ছ? তোমার ব্যানিয়ান তোমাকে অন্ততঃ দেড়-হাজার টাকার বিল ধরিয়ে দেবে।'

'সে কী?'

'বাঃ, এই আসল ব্যাপারটাই বোঝ নি। চার্লস, তুমি সত্যি কবি। গোকুলের বিল পেলে মাটিতে পা দিয়ে হাঁটবে। তা না হলে এই-সব সবুজ রং, বৈচিত্র্য; ঝড়ের শোভা এ নিয়ে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত ভ্যাগাবাণ্ডদের দলে ভিড়তে হবে।'

'আপনি কাকা খুব কঠিন কথা বলছেন।'

'ভারতবর্ষটা ফুলের দেশ নয়। এখানে আমরা নেচার স্টাডি করতে আসি নি। আমাদের চার পাশে বিপদ। কোম্পানিকে ধার করে কাজ চালাতে হচ্ছে।'

'তার জন্যে—'

'আমি জানি তুমি কি বলবে। তার জন্যে ঘুষখোর আমলাদের দোষ, এই ত ? ফিলিপ ফ্রান্সিস এই সব কথা বলত। শেষ পর্যন্ত কী অবস্থা হল তার ? তা ছাড়া, তুমি যদি সৎ হও, তা হলে তোমার এই নবাবী থাকবে না। তোমার হাতে-পায়ে এক ডজন লোক, এত আরাম, বিশাল বিশাল কার্পেটে মোড়া ঘর, মদের পার্টি—এগুলো কোথা থেকে আসবে ? আর একটু ভাবো, আর একটু ভাবো চার্লস। তুমি আমার বন্ধু পিটারের ভাইপো, আপনার লোক, আমি চাই না অখ্যাতি মাথায় নিয়ে দেশে ফিরে যাও।'

'আমিও চাই না স্যার।'

'তা হলে আর ফ্যাকড়া তুলো না। মেজর ফাউলারের সঙ্গে ব্যবসা শুরু কর। পাকা লোক, যা বলবে মেনে নেবে। আর্মিতে পে-মাস্টার ছিল। টাকা করেছে খুব, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাজও করেছে। আমি ত তোমাকে আগেও বলেছি, অকেজো, সৎ ভালো মানুষদের কোনো দরকার নেই। মেজরের মতো লোক চাই যারা কাজ জানে। শুধু চাকরি করার মেজাজে কিছু হবে না, ইন্ডিয়াতে আসা একটা মিশান, একটা অ্যাডভেঞ্চার। ভেবে দেখ কত বিপদ ! জাহাজ-ডুবি হয়েও ত তুমি মারা যেতে পারতে, এখনো যেতে পারো। আকছার লোক ত মারা গিয়েছে, যাচ্ছে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে কাকা। আমি মেনে নেব। তোমাদের সমস্যা বাড়াতে চাই না।'

'আরো দিন যাক, বুঝবে।'

রাইটার ম্যাকিনটশ বিদায় হবার পর প্রাণগোপালের ডাক পড়ে।

'আমি জানি তুমি কেন এসেছ প্রাণগোপাল, কিন্তু তুমি কেন ?'

অবাক প্রাণগোপাল ম্যাকডাওয়েলের দিকে তাকাতেই সে বললে. 'দাঁড়িয়ে আছ কেন ? বোস।'

'দাদা আর আমি একই সঙ্গে বিজনেস করি।'

'তা আমি জানি, তোমাদের সঙ্গে আমাদের কারবার তো একদিনের নয়। তা ছাড়া তোমার দাদা মানী-গুণী লোক। কলকাতার নেটিভদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো সাজানো বাড়ি, সবচেয়ে দামী গাড়ি। তোমার দাদা আবার নাকি জাহাজ বানাচ্ছেন ?

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন ওয়াটসন অর্ডার নিয়েছে। গোরখপুর থেকে সেগুন কাঠ

আনিয়েছেন। বলছেন এ কাঠের জাহাজ বিলিতি কাঠের জাহাজের থেকেও ভালো হবে।'

'অ্যাই অ্যাই। এইখানেই আপত্তি। তোমার দাদা সব সময় ইংরেজদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে চলেছে। ইংরেজদের সঙ্গে বেশিদিন টক্কর দিয়ে চলা যায় না। তোমার দাদা কাউকে তোয়াক্কা করে না, আমাদেরও না।'

প্রাণগোপাল চুপ করে থাকে। 'তুমি ভাবছ', ম্যাকডাওয়েল বললে, 'আমি তোমাদের ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ বাধাচ্ছি। মোটেই নয়, বিশ্বাস কর। মোটেই নয়। আমি তো তোমাকে আগেও বলেছি, তুমি কৃষ্ণগোপাল থেকে আলাদা। তুমি অনেক বিনয়ী, তোমার কোনো টক্কর দেবার ইচ্ছে নেই। তোমার মতো লোকের সঙ্গে কোম্পানি ব্যবসা করতে চায়। একটু চুপ করে থেকে বললে, 'কিছু মনে করো না, বড্ড বেড়ে গেছে তোমার দাদা। আর বেশি বাড়তে দেওয়া ঠিক না। নেটিভরা আমাদের সঙ্গে বাণিজ্য করবে, কিন্তু তারা আমাদের ইকুয়াল নয়, এ-কথাটা তাদের মনে রাখতে হবে।'

'কিন্তু এগুলো পরের কথা।'

'পরের কথা নয়। এখনই সুরু করা যাক।'

'কিন্তু আটক মালগুলো—'

'ওগুলো কিছু করা যাবে না। স্বয়ং গভর্ণর-জেনারেলের আদেশ।'

প্রাণগোপাল বললে, 'আমি তা হলে দাদাকে কী বলব?'

'তার আগে বলো, তুমি আলাদাভাবে, দাদাকে বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে ব্যবসা করবে?'

প্রাণগোপাল ধীরে ধীরে তার বিপরীত দিকে বসা টেকো মোটাসোটা হলুদ মখমলের কোট আঁটা সাহেবটির দিকে তাকায়। তার নিজের চেহারা তার দাদার থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা। তার নাক আরো লম্বা, চোখ তীক্ষ্ণ, রং ফরসা, সে আর তার দিদির চেহারা অনেকটা একরকম। তার দিদি সেকালের ডাকসাইটে সুন্দরী। নাটোর রাজার দেওয়ানের একমাত্র ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। প্রাণগোপালের চোখের দিয়ে চেয়ে ম্যাডাওয়েল বোঝে।

'তোমাকে পাঁচ পার্সেণ্ট ট্যাক্স মকুব করে দেব।'

'আমার তো টাকা নেই। দাদার কাছ থেকে ধার করতে হবে।

'ঠিক আছে, সুরু করো, দেখা যাবে।'

'মাল খালাসের ব্যাপারটা—'

'কৃষ্ণগোপালকে বোলো গভর্ণর-জেনারেলের হুকুম নড়চড় হবার উপায় নেই।'

'তার পর ?'

ম্যাকডাওয়েল হাসে। বয়সের তুলনায় তাকে আরো কমবয়সী লাগে। তা ছাড়া মিস ক্র্যাফটনের সঙ্গে বিয়ের দিন যত ঘনিয়ে আসছে, ততই তাকে আরো উদ্দীপ্ত লাগে। আজকাল টপাটপ সিদ্ধান্তে এসে যাচ্ছে ম্যাকডাওয়েল, কোনো কাজ ঝুলে থাকছে না।

তার চোখও হাসছে। 'তারপর খুব সোজা ব্যাপার। আটক মালগুলো তুমি হাফ দামে কিনে নাও। আগামী সপ্তাহে ক্যাপ্টেন নর্টনের জাহাজ ছাড়ছে। লণ্ডনের এজেণ্ট এখানেই আছে, আমি বলে দিচ্ছি।'

প্রাণগোপাল তার তীক্ষ্ণ চোখে চেয়ে থাকে ম্যাকডাওয়েলের দিকে।

'কথার নড়চড় হবে কি না ভাবছ ? একেবারে পাকা। ইংরেজ যখন কথা দেয়, জেনো সেটা শেষ কথা।'

প্রাণগোপালের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি ফুটেই মিলিয়ে যায়। 'আমি রাজি, আপনার শর্তে ব্যবসা করতে রাজি।' পরিষ্কার গলায় বললে।

'বেয়ারা, ক্ল্যারেট।' ম্যাকডাওয়েল হাঁক দেয়।

'না না, আজকে না।'

'কেন বাবা, তোমার ত বেশ ভালোই চলে। কৃষ্ণগোপালের গার্ডেনপার্টিতে আমাকে বোকা বানিয়ে দিয়েছিলে। তুমি যে এত টানতে পারো আমি ধারণাই করি নি।'

ক্ল্যারেটের বোতল যখন শেষ হয় তখন দুপুর গড়িয়ে সন্ধে।

খুব বাহারে সন্ধে নামছে গঙ্গার ধারে। ভরা পালে বড় সমুদ্রগামী দুটো জাহাজ ঢুকছে কলকাতায়, তাদের পাল, মাস্তুল যেন গলা তামায় চোবানো। রাঙা নদীতে অপেক্ষমান জাহাজগুলো থেকে মাল উঠেছে, নামছে। একে একে পানসি-বজরায় আলো জ্বলে উঠছে। দু একটা বজরা থেকে ইতিমধ্যেই ঝুম ঝুম নাচের বাজনা ভেসে আসছে। লাল কোট পরা তিনজন ইংরেজ ঘোড়সওয়ার লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়। বড় অশ্বত্থগাছটার নীচে ট্যাভার্ণ থেকে হঠাৎ বেয়াড়া চিৎকার ওঠে, 'মাই ওয়াইফ ওয়াজ এ গ্রেট বিউটি। বেটার দ্যান ইওর মাদাম ইমহোফ্। হাঃ, হাঃ, হাঃ।' ঢাকাই মসলিনের পেটি বয়ে আনা শীতলপাটি-মাদুরে মোড়া নৌকা-গুলোতে ভাত চাপানো হয়েছে, ঘাটে এক

হরি-সংকীর্তনসভায় খোল বাজে। আর এই রাঙা জলের ওপর রাঙা আকাশে একটা একটা করে তারা ফোটে।

ঘনায়মান অন্ধকারে কৃষ্ণগোপাল বসে থাকেন একলা। ঘণ্টাদুয়েক প্রাণগোপালের জন্যে অপেক্ষা করার পর তাঁর চিন্তা হয়েছিল, কোনো ফ্যাসাদে পড়ে নি তো। কারণ ম্যাকডাওয়েল টেঁটিয়া লোক, নিজে ক্রীতদাসব্যবসায়ে লিপ্ত, এদিকে গভর্ণর-জেনারেলের প্রিয়পাত্র, কথাবার্তায় তুখোড়, সম্প্রতি মেয়ের বয়সী মহিলার সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হতে চলেছে। বরাবর লোকটাকে কৃষ্ণগোপালের ভালো লাগে না, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের যাবতীয় কাজ এখন তার সই ছাড়া অসম্ভব। প্রাণগোপাল ফ্যাসাদে পড়ে নি তো! সরকারবাবু ফিরে এসে বললেন, তিনি অফিসের অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে জানতে পেরেছেন, 'বাবু সাবকা সাথ সরাব পিতে হ্যায়।' ঝাড়লণ্ঠন জ্বালাতে এসে মশালচী ফিরে গেছে। ফিরোজা কাটগ্লাসের টেবিলে রুপোলি দীপাধারে একটা মোটা মোমবাতি জ্বলে। তার ঠাণ্ডা আলোয় আলোকিত দেয়ালে কৃষ্ণগোপালের বাবার তৈলচিত্র। জনৈক ইংরেজ আর্টিস্টকে দিয়ে দু'হাজার টাকা খরচ করে বানিয়েছেন কৃষ্ণগোপাল। অন্দরমহল থেকে খোলকরতালের আওয়াজ আসে। আজ নৌকাবিলাস।

সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। পুরু মখমলের পর্দা সরিয়ে প্রাণগোপাল ঢোকে। কৃষ্ণগোপাল বললেন, 'কিরে, এত দেরি?'

প্রাণগোপাল হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'কিছু করার নেই দাদা, কিছু করার নেই! গভর্ণর-জেনারেল নিজে হুকুম দিয়ে মাল আটক করেছে। ম্যাকডাওয়েল বললে তার কিছু করার নেই। সত্যিই তাই। আমি অনেক বললাম।'

'আমার সম্পর্কে কী বললে? বললে না, লোকটা কাউকে তোয়াক্কা করে না, ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়?'

প্রাণগোপাল তার কপালে হাত দিয়ে বললে, 'আমার মাথাটা বড্ড ধরেছে। এ-সব কথা নিয়ে আর…'

কৃষ্ণগোপাল হেসে বললেন, 'বোস না, কী হয়েছে! দু পাত্তর খেয়েছিস। সাহেব ভালোবেসে খাইয়েছে, তাতে কী।'

কৃষ্ণগোপালের শেষ কথায় একটা মোচড় ছিল, প্রাণগোপালের ইচ্ছে ছিল এ-সব কথা এড়িয়ে যায়। কিন্তু পারলে না, ডাচ ক্ল্যারেট তার জিভ আলগা করে দেয়।

'আমি ভাবছি কি দাদা…কিছুদিন থেকেই ভাবছি—মানে তোমাকে বলব বলব করছি—'

'বল না বল না'—কৃষ্ণগোপালের গলায় ঠাট্টা ছলছল করে।

'আমি ভাবছি আলাদা ব্যবসা করব। তোমার কাছে তো অনেক শিখলাম। ভাবছি তোমার কাছে কিছু টাকা ধার নিয়ে—'

'কত চাই?'

'হাজার পঞ্চাশেক হলেই চলবে।'

'ঠিক আছে, সরকারকে বলে দিচ্ছি। বারো পার্সেন্ট সুদে কাল টাকা পেয়ে যাবি।'

'আমি ভেবেছিলাম বাজারের রেট থেকে কম নেবে তোমার নিজের ভাইয়ের কাছে' ক্ল্যারেটের উদ্দীপনা সত্ত্বেও প্রাণগোপালের গলা কাঁপে।

'তাই নিতাম, কিন্তু আমি চাই না আমার আটক মাল আমার নিজের ভাই অর্ধেক দামে কোম্পানির কাছ থেকে কিনে নিয়ে লণ্ডনে বেচে।'

প্রাণগোপাল স্ট্যাচু, তার ছুঁচলো মুখ আরো ছুঁচলো দেখায়।

চাপা গর্জনের মতো গলা শোনায় কৃষ্ণগোপালের, 'এই সব ম্যাকডাওয়েলের বদমায়েসি আগেও হয়েছে, কোনো ন্যায়-অন্যায় বোধ নেই। খালি যেভাবে পারা যায় টাকা খিঁচে নাও নেটিভদের হাত থেকে! আশ্চর্য প্রাণ! তুইও শেষ পর্যন্ত এদের খপ্পরে পড়লি।' মোমবাতির শিখার দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে প্রাণগোপাল।

ও-সব ছ্যাঁচড়ামি ছাড়। কোম্পানি বাহাদুরের গোমস্তারা আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ বাধাবে, এটা আমি হতে দেব না। আলাদা ব্যবসা করবি, ভাল কথা, ঢাকাই মসলিন আমি তোর ওপর ছেড়ে দিলাম। পাঁচ লাখ টাকা তাঁতীদের দাদন দেওয়া আছে। এর লাভের একটা পয়সাও আমি নেব না। তুই চালা, আমি আছি। ম্যাকডাওয়েল জোচ্চোরের ল্যাংবোট হবার দরকার নেই।'

প্রাণগোপাল ধপ করে দাদার পায়ের ওপর পড়ে হাঁউমাউ করে ওঠে।

তাকে তুলতে তুলতে কৃষ্ণগোপাল বলেন, 'পেঁচি মাতালের মতো কাঁদিস নে। দু পাত্তর টেনেছিস, তাতে কি! পেঁচি মাতালদের আমি পছন্দ করি না।'

লম্বা মার্বেল করিডোর দিয়ে আসতে আসতে কৃষ্ণগোপাল অবাক হন। এত তাড়াতাড়ি নৌকাবিলাস শেষ? সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে অপরাধী মনে করেন।

হেমার সঙ্গে জীবনযাত্রার অন্যতম সেতু এই কৃষ্ণকীর্তন, রাস অথবা গার্ডেন-রীচে বাগানবাড়ি, কিন্তু এই সেতুতে তাঁরা দু'জনে খুব কমক্ষণই দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন অ বেশির ভাগ সময়ই এই সেতু অনুপাস্থত। মাসের পর মাস চলে যায়, বাগানবাড়ি যাওয়া হয় না, দিনের পর দিন কেটে যায়, হেমা তার ঠাকুরমশাই, কীর্তনপার্টি, পুজো-আচ্চা নিয়ে দিন কাটায়। তারপর একদিন ঝড় ওঠে।

সম্প্রতি কিংকর বলে যে ছোকরাটির খুব নামডাক হয়েছে সেই গাইছিল। গলায় হেমার দেওয়া সোনার হার। বেশ বিভোর হয়ে ছোকরা গায় এবং বিভোর হয়ে হেমা শোনে। কৃষ্ণকীর্তনের কৃষ্ণ একেবারেই মানুষ, মানুষের আকর্ষণ যেমন মানুষকে অভিভূত করে এবং বিভ্রান্তও করে অনেকটা সেইরকম আকর্ষণে আবিষ্ট হয়ে বসে থাকে শ্রোতারা। গান শেষ হবার পর হেমা অনেক সময় ভেবে দেখেছে, কৃষ্ণের হাবভাবে কোনো অলৌকিক ভাব নেই। একজন যুবক নির্জনে প্রায় ওৎ পেতে থাকে তার প্রেয়সীর জন্যে আর প্রেয়সী এলেই তাকে জড়িয়ে ধরবার তাল করে। প্রেয়সী নানারকম ওজর তোলে, বলে, সে আত্মীয়া, গুরুজন। গালাগাল করে, শাপও দেয়, কিন্তু নাছোড়বান্দা যুবক শেষ পর্যন্ত জেতে রাধার আত্মদানে।

নৌকাবিলাসখণ্ডে ব্যাপারটা আরো সোজাসুজি। নৌকো ডুবিয়ে মাঝনদীতে রাধার বিপন্নতার সুযোগে কৃষ্ণ তাকে সবলে আকর্ষণ করে। অপ্রাকৃত বলে আর কিছু নেই, সবটাই প্রাকৃত। আসলে কৃষ্ণকীর্তনে মন থেকে মানুষ শরীরে যায় না, শরীর শরীর করেই শেষ পর্যন্ত মনের দিকে মানুষ ধাবিত হয়। শরীরটাই প্রায় সব, কিন্তু শরীর যেহেতু জরায় আচ্ছন্ন হতে বাধ্য, সেই-জন্যে মন এসে যায়। দেহটা বাঁশি হয়ে বাজতে থাকে।

হ্যাজাকের আলোয় ঝলমলে দালানে যখন নেচে নেচে কিংকর গাইছিল, তখন ঘুরে ফিরে এই-সব কথাই মনে জাগে। কোনো-এক দুর্ধর্ষ পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, যে তাকে সবলে আকর্ষণ করবে এবং তাদের দু'জনের সমস্ত বাধা শেষ পর্যন্ত দেহের সম্ভোগে পালাবে, কোনো বাধা আর বাধা থাকবে না।

চিকের পেছনে তন্ময় হয়ে হেমা গান শোনে। গানের সঙ্গে সঙ্গে খোল কথা বলে। ঠিক এমনি সময় একটা সোরগোল ওঠে। চিক সরিয়ে হাত বাড়িয়ে শেঠেদের ছোট বউ কিংকরের পায়ের কাছে তার মতোর মালা ছুঁড়ে দেয়। কিংকর মাথা হেলিয়ে প্রণাম করে মালাটা তুলতে হাত বাড়াতেই হেমা চেঁচিয়ে

ওঠে, 'ছোঁবে না, ছোঁবে না। আমার বাড়িতে আমাকে অপমান!'

কিংকর ছোঁড়া কেষ্টর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। আফিম-ব্যবসায়ী শেঠের ছোট বউ দাঁড়িয়ে ওঠে। ঘোমটার ফাঁকে হীরের নথখানি দেখা যায়। দুজন পরিচারিকাও উঠে দাঁড়ায়। লোক কিছু বুঝবার আগেই তারা বেরিয়ে যায় খিড়কির দরজা দিয়ে।

কৃষ্ণগোপাল কীর্তনসভায় যখন প্রবেশ করেন, সবেমাত্র ঝড় বয়ে গেছে। হেমা তার পরিচারিকা দিয়ে মালা তুলে রেখেছে। কিংকর বসে পড়ে বোকা বোকা হাসছে, খোলবাদক মাঝে মাঝে খোলে আঙুল ঠেকাচ্ছে। কিংকর অবশ্য সামলে নেয় ব্যাপারটা। কৃষ্ণগোপাল এসে বসতেই গান সুরু হয়।

সে-রাতে শোবার ঘরে কৃষ্ণগোপাল পা দিতেই হেমা ফোঁস করে ওঠে, 'তুমি এত মেনিমুখো কেন বল তো? তোমার জন্যেই শেঠের বৌ আমাকে অপমান করতে সাহস করল। কী আস্পর্ধা! আমারই ঘরে বসে আমাকেই হেয় ক'রবি!'

সেজের ঠাণ্ডা আলোয় চমৎকার দেখায় হেমাকে, কৃষ্ণগোপালের কোনোকালেই অলংকারপ্রীতি নেই, বিশেষ ক'রে শয়নকক্ষে অলংকার তাঁর বড়ই অপছন্দ। অলংকার নারীকে আরো দূরে সরিয়ে দেয়, তার চেহারাকে দেয়ালে টাঙানো তৈলচিত্র বানায়।

'কী দেখছ ড্যাবড্যাব করে? তুমিই তো ঐ ব্যাটাকে ওঠালে। রেশমের ব্যবসা, আফিঙের ব্যবসা, এগুলোর কায়দাকানুন যদি তুমি না শেখাতে—'

'আর কেউ শেখাত।'

'বাজে কথা বোলো না, বাজে কথা বোলো না।' হাত নাড়তে নাড়তে হেমা তেড়ে আসে স্বামীর দিকে এবং এই-সব ক্ষেত্রে কৃষ্ণগোপালের যা বরাবর মনে হয় তা হল, এটা হেমার মনের কথা নয়। হেমার এই আস্ফালন শেঠের বৌ-এর আস্পর্ধা দেখে নয়। তার মন বোধ হয় ফাঁকা এবং ফাঁকা মনে সহজেই ঝড় ওঠে, যে-কোনো ছুতোয় যে-কোনোরকম নাটক ঘটে যায়।

'আমি একদিন মরব। বিষ খেয়ে মরব!' ঝলমলে স্বাস্থ্যে হেমা চেঁচিয়ে ওঠে।

'আমরা শনিবার গার্ডেনরীচ যাব।'

'ঐ তো! তুমি তো ঐ পার, যেন আমি তোমার বাগানবাড়িতে ফুর্তি করতে না পেরে মরে যাচ্ছি। তাও যদি বুঝতাম ভালোবাসতে। হিঁক সাহেব

তার জমাদারনীকে যা ভালোবাসে তার এক কণাও তুমি যদি বাসতে !'

এই ভালোবাসার প্রসঙ্গে কৃষ্ণগোপাল বরাবর ভোঁদা বনে যায়। আগে অনেক প্রতিবাদ করেছে, হেমাকে ছাড়া তার জীবনে যে অন্য কোনো নারীর স্থান নেই তা গলা কাঁপিয়ে বলেছে, ঝপ করে কয়েকবার কেঁদেও ফেলেছে, কিন্তু হেমার মন গলে নি। হেমা তাকে বরাবর এক অদৃশ্য কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে। হিকি সাহেবের প্রসঙ্গে তাঁর মন বেশি করে দমে যায়। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেন, 'কিসের সঙ্গে কিসের তুলনা ?'

হেমা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'ঠিকই তুলনা করেছি। রক্ষিতার চেয়েও আমার অবস্থা আরো খারাপ। হিকি সাহেব তার রক্ষিতাকে ভালোবাসে আর তুমি তোমার নিজের স্ত্রীকে ভালোবাসতে লজ্জা পাও।'

প্রবল ক্লান্তি উঠে আসে কৃষ্ণগোপালের শরীরে। একবার ঘুমন্ত রূপুর দিকে চায়। টপ করে যদি শুয়ে পড়া যেত আর ঘুমিয়ে পড়া যেত তা হলে বেশ হত, কিন্তু তার কোনো উপায় না দেখে বেজারভাবে বসে থাকেন উঁচু খাটের ওপর। হাত বাড়িয়ে একবার হেমাকে ধরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সে সাঁ করে সরে যায়।

'মেমসাহেবদের সঙ্গে তো দেখি বেশ...'

'যা জান না সে নিয়ে কথা বোলো না।'

'তা তো বলবেই। পুরুষমানুষ হয়ে জন্মেছ বলে মাথা কিনে নিয়েছ।'

কৃষ্ণগোপাল আঁচ করেন এ অবস্থায় যে-কোনো দিক থেকে আক্রমণ আসতে পারে, কাজেই আক্রমণ প্রতিহত করার প্রশ্ন ওঠে না। বেশি ঝগড়া করলে আজকাল তার বুক ধড়ফড় করে। এ কথাটা মনে হতে না হতেই হেমা বললে, 'যাক, আর কথা বলতে হবে না। আবার ডাক্তারবদ্যি ডাকতে হবে, বুক ব্যথা করবে। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।'

কৃষ্ণগোপাল শুয়ে পড়েন, কিন্তু ঘুম আসে না। ঘরের মধ্যে বড্ড গুমোট। টানা পাখাতেও খুব আরাম হয় না। গলগল করে ঘামেন। শনিবার বাগানবাড়ি যাওয়া হবে কি হবে না ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। যেতে হলে আগে থেকে প্ল্যান করতে হবে। হেমার সঙ্গে কোনো জিনিস প্ল্যান করা যায় না। গতবারও বাগানবাড়ি যাওয়া নিয়ে ঝড় উঠেছিল। হঠাৎ কাজের মধ্যে হেমা তার পরিচারিকা পাঠাল এবং কাজ মুলতুবী রেখে তারা তাদের জুড়িতে চেপে বসেছিল। শেঠের দুবৌ এবং শেঠ তাকে আর একবার বিবাহে মাঝে মাঝে

উৎসাহ দেয়। এ প্রস্তাব তাঁর ক্ষেত্রে অসম্ভব মনে হয়েছে। একটা বৌকে সামলাতেই তাঁর দম বেরিয়ে যায়, দ্বিতীয় বৌ-এর অবস্থান অসম্ভব। তার পর শেঠ অত্যন্ত খেড়ু লোক। দুই সতীনের অবিরত ঝগড়া সে অবলীলাক্রমে সামলায়। তা ছাড়া, যেটা সবচেয়ে কৃষ্ণগোপালের কাছে আশ্চর্যের কারণ, হেমার সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্যের কোনো কারণ নেই, তিনি তাঁর স্ত্রীর প্রতি যথেষ্ট আকর্ষণ বোধ করেন এবং হেমাও তাঁর অবিরত সঙ্গ চায়। অথচ একটা গোটা সপ্তাহ ঝগড়া ছাড়া কেটেছে এরকম স্মৃতি তাঁর নেই বললেই চলে।

আবছা অন্ধকারে হেমাকে দেখা যায়। সে তার ছেলের পাশে ইটকাঠের মতো শুয়ে আছে। একবার কৃষ্ণগোপাল আলগোছে তার হাতখানা হেমার গায়ে রাখতে গিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে হাতখানা ছুড়ে দেয় হেমা তার গা থেকে। উসখুস করতে করতে গরমে অসোয়াস্তিতে কৃষ্ণগোপালের ঘুম আসে।

হঠাৎ ঝড়ের গর্জনে তাঁর ঘুম ভাঙে। বিরাট বাড়ির কোথা থেকে সমানে দড়াম দড়াম করে দরজা পড়তে থাকে। মুষলধারে বৃষ্টি নামে। জলের প্রবল ছাট আসছিল, কৃষ্ণগোপাল উঠে জানলা বন্ধ করেন। প্রকাণ্ড ক্ষ্যাপা জন্তুর মতো ঝড়বৃষ্টি সারা শহরটার ওপর দাপাদাপি সুরু করে দেয়। তার পর সব ঠাণ্ডা। গুমোট ভাবখানা একদম কেটে গিয়ে ফুরফুর করে হাওয়া দেয়, কিন্তু মাঝে মাঝে ছাতের দরজাটা পড়তে থাকে।

কৃষ্ণগোপাল আস্তে আস্তে ওঠেন। হেমা অঘোরে ঘুমোয়। তার নাক দিয়ে সুঁই সুঁই করে শব্দ আসে। কাঁচের খেলনা না ভাঙবার সাবধানতায় কৃষ্ণগোপাল খাট থেকে নামেন। ছাতে উঠে এসে দেখেন চাঁদনিতে সারা শহর ভাসছে, জাহাজঘাটায় অসংখ্য জাহাজ-নৌকো জ্যোৎস্নায় স্থির। ভেজা চাঁদনিতে কলকাতাটা কি রকম মায়াটে লাগে। হেমার সঙ্গে কি আজীবন এইভাবেই চলবে? তাঁরা কি তাঁদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় এই মনোমালিন্যের অদৃশ্য ভূত তাড়িয়েই কাটাবেন?

কতক্ষণ সেই অবাস্তব সৌন্দর্যের মধ্যে কৃষ্ণগোপাল বসেছিলেন খেয়াল নেই। পিঠে হাত পড়তেই চমকে ওঠেন। হেমা উঠে এসেছে। চন্দ্রালোকিত গঙ্গার দিকে চেয়ে চেয়ে কৃষ্ণগোপাল নিজের মনেই বললেন, 'আমরা কি এরকমই থাকব হেমা? কোনো দিন কাছে আসতে পারব না?'

হেমা তার স্বামীর পিঠ আলিঙ্গন করে দাঁড়িয়ে থাকে। কৃষ্ণগোপাল ফিরবার চেষ্টা করেন, কিন্তু হেমা তাঁকে সবলে জড়িয়ে ধরে থাকে।

'চল, নীচে চল।'

'না, আর-একটু দাঁড়াও।'

৩

পরদিন আদালতে যাওয়া স্থির করলেন কৃষ্ণগোপাল। যদিও হেস্টিংসের কোন অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে কোন আবেদন অগ্রাহ্য হবার সম্ভাবনাই যথেষ্ট এবং খাল কেটে কুমীর আনার মতো বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে তবু একবার এটর্ণি হিকির সঙ্গে কথা বলবেন স্থির করলেন। লোকটা খুব চালিয়াৎচন্দর,, অসম্ভব খরুচে, যে-কোনো ছুতোয় বাড়িতে ভোজসভা ডাকে, কিন্তু স্বাধীনচেতা। সম্প্রতি সরকারের বিরুদ্ধে কেস করে পাগলা হিকিকে ছাড়িয়ে এনেছে, কিন্তু কোর্টের কাছাকাছি পালকি এগোতে না এগোতেই এক বিপর্যয়। দুড়দাড় করে বড় বড় থান ইট পালকির ওপর পড়ে। বেহারারা পালকি ছেড়ে পালিয়ে যায়। প্রবল ইটবৃষ্টি মুহূর্তের জন্যে থামতেই কৃষ্ণগোপাল পালকি থেকে নেমে কোর্টের সিঁড়ির দিকে দৌড়তে থাকেন। বোধ হয় মহরমের মিছিল, অনেক তাজিয়া, সড়কি, লাঠি নিয়ে ক্ষিপ্ত জনতা। এবার ধাঁ করে একটা ইট এসে পড়ল তাঁর মাথার ওপর, কিন্তু পাগড়ি থাকায় কোনোক্রমে রক্ষা পেলেন। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে হাঁফাতে থাকেন কৃষ্ণগোপাল। ক্ষিপ্ত জনতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে কোর্টের সামনে রাখা পালকিগুলো ভাঙছে। অবাক হয়ে কৃষ্ণগোপাল লক্ষ্য করলেন জনৈক ইংরেজ, বোধ হয় কোর্টের আণ্ডার-শেরিফ তার হাতের দণ্ডটা তুলে কি সব বোঝাচ্ছিলেন। হঠাৎ দু'টো ইংরেজ খালাসী এসে নাচতে নাচতে দণ্ডটা তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে বেরিয়ে গেল। আবার ইটের ঝড় বইতে থাকে। কোর্টের ভেতরে ঢুকে দেখলেন, সমস্ত কর্মচারী, এটর্ণি যে যেদিকে পারছে, পালাচ্ছে। এক ঝলক হিকিকে দেখতে পেয়ে কৃষ্ণগোপাল এগিয়ে গিয়ে তাঁর কেসের কথা বলবার চেষ্টা করেন। হিকি উত্তেজিতভাবে বললে, 'তুমি কি পাগল হয়েছ কৃষ্ণগোপাল? পালাও, মব্ আসছে তলোয়ার নিয়ে, যাকে সামনে পাবে কাটবে।'

কৃষ্ণগোপাল আদালতে ঢুকে দেখলেন জাস্টিস-হাইড, জাস্টিস-চেম্বারের আসন খালি, পেশকার, উকিল কারুর টিকি নেই। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে একদল সৈন্য এসে ঢুকল। জানলার ফাঁক দিয়ে কৃষ্ণগোপাল দেখলেন, সৈন্যদের

আবির্ভাবে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়েছে বটে, কিন্তু একটু দূরে দূরেই জটলা করছে, মাঝে-মাঝে এগিয়ে এসে ইট ছুড়ছে।

এই হঠাৎ ইংরেজ-বিরোধী অগ্ন্যুৎপাতের সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণগোপাল ভাবেন, এরকম সাময়িক উত্তেজনা কি কোনোদিন দানা বাঁধবে? সমস্ত বাণিজ্য, শাসন ধীরে ধীরে বিদেশীদের করতলগত হতে চলেছে। কে প্রতিবাদ করবে? এই নতুন নবাবদের কে ঠেকাবে? মুর্শিদাবাদে ইংরেজদের পুতুল নবাব ব্যাধি ও লাম্পট্যে জরাজীর্ণ। মারাঠা আর ডাকাতদের ভয়ে তটস্থ এদেশী বণিক-সমাজ প্রতিবাদ করবে যারা স্বেচ্ছায় ইংরেজদের জালে জড়িয়ে পড়েছে? গত একঘণ্টার প্রবল উত্তেজনায় বেশ একটা আনন্দ ছিল। হয়ত ধর্মীয় প্রতিবাদ, কোর্টের সামনে মহরমের বাজনা বন্ধ করে দেওয়ায় ক্ষিপ্ত উত্তেজনা, কিন্তু এইরকম ক্ষ্যাপামি বহুদিন কৃষ্ণগোপাল দেখেন নি। নীচে এসে দেখলেন। দেশলাইয়ের বাক্সের মতো তাঁর পালকিটা ভেঙে মচকে পড়ে আছে আরো কতকগুলো পালকির সঙ্গে, দুটো ফিটনের ভাঙ্গা চাকা সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ে আছে।

এটর্ণি হিকিও এসে দাঁড়িয়েছে। ভাঙা পালকিটার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'একেবারে পাগলামো! কোনো-মানে হয় না।'

'মাঝে মাঝে পাগলামো মন্দ লাগে না। পালকিটা না ভাঙলে আমার ভালোই লাগত।'

'খুব বিপজ্জনক কথা বলছ কৃষ্ণগোপাল।'

কৃষ্ণগোপাল হেসে বললেন, 'তুমিও খুব বিপজ্জনক লোক হিকি সাহেব। সেই-জন্যেই বললাম।'

তার পর প্রস্থানোদ্যত হিকির দিকে চেয়ে বললেন, 'আমি আপনার কাছেই এসেছিলাম।'

'আপনার জাহাজ আটক, শুনেছি।'

'ভাবছিলাম কেস করা যায় কি না।'

'করতে পারেন। আমি কালকেই করে দিতে পারি, কিন্তু পাগলা হিকি আর কৃষ্ণগোপাল দে দু'জন আলাদা লোক। পাগলা হিকির কিছু এসে যায় না, কিন্তু আপনি ভেবে দেখবেন, আপনার কিছু এসে যায়। তাই না?'

কৃষ্ণগোপাল চুপ করে থাকেন।

'যদি বলেন, আমি কালই করে দিচ্ছি।'

কৃষ্ণগোপাল ভাঙাচোরা পালকি, ফিটনের ওপর দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়েছিলেন। সেদিকে চেয়েই বললেন, 'নাঃ, থাক। ভেবে দেখলাম, আপনি যা বললেন তাই ঠিক।

ফিরে এসেই বগি জুতেতে বললেন কৃষ্ণগোপাল। অনেক দিন পর একটা খুশির হাওয়া উঠেছে তাঁর মনে। মনে মনে মেনে নিয়েছেন, একলা কিছু করার নেই। গত পুরো একটা বছর ধরে তাঁর ব্যবসার উত্থান-পতনের সঙ্গে দেশকালের কথা ভেবেছেন এবং ভেবে কোনো কিনারা করতে পারেন নি। দেশ মানে জমিদার, ফৌজদার, মোহান্ত, ডাকাতের সর্দার অথবা বণিক-সম্প্রদায়। প্রত্যেকেই নিজের নিজের জগতে স্বয়ংসম্পূর্ণ। এত বড় দেশ জুড়ে এমন কিছু করার নেই যা সবাইকে একসূত্রে বাঁধতে পারে। সম্প্রতি দক্ষিণে মহীশূরের বিক্রম নিজাম মারাঠাদের সঙ্গে কোন মোর্চায় সংহত হয় নি। ভারতবর্ষের এই একসূত্রতার অভাব সর্ব স্তরে। মাঝে মাঝে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করে, কিন্তু অসহিষ্ণু হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ করে শেষ পর্যন্ত সামলানো অসম্ভব। যে-কোনো ছুতোয় গারদ হয়ে যাচ্ছে, ইংরেজরা যা ভাবা গিয়েছিল ঠিক সেরকম নয়। এখন একটু এদিক ওদিক হলেই তাঁরা দাঁত, নখ দেখাচ্ছে। সামান্য কয়েকটা কেস নেটিভদের পক্ষে গেলেও ইংরেজদের ন্যায়বিচার প্রধানতঃ ইংরেজদেরই জন্যে, ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার জন্যে। কৃষ্ণগোপাল আর এ-সব ভাবতে চান না, তিনি তাঁর জাল গুটিয়ে নিতে চান। শোনা যাচ্ছে, এদেশী বণিকরা জমিদারি কিনছে। এইরকম একটা অফার এসেছে, মুর্শিদাবাদের লাগোয়া একটা জমিদারি। নিলামে উঠেছে, কলকাতার দক্ষিণেও আর-একটা জমির ডাক উঠেছে। অথবা নীলের ফ্যাক্টরি করবেন? কোম্পানি থেকে নীলচাষে খুব উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে জেলায়, জেলায়। যাই হোক, যে সাম্রাজ্য তিনি তৈরি করেছেন তা ভাঙতে ভাঙতেও রুপুর চলে যাবে। ভাবতে তাঁর মন বিদ্রোহ করে, কিন্তু ধনী ব্যানিয়ানদের ছেলেগুলো একেবারে বাঁদরে পরিণত হচ্ছে। সেটা যাতে না হয় দেখতে হবে, কিন্তু জাহাজ কিনে আমদানি-রপ্তানির যে ব্যবসা ফাঁদবেন ভাবছিলেন, বলতে কি একটা গোটা বছর যার প্ল্যানিং করেছেন তা থেকে সরে আসতে হবে। কৃষ্ণগোপাল আর ভাবতে পারেন না। অন্দরমহলে পা দিয়েই হাঁক দেন, 'হেমা, হেমা'।'

'এই অসময়ে?'

'হ্যাঁ, আর ভালো লাগছে না, এই কাজ, কাজ আর কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা, চলো

পালাই।'

হেমা চোখ মটকে বললে, 'তুমি বেশ করলে যা হোক—ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।'

'ঠিক বলেছ, গাড়ি জুড়তে বলেছি। খেয়েদেয়েই রওনা দেব।'

কৃষ্ণগোপাল বগি হাঁকান। দুই আরবী ঘোড়া ঝড়ের মতো চলে। হেমা আর রূপু মাঝে মাঝে চেঁচায়, 'আরো জোরে! আরো জোরে।' দু-তিনটে সাহেবি ফিটন ওভারটেক করেন কৃষ্ণগোপাল। গাড়ির পেছনে পাদানিতে বল্লমহাতে দুই চোবদার হাঁক ছাড়ে, 'হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার!'

নীল আকাশে ঢাক বাজছে। এই শরতে কলকাতার আকাশটা কৃষ্ণগোপালের ছেলেবেলা থেকেই ভালো লাগে। এই সময়টা থেকে সারা শীতকাল কৃষ্ণগোপাল তাঁর কাজে ভবিষ্যতের স্বপ্নে মেতে থাকেন। রাস্তায় এক এক জায়গায় প্রবল খানাখন্দ আর জল। এক জায়গায় ঘোলা জলে ঘোড়ার প্রায় হাঁটু ডুবে যায়। রূপু চেঁচিয়ে ওঠে, 'জাহাজ, জাহাজ। আমরা জাহাজে চেপেছি।'

বিষয়-সম্পত্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ধনীদের মধ্যে, বিশেষ করে ধনী বঙ্গসন্তানদের মধ্যে যে শারীরিক জবুথবু ভাব আসে তা এখনো কৃষ্ণগোপালকে বিশেষ স্পর্শ করে নি। বাড়ির পেছনে কুস্তির আখড়ায় এখনো মাঝে মাঝে যান। ভোরে ঘোড়ায় দৌড়ান। অঙ্গসঞ্চালনে যে প্রবল আনন্দ তা থেকে এখনো তিনি বঞ্চিত নন।

শহর যত দূরে যেতে থাকে, ততই ঘন সবুজে চার পাশ ঢেকে যায়। মাঝে মাঝে রাস্তার ওপরে গাড়ির মাথায় ফুলন্ত গাছের ডাল দোলে। খরগোশ পালায়। শিবমন্দির, জমিদারের কাছারিবাড়ি, হাট বসার জন্যে বিরাট আট-চালা, আর সারি সারি ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে নিকানো উঠোন, লাগোয়া মাটির বাড়ি। রথতলায় পিতল-আঁটা কাঠের রথ, রুপোর পালকি। গার্ডেনরীচের রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ডাকাতমুক্ত, যদিও রাতে চলাফেরা, বিশেষ করে গাড়িতে চলাফেরা বিপজ্জনক। রাস্তার ওপরেই দোতলা পাকা ফৌজদারের বাড়ি, এখন এ অঞ্চলের থানা। পাগড়ি-আঁটা কোম্পানীর তেলেঙ্গী সিপাই পাহারা দিচ্ছে। মাঝখানে মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চল, সেখানে প্রচুর লাল, নীল নিশানা, তাজিয়া, তারপর এ অঞ্চলের প্রবল-প্রতাপান্বিত জমিদারের নতুন বাড়ি উঠছে। ভদ্রলোক নাটোরের রাজার গোমস্তা ছিলেন, অনেক পয়সা করেছেন,

এখন জমিদারি কিনছেন। মন্দ না, নিঝ'ঞ্ঝাট, ভাবনা নেই, কিন্তু…কৃষ্ণগোপাল সপাং করে চাবুক মেরে বলে ওঠেন, 'মজাও নেই।'

রূপু সীট থেকে প্রশ্ন করে, 'কিসে মজা নেই বাবা?' কৃষ্ণগোপাল সীট থেকে মুখ ফিরিয়ে হেসে বলেন, 'আস্তে চলায় মজা নেই।'

এর পর ওয়াটসনের জাহাজ ফ্যাক্টরি। বিরাট কাঠগুদাম ও তিনতলা বাড়ি। উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা মস্ত অঞ্চল থেকে কামার-ছুতোর-কারিগরদের গলার আওয়াজ ভেসে আসে। এই ওয়াটসন লোকটার সঙ্গে বরাবর একটা আত্মীয়তা অনুভব করেন কৃষ্ণগোপাল। লোকটা বিদেশী মাটিতে লাখ লাখ টাকা ঢেলে একটা অ্যাডভেঞ্চার করেছে, কিন্তু তার পরিকল্পিত জাহাজঘাট, জাহাজ-নির্মাণের পরিকল্পনায় ক্রমশঃ ভাঁটা পড়ছে। কোম্পানি এই ধরণের ব্যবসায় উৎসাহিত নয়, কোম্পানি ফোকটে লাভ চায়, তাই কৃষ্ণগোপালের বিশ্বাস এদেশের রেশমব্যবসায়ী কটন পিস গুডস্ ব্যবসায়ীদের মতো ওয়াটসনও অস্তাচলের পথে। গত এক বছরেই কথাটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এদেশে জাহাজ তৈরি হোক কোম্পানি তা চায় না।

'আমরা এসে গেছি! এসে গেছি!'

বাতি-আঁটা খোলা গেটের দু'জন সজ্জিত দারোয়ান অভিবাদন জানায়। গম্ গম্ করে কৃষ্ণগোপালের গাড়ি ঢোকে বাগানবাড়িতে।

'আমি ক্লাইভ! আমি রবার্ট ক্লাইভ।' বলেই রূপু সহিসের ছেলে রামরতনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

রামরতন একটা ফুলন্ত রঙ্গনের ঝোপের পেছনে দৌড়ে গিয়ে বলে, 'দাদাবাবু, আমাকে মারবে না, হামি মাকে বলে দেব।'

রূপু তার লাল নাগরাপরা পাখানা সামনের দিকে বাড়িয়ে বললে, 'আমি তোকে খুব একটা আস্তে মারব। আর তুই অমনি জিভ বার করে মরে যাবি।'

'হামি কেন মরব? হামি মরব না।'

'দূর বোকা! তুই সিরাজদ্দৌল্লা। সিরাজদ্দৌল্লা অমনি করে মরে যায়।'

নেড়ামাথা ছেলেটা ঝোপের ফাঁক থেকে চেঁচায়, 'হামি হিন্দু আছি, হামি মুসলমান না।'

'তুই একেবারে বোকা, ঘোড়ার ঘাস খা।' ব'লে বাঁশের কঞ্চি নিয়ে থোকা থোকা ফুলগুলো কাটতে থাকে রূপু। কয়েক থোকা মাটিতে পড়ে, কয়েক থোকা

ডালে মচকে ঝুলতে থাকে।

'রুপু, এ কি করছিস?' হেমা এসে বললে।

'আমি ক্লাইভ, শত্রুসৈন্য ধ্বংস করছি। রামটা এমন বোকা, সিরাজ হয়েছে, মরছে না।'

'রাম, তুই ঘাস কাটতে যা। আর মালিকে বল এখানে দুটো চেয়ার দিতে।' ছেলের হাত ধরে হেমা বললে, 'অনেক যুদ্ধ করেছ। এখন বল তো পণ্ডিত-মশাই তোমাকে কী পড়াচ্ছে?'

রুপু সুর ক'রে ব'ললে, 'নরঃ নরৌ, নরাঃ, বেঞ্চির ওপর দাঁড়া। আমি কিন্তু মা জাহাজের ক্যাপ্টেন হব। বাবা যে জাহাজ বানাচ্ছে, আমি তার ক্যাপ্টেন, চীনে যাব।'

'আমাকে সঙ্গে নিবি তো?'

'নাঃ।'

'কেন, আমাকে নিবি না কেন?'

'তুমি সব সময় কানের কাছে এটা খাও, সেটা খাও করো।'

হেমা হেসে বললে, 'তা হলে তুই শত্রুসৈন্য ধ্বংস করবি কী করে?'

'আমি ব্যাঙ মারব।' ব'লেই কতগুলো পাথর কুড়িয়ে কলাবাগানের পাশ দিয়ে পুকুরঘাটের দিকে দৌড়য়।

মালি চেয়ার দিতে না দিতেই কৃষ্ণগোপাল আসেন।

'রুপু কি বলছিল জানো? রুপু বলছিল, ও রবার্ট ক্লাইভ।'

'রুপু ঠিকই বলছিল, হারা পার্টির নায়ক কেউ হতে চায় না!'

'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করো। এখনো নবাব আছে। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ জায়গাই তো ইংরেজদের দখলের বাইরে।'

'আস্তে আস্তে সব দখল হয়ে যাবে। দেখছো না, চব্বিশ পরগণা থেকে সুরু হ'ল, তারপর ধীরে ধীরে একটার পর একটা জেলায় কেমন পুরো বাংলা সুবার শাসনক্ষমতা নিয়ে নিচ্ছে। ব্যাটাদের এই মুখোশটা মাঝে মাঝে টেনে খুলে দিতে ইচ্ছে করে! বাইরে নবাবের বশংবদ ভৃত্য আর তলে তলে নিজেদের জাল বিছিয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার বোধ হয় মাথায় গণ্ডগোল হয়েছে। সব সময় এক কথা। সবাইয়ের যা হবে, আমাদেরও তাই হবে।'

এমন সময় রুপু হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তে আসে, 'সাপ, সাপ! বিরাট সাপ! এত

বড় ফণা।'

কৃষ্ণগোপাল দাঁড়িয়ে উঠে হাঁক দেন, 'মালি, মালি।' সহিস, মালি, বরকন্দাজরা ছুটে আসে লাঠি নিয়ে। বিরাট সাপ মারা পড়ে, জাত গোখরো। মালি একটা লাঠিতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসে।

রূপু বললে, 'মা, সাপের মাংস খায় ?'

হেমা স্বামীকে বললে, 'আমি তোমাকে বরাবর বলেছি, আমার এইরকম বনবাদাড় ভালো লাগে না তোমারই পাশে দেখ না, হিকি সাহেবের বাগান। কি রকম চমৎকার লন, ঝক্‌ঝকে, তক্‌তকে। আর তোমার বাগানটা ভূতো ভূতো, এই বাঁশঝাড়টা কেটে দাও না। তোমার বড্ড সেকেলে সব ধারণা।'

'ঠিক আছে, তাই হবে।'

যদিও বাঁশঝাড়, কলাবাগান, আম, কাঁঠাল, শিমুল, পলাশ, বাদামের ছায়ায় ঢাকা তাঁর বাগানটা কৃষ্ণগোপালের বড় প্রিয়, পশ্চিমের জানলা থেকে শীতকালে তামারাঙা বাদামের বড় বড় পাতাগুলো সূর্যাস্তের আভায় বড় মনোরম লাগে এবং ভোরে বাঁশঝাড়ের মাথায় এক ঝাঁক তারায় চোখের বড় আরাম, তবু যুগের হাওয়া পাল্টে যাচ্ছে, হেমা যা বলেছে, তাই ঠিক। ছিম্‌ছাম্‌ থাকাই ভালো, তা ছাড়া সাপখোপের ভয় আছে। মালিকে ডেকে হুকুম দিলেন, বাঁশঝাড়, বাদাম, শিরীষ আর দুটো কাঁঠালগাছ কেটে লন বানাতে, স্থির করলেন একটা লন মোয়ারও কিনে দেবেন মালিকে।

বিকেলে গঙ্গায় বড় শোভা। বজরার জানলা দিয়ে ঢেউ দেখতে দেখতে হেমা বলে, 'আমি মাঝে মাঝে অমন চেঁচামেচি করি কেন বল তো ?'

কৃষ্ণগোপাল জানেন, হেমা কি বলবে। বলেন, 'আমি ডাক্তারও নই, হাতও গুণতে জানি না।'

'দূর। ডাক্তার কী করবে ?'

কৃষ্ণগোপাল বুঝতে পারেন না, আবার নতুন কোনো ঝড় উঠবে কিনা। 'দ্যাখো। দ্যাখো!' আঙুল দিয়ে জানালার বাইরে দেখান। 'একটা মস্ত বড় জাহাজ আসছে। বোধ হয় যুদ্ধের জাহাজ।' রূপু ছইয়ের বাইরে এসে চিৎকার করে। 'কামান, কামান। বাবা, যুদ্ধের জাহাজ। আমি ক্যাপ্টেন!' একটা লাঠি হাতে সে নৃত্য ক'রতে থাকে।

বত্রিশ কামান আঁটা 'রেজলিউশান' গার্ডেনরীচের জাহাজঘাটা থেকে বন্দরে ঢুকছে। কৃষ্ণগোপালের মনে পড়ে যায়, দিন সাতেকের মধ্যেই বিরাট খানাপিনা

হবে এই জাহাজে, কোম্পানির অফিশিয়ালদের মধ্যে ইতিমধ্যেই সাজ সাজ পড়ে গেছে।

বড় বড় ঢেউ ওঠে, নৌকো দুলতে থাকে।

'আমি চেঁচাই, তার কারণ তুমি তো আমাকে ভালোবাস না।' হেমা বললে। হেমা আগেও এই অনুযোগ করেছে এবং কৃষ্ণগোপাল যে উত্তর আগেই দিয়েছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি করেন। হাত বাড়িয়ে হেমার হাত ধরে বললেন, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝছ হেমু। আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই ভালবাসি না।' গতবার ঠিক এই বক্তব্যের মাথায় ঝড় উঠেছিল, সে রাত্তিরে সে খায় নি, দু'দিন ইটকাঠের মতো হয় বসেছিল অথবা শুয়েছিল, কিন্তু এবারে সে শান্তভাবে বললে, 'না, তুমি কাউকেই ভালোবাস না, আমাকেও না, তুমি ভালোবাস তোমার রেশমের পেটি। তোমার জাহাজটি লণ্ডন থেকে আসছে মাল নিয়ে, সেটা ডুবল কিনা তার জন্য তুমি এত ভয় পাও যা আমার শরীর খারাপ হ'লেও পাও না। খালি টাকা, খালি টাকা, এত টাকায় কী হবে যদি মানুষের মন বলেই কিছু না থাকে?'

কৃষ্ণগোপাল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না, এটা ঠিক শুধু টাকার ব্যাপার না হেমু, এটা, বিশ্বাস কর, একটা গোটা জীবনের ব্যাপার, শুধু ভালবাসা দিয়ে এই জীবনটা ভরিয়ে রাখা যায় না।'

হেমা মাথা নাড়িয়ে বললে, 'ঠিক উল্টো, ঠিক উল্টো, ভালোবাসাই সব।'

কৃষ্ণগোপাল তাঁর মোটা থাবাটা হেমার হাতের ওপর রেখে বললেন, 'বিশ্বাস কর হেমু, ভালোবাসাই সব নয়। ভালোবাসাই সব হতে পারে না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজের মনেই বললেন, সংস্কৃত সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, শুধু ভালোবাসা ভালোবাসা করেই কেঁদে মোলো। জীবনটা শুধু কাঁদবার ব্যাপার না, জীবনটা গড়বার ব্যাপার হেমু।

হেমা সহসা কৃষ্ণগোপালের বুকে ঝোলানো ঘড়িটা টানতে টানতে বলে, 'আমি তোমার ও-সব কচকচি বুঝি না, বুঝি না।'

'বুঝো না, বুঝো না, বুঝতে হবে না,' কৃষ্ণগোপাল তাঁর স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন।

'তা হলে কিন্তু চেঁচামেচি করব। সুযোগ পেলেই চেঁচাব।'

'তুমি না চেঁচালে আমার কিরকম যেন লাগে, মনে হয় চারদিকটা কেমন মরা মরা।'

'তবে ?'

কৃষ্ণগোপাল হেমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'আমরা চেঁচাব আবার আদর করব। কেমন ?'

দূর থেকে রূপু চেঁচিয়ে ওঠে। সম্প্রতি সে যে যাত্রা দেখেছে, সেই ঢংয়ে সে অদৃশ্য দর্শকদের আহ্বান জানায়, 'সবাই শুনুন ! সবাই শুনুন ! বাবা মাকে চুমু খাচ্ছে।'

'তুমি বড্ড আদর দিচ্ছ ছেলেটাকে', কৃষ্ণগোপাল বললেন।

হেমা বললে, 'কে বেশি আদর দেয় !'

আবির-রাঙা গঙ্গার ওপরে এক ঝাঁক গাংচিল পাখসাট খায় আর মাছ ধরে। পালতোলা কাঠের জাহাজে সূর্যাস্তের বাহার, বড় বড় পালগুলোয় যেন একসঙ্গে আগুন লেগেছে। কৃষ্ণগোপাল সেদিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলেন এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীই তো ইংরেজদের সবচেয়ে বড় আশ্রয়। যদি এ নদী না থাকত তা হলে ইংরেজ কেন, ফরাসী, দিনেমার, পর্তুগীজ সমস্ত ব্যবসায়ীদেরই বাংলাদেশে এমন গেড়ে বসবার সুবিধে হত না। হঠাৎ রূপু চেঁচিয়ে ওঠে, 'দেখো দেখো, কি সুন্দর নৌকো !'

চমৎকার সাজানো আট-দাঁড়ির পানসিখানা তরতর করে কৃষ্ণগোপালের বজরাকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। মাল্লাদের মাথায় হলদে পাগড়ি, নীল কুর্তা, সাদা ধবধবে প্যাণ্ট সূর্যাস্তের আলোয় ঝলমল করে। সামনে পাশাপাশি আসনে বিপত্নীক হিকি সাহেব ও তাঁর জমাদারনী। হিকি রুমাল উড়িয়ে সম্ভাষণ জানায় 'গুড্ ইভনিং কৃষ্ণগোপাল।'

পানসি বেরিয়ে গেলে হেমা মুখ ভার করে বললে, 'তুমি যেন কেমন সেকেলে।'

কৃষ্ণগোপাল হাসেন। 'তোমার ঐ রকম দাঁড়িমাল্লার সং পছন্দ ?'

'হ্যাঁ পছন্দ।'

রূপু বললে, 'হ্যাঁ বাবা, আমাদের মাঝিদেরও ঐ রকম পোশাক করে দাও। আমরা তা হলে রাজার মতো যাব।'

'বলো নবাবের মতো,' কৃষ্ণগোপাল বললেন।

বাড়িতে ফিরে দোতলায় পশ্চিমের বারান্দায় বসেছিলেন কৃষ্ণগোপাল। ইংরেজদের দেখাদেখি তাঁদের বাড়িতেও সম্প্রতি চায়ের আমদানি হয়েছে। চায়ের পট থেকে বেয়ারা চা ঢালছিল, এমন সময় প্রাণগোপাল হাজির।

প্রাণগোপাল ঢুকেই বললে, 'দাদা, তোমার মাল আনার কণ্ট্রাক্ট কোম্পানি

খারিজ করে দিয়েছে।'
কৃষ্ণগোপাল আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'সে কী? কবে?'
'আমাকে ম্যাকডাওয়েল সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'
কৃষ্ণগোপাল স্থাণুর মতো বসে থাকেন। রেশম ও কটন পিস গুডস ছাড়াও তাঁর অন্যতম ব্যবসা জাহাজ ভাড়া করে লণ্ডন থেকে কলকাতায় মাল আমদানি, রপ্তানি। তাঁর ব্যবসায় অর্ধেক লাভ নির্ভর করছে এই কাজের ওপর। এ কাজটা সম্পর্কে কোম্পানির ডিরেক্টররা পর্যন্ত খুশি ছিলেন। হঠাৎ কী হল?
'কে এই কণ্ট্রাক্ট পেল?'
'অ্যাক্রয়ড।'
'অ্যাক্রয়ড? আশ্চর্য! সেই ফেরেববাজ লোকটা। ও তো দুদিনেই কোম্পানিকে ডোবাবে।'
প্রাণগোপাল ক্লান্ত গলায় বললে, 'আমিও দাদা, ঐ কথাটাই বললাম। অ্যাক্রয়ড সাহেবের কোনো সুনাম নেই বাজারে।'
'ম্যাকডাওয়েল কী বললে?'
শুকনো হেসে প্রাণগোপাল বললে, 'ম্যাকডাওয়েল বললে, তোমাদের এ-সব না ভাবলেও চলবে। অ্যাক্রয়ড আমার স্বদেশবাসী।'
'বুঝলাম। ঐটাই কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসার একমাত্র মাপকাঠি।'
হেমা চটে উঠে বললে, 'এখানে দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসেছ। এখানেও ব্যবসার কথা, টাকার কথা?'
কৃষ্ণগোপাল বললেন, 'প্রাণকে চা দাও।' তার পর হেমার দিকে ফিরে বললেন, 'এটা শুধু টাকার কথা নয় হেমু, টাকার কথা নয়। এটা আমাদের সবাইয়ের বাঁচা-মরার ব্যাপার। হয়ত…'
'হয়ত কী?' এই প্রথম স্বামীর দিকে চেয়ে অবস্থার গুরুত্ব অনুভব করে হেমা।
'হয়ত আমাদের এই বাগানবাড়ি, বজরা, গাড়ি এই সবকিছু বেচে দিতে হবে।'

তৃতীয় পর্ব

'আমার সম্পর্কে কী শুনছ ?' ম্যাকডাওয়েল তার চকচকে টেকো মাথা দুলিয়ে প্রশ্ন করে।

'তোমার সম্পর্কে শুনেছি, কটন আর সিল্কে পাঁচ লাখ আর স্লেভ ট্রেডে পাঁচ লাখ করেছ।'

ম্যাকডাওয়েল হাসিতে ফেটে পড়ে। কি বলছ ? দশ লাখ জোগাড় হলে ত আমি আসছে সপ্তাহেই জাহাজে উঠব।'

'সেটাও শুনেছি। মিস ক্র্যাফটনের সঙ্গে বিয়ে হবার মাস-তিনেকের মধ্যেই তুমি পাড়ি দিচ্ছ, কাকা।'

'বাঃ, তুমি যে গেজেট হয়ে পড়েছ। ক্যালকাটা গেজেটটা এডিট করার ভার তোমার হাতে ছেড়ে দিলেই ভালো হয়, চার্লস।'

'তুমি তো জানো, কাকা, ক্যালকাটা গেজেট এ-সব আজেবাজে খবর ছাপে না।' বলবার সঙ্গে সঙ্গে চাপা বিদ্রূপে ম্যাকিনটশের মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

'দ্যাটস রাইট। দ্যাটস রাইট। তুমি ভালো শেপ করছ, চার্লস।'

তার পর ঘাড় হেলিয়ে বললে, 'আমি যাই করি না কেন, তোমার কাকাকে ছাড়াতে পারব না। সত্যিই পিটার ম্যাকিনটশ একজন গ্রেট ম্যান। গ্রেটনেস কাকে বলে ? শুধু নিজে বড় হলেই হয় না, অন্যকেও যে বড় হতে সাহায্য করে, সেই গ্রেট। আমি তো সত্যি কথা বলতে কি, তারই হাতের কাজ। আমি তোমাকে দেখি, আর পঁচিশ বছর আগে, নিজেকে কল্পনা করি। তোমার মতোই আমি রেভলিউশনারি ছিলাম।

চার্লস ম্যাকিনটশ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

'হ্যাঁ, রেভলিউশনারি ছাড়া কি ! তোমার ·স্লেভ ট্রেডে যেতে আপত্তি। অথচ এই বছর-দুই হল কটন আর রেশম মার খাচ্ছে। ইণ্ডিগো, স্লেভ আর ওপিয়াম চড়চড় করে উঠছে। তোমাকে মনস্থির করতে হবে চার্লস। তুমি কদ্দিন এ শহরে আছ ?

জানলা দিয়ে নবীন শীতের হাওয়া আসে। বাগানে একটা আমলকীগাছ হাওয়ায় লুটোপাটি খায়। সেদিকে চেয়ে ম্যাকিনটশ বললে, 'সামনের সোম-

বারে তিন মাস হবে।'

'তা হলে ?'

চার্লস ম্যাকিনটশ চুপ করে থাকে।

'তা হলে কি বুঝছ না ?

'সত্যিই বুঝছি না, কাকা।'

'গোকুল মুখার্জি বিল দিয়েছে ?'

'আমি বলেছিলাম। বললে, ছ মাস যাক, অত তাড়াহুড়োর কি আছে।'

মোটা তর্জনী তুলে ম্যাকডাওয়েল বললে, 'আমি তোমাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলাম। তুমি ফাঁদে পড়বে। ঠিক তাই হয়েছে। একবার হিসেব করেছ, কত খরচা হয়েছে এই তিন মাসে ?

'একসঙ্গেই করব।'

'নাঃ! তুমি এখনো মানুষ হও নি, চার্লস। কত মাইনে দেয় তোমাকে কোম্পানি ?'

'একশো চল্লিশ পাউন্ড বছরে।'

'তা হলে ? এবারে তা হলে অর্থ বুঝেছ ?'

ম্যাকিনটশ আত্মগতভাবে বললে, 'তুমি হয়ত ঠিক বলছ, কাকা। শুধু চাকর-বাকরেই দুশো-আড়াইশো টাকা খরচ, তার ওপর গোকুলের কমিশন, খাওয়া-দাওয়া। আর তোমার কাছে ঢাকব না, আমি আজকাল বোধ হয় একটু বেশি পান করছি।'

'তার মানে তুমি পুরুষমানুষ হয়ে উঠছ। এতদিন বালক ছিলে।'

তারপর উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে উঠে ঘরের মধ্যে নাটকীয় ভঙ্গিতে পায়চারি করতে থাকে ম্যাকডাওয়েল, 'দ্যাখো, ঐ রকম কেরানির মতো কথা বোলো না। তা হলে চিরকাল কেরানি হয়ে থাকবে। এখানে এসেছ বড় সাহেবদের মতো থাকতে, অঢেল টাকা রোজগার করতে। তুমি টাউনশেন্ড কোম্পানির লোক নও। তুমি জন কোম্পানির কর্মচারী।' তার পর হাতের তালুতে তালু ঘষতে ঘষতে বললে, 'একটা কিছু অবিলম্বে করা দরকার। অবিলম্বে করা দরকার। দাঁড়াও, তুমি বারোজের সঙ্গে দেখা করো, আমি চিঠি দিচ্ছি।'

'কোন্ বারোজ ? এটর্ণি ?'

'দূর! নদীয়ার কালেক্টার। দাঁড়াও, একটা চিঠি দিচ্ছি।'

বোর্ড অফ ট্রেডের মোহর-আঁকা বিলিতি মোটা কাগজে রুপোর দোয়াতদানে

কলম ডুবিয়ে ডুবিয়ে ম্যাকডাওয়েল খস খস করে লেখে :

প্রিয় বারোজ,

পিটার ম্যাকিনটশকে নিশ্চয় ভুলে যাও নি। তোমার আমার প্রথম ২০% তারই অবদান। আমি যাকে পাঠাচ্ছি, চার্লস, সে পিটার ম্যাকিনটশের ভাইপো। তুমি তাকে তার প্রথম ২০% পাওয়ার ব্যবস্থা করবে।

তোমার এলাকায় যে-সব রেশমের আড়ং তার মধ্যে নন্দীগ্রাম না নবগ্রাম— আমার ঠিক মনে নেই, সম্প্রতি যেখানে আমাদের রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্টের বরকন্দাজ খুন হয়েছে, সেখানে বোধ হয় একটা আড়ং এখনো 'আনকাভাড' আছে। ওখানে চার্লসের একটা ব্যবস্থা হতে পারে।

তোমার গিন্নিকে বলবে, তাঁর আতিথেয়তায় মিস ক্র্যাফটন মুগ্ধ। আমাকে সে বলেছে, কাউন্সিল মেম্বারের বাড়িতেও সে এত চমৎকার স্টাফড পিকক্ খায় নি। সত্যিই অপূর্ব হয়েছিল।

আর তো মাত্র পনেরটা দিন। আমি রোজ সকালে ক্যালেণ্ডারে লাল পেন্সিলের দাগ কেটে অতীত বিদায় দিচ্ছি। আর অনেক কাল নেটিভ মহিলাদের সাহচর্য করলাম। এবার স্বদেশী মহিলার সংস্পর্শে এসে জীবনটা ধন্য করতে চাই। তুমি বিশ্বাস করো, জন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যৌবন আমার একটুও কমে নি, বরঞ্চ বেড়েছে। তুমি হেসো না, দরকার হলে আমি ডিমনস্ট্রেশান দিয়ে প্রমাণ করতে পারি।

যাই হোক, চার্লসের ব্যাপারটা একটু দেখো। তিন মাস হয়ে গেল, এখনো ঠিক আমাদের লাইনে ধাতস্থ হয়ে ওঠে নি। বুনো ঘোড়ার আড় ভাঙার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।

প্রীতি নিও।

চিঠি ভাঁজ করে ম্যাকডাওয়েল বললে, 'গালাটা আগুনে ধরো।'

মোমবাতির আগুনে লাল গালায় বোর্ড অক ট্রেডের শীল মারতে না মারতেই ম্যাকিনটশ বললে, 'এখনই যাই, এখন আর হাতে কাজ নেই।'

'এখনই কোথায় যাবে? তুমি এখনো ক'লকাতার টাইম-টেবিলটা মনের মধ্যে গেঁথে নাও নি। এখন বারোজের জুড়ি গেটে দাঁড়িয়ে। বারোজ বিশ্রাম ক'রতে যাবে। কালকে যাবে। অত তাড়া কিসের? তিন মাস অপেক্ষা ক'রতে পারলে, আর একদিন পারবে না?'

চার্লস লজ্জা পেয়ে বললে, 'না না, আমি ঠিক বুঝতে পারি নি। ভাবলাম

আজই যেতে বলছ।'

'বোসো বোসো, আমার গাড়িতে তোমায় পৌঁছিয়ে দেব।'

ম্যাকিনটশ অনুভব করে অন্য একটা কথা এই বয়স্ক ভদ্রলোকটি পাড়তে চায়, কিন্তু আটকে যাচ্ছে।

একটু ভেবে বললে, 'আর পনের দিন পরেই সেই শুভদিন আসছে কাকা, যা তোমার জীবন আরো ঝলমলে করে তুলবে।'

'থ্যাংকস থ্যাংকস!' টাক দোলায় ম্যাকডাওয়েল। তারপর বললে, 'এখানে আমার কোনো আত্মীয় নেই। তুমি আমার আত্মীয়ের মতো, তুমিই বরপক্ষের লোক। চার্চে যাবে আমাকে নিয়ে।'

'থ্যাংক ইউ', চার্লসও মাথা হেলায়।

'আচ্ছা, তোমার এখানে তো তিন মাস হল। কী করে অবসর সময় কাটাও? নিশ্চয় সেণ্ট জন্‌স্‌ চার্চে দাঁড়িয়ে থাক, কবে পালকি থেকে কোনো কুমারী নামবে, তাকে হাত ধরে নামবার জন্যে।'

'আমার কি রকম যেন বোকা বোকা লাগে, কাকা। দু'তিন দিন যে ও রকম করি নি তা নয়, কিন্তু নিজেকে কেমন বিজ্ঞাপন দেওয়ার মতো লাগে। আমি পাণিপ্রার্থী, খাড়া পায়ে দাঁড়িয়ে আছি, কখন তোমরা জাহাজ থেকে নামবে আর তোমাদের হাত ধরবার সৌভাগ্য হবে আমার।'

দু'জনেই একসঙ্গে হেসে ওঠে। ম্যাকডাওয়েল বললে, 'না না, সত্যিই সময় কাটানো একটা বিরাট সমস্যা।'

'সন্ধেবেলা ময়দানে যাই ঘোড়া নিয়ে। কোনো কোনো দিন মিসেস ডিকিদের ফিটনে যাই। যেদিন হাওয়া থাকে বেশ লাগে, কিন্তু গুমোট হলেই বিশ্রী লাগে। বাড়িতে ফিরে ভেতরের বারান্দায় বসে একলা একলা পান করি, গড়গড়া খাই। আর একটা বদ অভ্যাস হয়েছে কাকা। আমি নেটিভদের মতো চাকরদের দিয়ে গা-পা টেপাতে আরম্ভ করেছি। সময়টা বেশ কেটে যায়! সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের দেশের কমবয়সী মেয়েগুলো বড্ড হিসেবি, আমি যা মাইনে পাই তাতে কেউ ভিড়বে না। তার চেয়ে কাকা, চাকর-বাকর-মদ্যপান নিয়ে থাকাই ভালো। সন্ধে আটটার পর আর আমার হুঁশ থাকে না। পুরো দু'বোতল উড়িয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকি। বরকন্দাজ-দের পাশে বসিয়ে রাখি মশা মারতে। পোঁ পোঁ ক'রে চার পাশে মশা ওড়ে আর চটাস চটাস আওয়াজে বরকন্দাজরা মশা মারে।'

'দ্যাখো, চার্লস। তোমার কাকা আমাকে সমস্ত ব্যাপারে দীক্ষা দিয়েছেন টাকা রোজগার করার ব্যাপারে, ভারতবর্ষে কেমনভাবে জীবন কাটাতে হয়, সমস্তই হাতে ধরে শিখিয়েছেন। একটা কথা প্রায়ই বলতেন পিটার ম্যাকিনটশ, রমণীসংসর্গ ছাড়া ভারতীয় জীবন বড়ই ভাল। এ কথাটা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। ছোকরা অফিসারকে, একজন রাইটারকে কেউ পোঁছে না। যে-সব মহিলারা জাহাজ থেকে নামছে তাদেরও আমি দোষ দিচ্ছি না, তারাও ত তোমার-আমার মতো অ্যাডভেঞ্চারার। তারা সাধ করে দারিদ্র্যের গলায় মালা দেবে না। আট দশ বছর তোমায় নিঃসঙ্গ ব্যাচেলার লাইফ কাটাতে হবে। অ্যান্দিন তুমি কী করবে? একটা ব্যবস্থা তো করতে হবে।'

উদ্‌গ্রীবচোখে তাকায় চার্লস ম্যাকিনটশ।

'তোমার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, গহরের বোনকে পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে' কোনো ভণিতা না করে ম্যাকডাওয়েল বললে।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ওর দিদিকে আমি রেখেছিলাম। দিদির বিয়ে হবার পর ওকে রেখেছি। দিদির চেয়ে বেটার।'

তারপর কথা পাল্টাবার ছলে বললে, 'তোমার নিশ্চয় মিস ক্র্যাফটনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। একসেলেণ্ট উওম্যান।'

'আমরা একই জাহাজে এসেছি।'

'ও তাই নাকি! তা হলে নিশ্চয় ভালোভাবেই চেনা জানা হয়েছে।'

ম্যাকিনটশ আত্মসচেতনভাবে বললে, 'না ঠিক, আমার কেমন বাধো-বাধো লাগত, তা ছাড়া তিনিও বোধ হয় ইচ্ছে করেই দূরত্ব বজায় রাখতেন।'

'একজ্যাক্টলি। এইটাই দরকার। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, মিস ক্র্যাফটনের সঙ্গে ম্যাডাম ইমহোপের অনেক সাদৃশ্য আছে। ঐ রকম রাজকীয় মেজাজ, ঐ রকম গোল্ডেন কার্লস। তাকিয়ে থাকার মধ্যে কি রকম দৃপ্তভঙ্গি! অথচ কি জানো, তোমরা ছোকরারা হয়ত ভাবতে পার আমার টাকার জন্যেই সে আমায় বিয়ে করছে। মোটেই না। তার কাউন্সিল মেম্বারের সঙ্গে বিয়ে হবার কথা।'

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ খেলে চার্লস ম্যাকিনটশের ঠোঁটে, কিন্তু সেদিকে নজর ছিল না ম্যাকডাওয়েলের। উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'প্রেমে পড়লে মানুষ দেখে অন্য-ভাবে। তোমাকে আমার বলতে আপত্তি নেই। আমার এই চকচকে টাকও তার ভালো লাগে। আমি তাকে বলেছিলাম, হেস্টিংস ডাকে মাদাম ইমহোপকে

মারিয়ান বলে, আমি তোমাকে কী বলে ডাকব? ও আমাকে বলেছে, তুমি আমাকে জুন বলে ডেকো, আমি জুন মাসের মতো সব সময় তাজা থাকতে চাই।'

যখন তারা বেরিয়ে আসে তখন শীতের কমলা রঙের রোদ্দুরে সারা কলকাতা ভরে গেছে। কয়েকটি বগী ফিটন ছাড়া রাস্তা নির্জন হয়ে এসেছে। জাহাজ ঘাটে নীল আর আফিমের পেটি নামিয়ে একপাল উট ফিরছে। নারকেল-বনের নীচে তাঁবুগুলো থেকে সেপাইরাও ফিরছে ক্যাম্পে। এখনো কাদা মরে নি রাস্তা থেকে, মাঝে মাঝে জল ছিটকোচ্ছে ঘোড়ার খুর।

'তুমি কি আসছ ডিনারে আমার ওখানে? মিস ক্র্যাফটন থাকবে।'

'আজকে থাক, কাকা। কাল বারোজ কী বলে দেখি। এখন সত্যিই দেখছি আমি তিনটে মাস নষ্ট করেছি। আমাকে এখন মেক-আপ করতে হবে।'

'ঠিক আছে, অত ভেব না। সকলেরই একই অবস্থা থাকে প্রথম প্রথম। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়।' তারপর আত্মগতভাবেই ম্যাকডাওয়েল বলে যায়। 'কত ঝড়ঝঞ্ঝার মাঝখান দিয়ে যেতে হয়েছে। মনে আছে ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ। আমি তখন নদীয়ার সুপারভাইজার। নদীর ধারে গিয়ে দেখি, নৌকো পড়ে আছে, মাঝিদের শরীর শকুনে খাচ্ছে। তাঁতি-পাড়ায় তিন ভাগ লোক মরেছে। চারপাশে মড়া, শকুন উড়ছে। ডাকাতরা ঘুরে বেড়াচ্ছে তলোয়ার নিয়ে। সেই বছরেও এ-মিয়াঁ দমে নি। তোমার কাকার সমস্ত চাহিদা পূরণ করেছি। আমার জেলায় যত ট্যাক্স হবার কথা, তার থেকেও বেশি ট্যাক্স তুলেছি। যারা মরেছে তারা তো গেছে, যারা বাঁচল তাদের ছাড়ি নি। এখন তো ব্যাপারটা অনেক গুছিয়ে নিয়েছে আমাদের গভর্ণর-জেনারেল।'

ম্যাকিনটশের বাড়ি আগে। নামবার সময় ম্যাকডাওয়েল বললে, 'আমরা সবাই প্রথমে থাকি আদর্শবাদী, তারপর হই রক্ষণশীল। এই জগতের নিয়ম।'

'হয়ত তাই,' চার্লস হেসে বললে।

বারোজ লোকটা ছোটখাটো, কাঁচাপাকা চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, চোখ তীক্ষ্ণ, ঘরের মধ্যে হাঁটার সময় লাফিয়ে লাফিয়ে চলে চড়ুইপাখির ভঙ্গিতে।

চার্লস ম্যাকিনটশ পরদিন অফিসে ঢুকলেই একবার ফাইল থেকে চোখ তুলে তার

দিকে এক নজর তাকিয়ে সামনের চেয়ারে বসার জন্যে হাত দেখায়। তারপর খস খস করে লিখে চলে। প্রায় দশ মিনিট ধরে লেখা চলে। চার্লস যখন আসোয়াস্তি বোধ করতে আরম্ভ করেছে, ঠিক সেই সময় দু'খানা কাগজ তার দিকে ঠেলে দিয়ে বললে, 'যত্ন করে এই কাগজ-দুটো রাখবে।'

বড় বড় গোল গোল অক্ষরে লেখা দুটো মোটা শক্ত কাগজ। নীচে বারোজের সই। এই দুটো কাগজের জোরে চার্লস ম্যাকিনটশ নবগ্রাম ও রঘুনাথপুর —এই দুটো রেশম ও সুতির কাপড়ের আড়ং-এর এজেন্ট।

'এ দুটো থেকে তোমার ব্যানিয়ানের খরচা উঠে আসবে। এ দুটোই জেলার সব চেয়ে বড় আড়ং। দুটোয় মিলে প্রায় দু লাখ টাকার কারবার। দু লাখের ওপর কুড়ি পার্সেন্টে আশা করি তোমার খরচা উঠে আসবে।'

'আপনি আমাকে বাঁচালেন! ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম,' ক্যাবলার মতো বলে চার্লস ম্যাকিনটশ।

তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বারোজ বললে, 'বাঁচানো-টাঁচানো বোলো না। কুড়ি পার্সেন্ট তোমার প্রাপ্য। এমন কোনো ইংরেজ দেবদূত ভারতবর্ষে আছে যে, বছরে একশো-চল্লিশ পাউন্ড, একশো-পঞ্চাশ পাউন্ডে এ দেশের মাটিতে থাকতে পারবে? আমার মনে হয় চার্লস, যদি তুমি সত্যিই টাকা রোজগার করতে চাও, তা হলে তোমাকে অন্য ব্যবসায় যেতে হবে।'

'মিস্টার ম্যাকডাওয়েলও তাই বলছিলেন।'

'ঠিকই বলছিলেন, কারণ তুমি ইণ্ডিয়াতে এসেছ একটু অসময়ে। আরো বিশ বছর আগে যদি আসতে, তা হলে দুহাতে টাকা রোজগার করতে পারতে। আর বিশ বছর পর যখন সমস্ত ইণ্ডিয়াতেই ইউনিয়ন জ্যাক উড়বে, যখন নবাবকে এই বাঁ হাতে সেলাম দেওয়ার কায়দা উঠে যাবে, তখন বোধ হয় আমাদের ইংরেজদের আরো ভালো সময় আসবে।'

'কিন্তু তখন বোধ হয়, অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফস করে বেরিয়ে যায় চার্লসের মুখ দিয়ে, 'তখন বোধ হয় প্রাইভেট ট্রেডের সুযোগ থাকবে না।'

আবার তীক্ষ্ণ চোখে তাকায় বারোজ। 'এ-সব স্পেকুলেশান করে তো কোনো লাভ নেই। তখন আমাদের ছেলেদের দশগুণ মাইনে বেড়ে যাবে। আবার মাইনে বাড়িয়ে দাও। এই ছ হাজার মাইল দূরে ছ-সাত মাস সাগড়পাড়ি দিয়ে আসব কিসের জন্যে? এখানকার নেটিভদের মতো থাকবার জন্যে? খালি গায়ে ভাত-চচ্চড়ি খাবার জন্যে?'

তারপর আবার ফাইল দেখতে থাকে বারোজ। লোকটা বেশ কেজো, চটপটে। অন্ততঃ তার কাকার বন্ধুর চেয়ে আরো চালাক চতুর লাগে।

'আমাদের দুটো পানসি ছাড়ছে পরশু সকাল আটটায়। নবগ্রাম, রঘুনাথপুর, আরো কয়েকটা আড়ং ঘুরে আসবে। তা ছাড়া নবগ্রামে একটা খুন হয়েছে। ওখানে একজনকে ফাঁসি দিতে হবে। অনেক ঝামেলা বেড়ে গেছে।'

'আসামীকে ক'লকাতায় আনা হবে না?'

'বাঃ। তুমি দেখছি মোটেই খবর রাখ না। গভর্ণর-জেনারেলের নতুন সার্কুলার দেখনি? যেখানেই খুন হবে, সেখানেই ফাঁসি। নেটিভদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করা দরকার। নইলে খুন-খারাপি বন্ধ হবে না।' তার পর নিজের মনেই ওয়ারেণ হেস্টিংসের কথাটা আবৃত্তি করলে, 'স্ট্রাইক টেরার! স্ট্রাইক টেরার!'

'খুন-খারাপি খুব বেড়ে গেছে, না?'

এবার ফাইলটা সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে বারোজ তীক্ষ্ণচোখে চার্লস ম্যাকিন-টশকে পর্যবেক্ষণ করে। আস্তে আস্তে স্পষ্ট করে বলে, 'ভারতীয়রা দু ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বেনিয়ান, টাকাপয়সা ষোল আনা চেনে। আর এক ভাগ, দেশের বেশির ভাগ লোকই ক্রিমিন্যাল টাইপ। তবে গভর্ণর-জেনারেলের নতুন হুকুমে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তুমি তো আবার সে হুকুম পড় নি দেখছি। প্রত্যেক অফিসে বোর্ডে টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

'আতঙ্ক সৃষ্টি করা?'

'না না, শুধু তাই নয়। ফাঁসি হবে যেখানে খুন হয়েছে শুধু তাই নয়, তোমার বউ, তোমার বাবা, তোমার ছেলেপিলে সবাই কোম্পানির কাছে ক্রীতদাসে পরিণত হবে। একদিকে আতঙ্কের সৃষ্টি হবে, আর-একদিকে কোম্পানীর আয় বাড়বে। সত্যিই খুব উঁচু দরের প্রতিভা ছাড়া এরকম আইডিয়া জন্মায় না। আমি তো এ লাইনে আছি এতদিন, অথচ এ আইডিয়া আমার মাথাতেও খেলে নি।'

'কিন্তু এটা বোধ হয় ন্যায়বিচারের দিক দিয়ে…'

চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে বারোজ। আর চড়ুইপাখির মতো মাঝে মাঝে থামে, মাঝে মাঝে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরের মধ্যে ঘোরে।

'তোমার কতদিন লেগেছে জাহাজে আসতে?'

'প্রায় সাত মাস, কেন?'

'এই সাত মাসে ইংলিশ জাস্টিসটা তোমার মন থেকে মুছে ফেলা উচিত ছিল। ভারতবর্ষ অদ্ভুত দেশ, এখানকার মাপকাঠি, এই দেশের মাপকাঠি, তা দেশ, তা কখনো ইংল্যান্ডের মাপকাঠি হতে পারে না।...আমি জানি তোমার খারাপ লাগছে। ক্রীতদাস প্রথাকে এইভাবে আমরা আরো জোরদার করে তুলছি, কিন্তু এই-সব প্রথা, যেমন ধর গণিকাবৃত্তি, ক্রীতদাস প্রথা চিরকাল আছে, চিরকাল থাকবে। আজ গ্রীসের সভ্যতার বিচার করতে কেউ বলবে না, সেখানে ক্রীতদাস প্রথা ছিল কি ছিল না, সেখানে অ্যারিস্টটল ছিল, প্লেটো ছিল। তা ছাড়া দাস প্রথাটা কাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? দেশে যারা ধনী লোক, গণ্যমান্য লোক, তাদের ক্ষেত্রে তো নয়। তা হলে?'

'তা ছাড়া', বারোজ খুব কাছে এসে দাঁড়ায়। চার্লস ম্যাকিনটশের পিঠে হাত রেখে বলে, 'আমরা বিজনেস করতে এসেছি। যাতে পয়সা আছে, আমরা তাতে আছি। ফ্রান্স বেঙ্গল কটন মসলিন আনা বন্ধ করে দিয়েছে। তাতে কী আসছে যাচ্ছে? হাজার হাজার স্মাগলার হাজার হাজার জায়গা থেকে বেঙ্গল কটন আর মসলিন নিয়ে ফ্রান্সে ঢুকে পড়ছে। এই স্মাগলিং ট্রেড বে-আইনী নয়? তোমায় যে কুড়ি পার্সেন্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি সেটার মধ্যে কি খুব ন্যায়বিচার আছে? এই-সব বাজে বিবেকের দংশনগুলো নাটক-নভেলের জন্যেই রাখ। ওগুলো একেবারে সেকেলে হয়ে গেছে। একটা কথা আমাকে স্পষ্ট করে বলো, ইয়ংম্যান। তিন মাস তুমি প্রাইভেট ট্রেড না করে কেবল চাকরি করেছ। আগামী তিন মাস তুমি কি তাই করবে?'

'সেটা আর সম্ভব নয়। তবে ক্রীতদাস প্রথাটা—' 'টাকা! টাকা! ক্রীতদাস প্রথায় নীলচাষে টাকা আসে। যেখানেই টাকা আসে, সেখানেই নানা জায়গা থেকে প্রতিবাদ। আমাদের চায়না ট্রেডে কেউ বাগড়া দিচ্ছে না ভাবছ? গান-বোট দিয়ে আমরা আফিং নামাচ্ছি চায়নাতে। আফিং খাইয়ে সমস্ত জাতটাকে আমরা নাকি নির্বীর্য করে দিচ্ছি। বটেই তো। এই তো জগতের নিয়ম। চীনেরা নির্বীর্য হচ্ছে, আমরা বীর্যবান হচ্ছি। এ ছাড়া কোনো রাস্তা নেই।, চার্লস ম্যাকিনটশের মাথা ভোঁ ভোঁ করতে থাকে। তা হলে কি তার স্বদেশ-প্রত্যাবর্তন ছাড়া গত্যন্তর নেই? এবং সঙ্গে সঙ্গে টাউনশেন্ড কোম্পানির প্রকাণ্ড কাঠের বাড়িটার কথা মনে আসে। অসহায় ক্লীবের মতো চেঁচিয়ে ওঠে, 'মিস্টার বারোজ, আপনারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। আপনারা যে রকম

বলবেন, আমি সেই পথেই চলব।'

'দ্যাটস রাইট!' বারোজ আবার চেয়ারে বসে ফাইল টেনে নেয়। 'তা হলে তুমি চলে এসো, পুরনো কেল্লার ঘাট থেকে আমাদের দুটো পানসি ছাড়বে। চৌদ্দ-দাঁড়ির নৌকো। কোনো অসুবিধে নেই। দুপুর নাগাদ নবগ্রাম। সব রকম রসদ থাকবে। দু পেটি ডাচ ক্ল্যারেট আর ম্যাডেইরা। মেজর ফাউলারের বাবুর্চি যাবে। বেড়ে রাঁধে।'

৩

অঘ্রাণ মাসটা ভারতবর্ষে, এখন কি তখন, সব সময়ই ভালো। মহাভারতে উদ্যোগপর্বে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল এই মাসেই স্থির হয়েছিল। কর্ণকে কৃষ্ণ বলেছিলেন, এই মাস অতি শুভ, এখন পশুখাদ্য সুলভ, শস্য পরিপুষ্ট, গাছে গাছে ফল, মশা-মাছির উপদ্রব কম, পথে কাদা নেই, জল স্বাদু হয়েছে, শীত বা গ্রীষ্ম কোনোটাই বেশি নয়।

উত্তর-ভারতে প্রাচীনকালে যে অবস্থা, বাংলাদেশে দুশো বছর আগের অবস্থা প্রাকৃতিকভাবে তার চেয়েও মনোরম। নবগ্রাম গঙ্গার পাড়ে আমিন রামগতি মিত্রের জমি-জমা, বাগান-বাড়ি, পুকুরে, মন্দিরে ধবধবে চাঁদনি খেলা করে। কলাপাতায় চাঁদ নড়ে, নাট-মন্দিরের চত্বরে বহু মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। পাশেই ধানি-জমিতে সর সর আওয়াজ ওঠে। পেকে ওঠা ধানের চেহারায় যে চোখের আরাম তাতে এ-ভ্রম স্বাভাবিক বুঝি বা পেট-চাপড়ানো দারিদ্র্যের লেশ-মাত্র এখানে নেই। আর সমস্ত পরিবেশে এমন এক মায়াময় প্রফুল্লতা যে, এ-বিশ্বাস জাগে যে, এ অঞ্চল ভারতীয় অধ্যাত্ম-সাধনার পীঠ। এখানে জীবনটা অনায়াসে ফুঁকে দেওয়া যায় নশ্বর বলে, অবিনশ্বর জীবন তো চৌকাঠেই দাঁড়িয়ে আছে। রামগতির বাবার তৈরি নবরত্ন দেউলটিও চমৎকার, তার চারদিকে টেরাকোটা প্যানেলে মানুষ.হাতি-ঘোড়া-শিব-পার্বতীর মিছিল। এখানে বিশিষ্ট কিছু নেই, সব ভাবই সমন্বিত, পথের কুকুরও এই মিছিলে স্থান করে নিয়েছে। রামগতির বাবা বিষ্ণুপদর সময় আমিনদের অবস্থা ছিল আরো রমরমা। মুর্শিদকুলি খাঁ-প্রবর্তিত রাজস্ব-পদ্ধতি তখনো দেশে অটুট, এ-অঞ্চলের জমিদার, কারিগর, আমলা, ফৌজদারের জীবনযাত্রায় পারস্পরিক নির্ভরতার স্পষ্ট ছাপ ছিল। মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতের কারিগরদের নিয়ে

আসেন বিষ্ণুপদ টেরাকোটার কাজে! তাই অন্যান্য অনেক দেউলের কাজ থেকেও নবগ্রামের টেরাকোটার কাজ এত সূক্ষ্ম, এত প্রাণময়! আড়াই ইঞ্চি প্যানেলে হাতির দাঁতের কাজের সূক্ষ্মতায় মানুষ-দেবতা, পশুপাখি খোদিত। বাস্তবিক এই গঙ্গাতীরের স্নিগ্ধ শোভায় যেন শান্তির রাজ্য, ক্লেশ এখানে ছায়া ফেলে না, গলা চেপে ধরে না আতঙ্ক।

অথচ এই চন্দ্রালোকিত সৌন্দর্যে ঠাওর করলেই দেখা যাবে, একটা গোল আতঙ্কের ছায়া নড়ছে। যে স্নিগ্ধ সমীরে জীবন জুড়াবার কথা, সেই সমীরে সেই গোল ছায়াটা একবার একটু ওপরে উঠে স্থির হয়ে থাকে, তারপর হাওয়া পড়ে এলেই তা নেমে যায়। আজ সারা সকাল ফাঁসির মঞ্চ তৈরির ঠুকঠাক আওয়াজ শোনা গেছে। সকালে ভিড় করে ছেলের দল তাদের অভিভাবকদের মানা সত্ত্বেও অবাক হয়ে এই উদ্যোগপর্বের সাক্ষ্য ছিল। তখন তারা ঘুমিয়েছে ,কিন্তু তাদের বাপ-দাদারা অনেকেই বিনিদ্র।

মাঝে মাঝে কান পেতে থাকলে লক্ষ্মীপেঁচার পাখা-ঝাপটানোর সঙ্গে একটি স্বরভাঙা বিলাপের আওয়াজ আসে। গত রাতে তার বিরতি অনেক কম ছিল। আজ রাতে তা ক্লান্ত, প্রায় চেনা যায় না। মাঝে মাঝে শেয়াল ডাকে।

রামগতির নাটমঞ্চের চত্বরের গায়েই তাঁর ভৃত্যাবাস। সেখানে দরজার গোড়ায় দুটি তেলেঙ্গী সেপাই বসে বিড়ি ফোঁকে। রামগতির বাড়ি থেকে দুই পরাতভর্তি ভাত আর পাঁঠার মাংস পাঠানো হয়েছিল। সেগুলোর সদ্ব্যবহার করে তারা বিড়ি ফুঁকছিল। অবশ্য এত চুড়ো করে এত বড় থালায় ভাত দেওয়া হয়েছিল যে, কিছু উদ্বৃত্ত পড়ে ছিল।

সেপাইদের একজন সহসা দয়াপরবশ হয়। দু-দিন আসামীকে এক ফোঁটা জলও খেতে দেওয়া হয়নি। এখন চোখ বুজে পড়ে থাকা দীর্ঘদেহ লোকটাকে জুতোর ঠোকর দিয়ে জাগিয়ে তার সামনে থালায় কয়েক গ্রাস ভাত রাখা হয়েছিল। আসামীর অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হয়। পায়ের বেড়ি ও হাতকড়া সত্ত্বেও সে উঠবার চেষ্টা করে। সেপাইদের ধারণা জন্মায়, বোধ হয় উবু হয়ে লোকটা খাবে, কিন্তু লোকটা উবু হওয়ামাত্রই কনুই দিয়ে কোঁচড়ের কাপড় সরিয়ে ভাতের থালায় পেচ্ছাপ করে। প্রচণ্ড রাগে লাথি মারে একজন সান্ত্রী আসামীর মুখে। আসামী গড়িয়ে পড়ে এবং সে অবস্থাতেই শুয়ে থাকে। বাতাসে আবার স্বরভাঙা বিলাপের আওয়াজ উঠেই স্থির।

সেপাইরা এবার শুয়ে পড়ার জন্যে বিছানা পাতে বারান্দায়। ঘরের মধ্যে

গরম হচ্ছে। তারপর একটা জানলা ছাড়া সমস্ত জানলা বন্ধ। ঘরের মধ্যে একটা লম্ফ জ্বলে, তা থেকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া ওঠে। গরমে ধোঁয়ায় নিঃসাড় মানুষটার সঙ্গ অপেক্ষা বাইরে বারান্দায় নদীর হাওয়া অনেক আরাম-দায়ক। শোয়া-মাত্রই তাদের প্রবল নাসিকাগর্জনে নৈস্তব্ধ খান খান হয়।

ঘণ্টাখোনেক বাদে জানলার কাছে পায়ের শব্দ। চোখ বুঁজে থাকা মানুষটা উঠে বসে। শীর্ণ কমবয়সী কোমল একখানা হাত জানলায় দেখা যায়। হাতে একটা বড় কাঁসার গেলাস। গেলাসে ফ্যান আর ভাত। লোকটা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে ওঠে। বেশ দীর্ঘকায় পুরুষ, নইলে প্রায় হাতের নাগালের বাইরে প্রসারিত হাতখানায় হাত পেঁছিনোর কথা নয়।

গেলাসটা হাতে নিয়ে সে ঢক্-ঢক করে ফ্যানটা খায়, তারপর যতখানি পারা যায় হাঁ করে গলা-ভাত খায়। গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে চাপা গলায় বলে, 'তুই এখনো আছিস রূপী। তোকে বলেছি না, পালা, পালিয়ে যা, নইলে তোকে কয়েদ করবে। বাপ বুড়ো হয়েছে, তার দাম নেই। তোকে বিক্রি ক'রে কুড়ি টাকা পাবে। তুই পালা রূপী, পালা।' এবারে কাঠের গরাদে দুটো হাতের মাঝখানে একটা কচি কালো রোগা মুখ ভেসে ওঠে।

'আমি পালাব না। এখানেও না খেয়ে মরছি. ওখানেও না খেয়ে মরব।' ভাঙা গলায় রূপী বললে।

মুখ উঁচু করে লক্ষ্মণ দাস তার স্ত্রীকে বোঝায়।

'ওরা জন্তুর মতো তোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'তুমি মরছ, আমিও মরব।'

চাপা বিদ্রূপের হাসি খেলে লক্ষ্মণের মুখে। 'সতী হবি? বাবুদের গিন্নিদের মতো চিতায় চাপবি?'

তারপর অনুনয়ে তার গলা নরম হয়ে আসে, 'কেউ মরতে চায় না রূপী, কেউ মরতে চায় না। কিষ্টুপদর ছোট বউয়ের কথা মনে আছে? চিতা থেকে ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়েছিল? সেখান থেকে টেনে তুলে বাঁশ পিটিয়ে মারা হল? সবাই বাঁচতে চায় রূপী। সবাই বাঁচতে চায়। আমিও চাই রূপী।'

তারপর গলা আরো নামিয়ে বললে, 'শেতলদাকে বল, চণ্ডীকে বল, লাঠি নিয়ে আসুক। দুটো সেপাইয়ের মাথা ফাঁক করতে কটা লোকের দরকার? আমরা তিনশো ঘর তাঁতি আছি। আর কোনো উপায় নেই রূপী। লড়াই করে বাঁচতে হবে।'

সেই কোমল মুখখানা চুপ হয়ে যায়। ঘরের মধ্যে দুটো ধেড়ে ইঁদুর নেচে বেড়ায়। তারপর থালার ওপর চড়ে পেচ্ছাপমাখা ভাতে মুখ দেয়।

'কিরে, কিছু বলছিস না যে। আমার কোমরের শেকলটাকে খুলে দিক। একটা লাঠি আমার হাতে দে, আমি একলাই ওদের খতম করব।'

গরাদ থেকে কোনো কথা আসে না।

'তুই বলেছিলি?'

'বলেছিলাম। কাল রাতেই বলেছিলাম।'

'কী বললে?'

'শেতলদা বললে, কোম্পানির ওপরেই আমাদের নির্ভর। তোমায় ছেড়ে দিলে কোম্পানি আর আমাদের কাজ দেবে না, আমরা না খেয়ে মরব।'

'তোরা ত এমনিও মরবি, অমনিও মরবি। ছেলেবেলায় দেখিনি দুর্ভিক্ষের সময়? পোকার মতো মানুষ মরেছিল! আমরা পালিয়ে গিয়েছিলাম গাঁ ছেড়ে। মড়ার গন্ধে টেঁকা দায়।'

'সে কথাও বললে শেতলদা। দুর্ভিক্ষের সময় কেউ কোম্পানির লোকের গায়ে হাত তোলে নি।'

পায়ের বেড়িসুদ্ধ শূন্যে লাফ মারে লক্ষ্মণ আর সেই ঝম শব্দে বাইরে নাসিকা-গর্জন হঠাৎ বন্ধ। 'কেউ গায়ে হাত তোলেনি, কারণ সারা গাঁয়ে একটা মরদ ছিল না। তুই এক কাজ কর রুপী। একটা বাঁশ এনে দে। আস্তে আস্তে মইতে তুলে নাবিয়ে দে।'

'তুমি পারবে না, তোমার কোমরে শেকল আঁটা।' চোখ পাকিয়ে লক্ষ্মণ বললে, 'দে বলছি।'

তারপর এক আশ্চর্য দৃশ্য ঘরের মধ্যে দেখা যায়। একটা ভারী লম্বা বাঁশ কিছুক্ষণ পরে জানলার গরাদ দিয়ে নামতে সুরু করে। বাঁশের ভারে পরিশ্রমে দ্রুত নিশ্বাস ওঠা-পড়ার শব্দ আসে জানলার গরাদ থেকে। হাতকড়া অবস্থায় কোনোরকমে লক্ষ্মণ বাঁশের ডগা ধরে।

এবার কোমল কচি মুখখানা লেপ্টে থাকে কাঠের গরাদে। বড় বড় দুটো চোখ মেলে চেয়ে থাকে মুখখানা।

'পালা পালা রুপী। মইটা নিয়ে যাস। আজ রাতেই পালিয়ে যা গ্রাম থেকে।'

সেই কাঁপা কাঁপা লম্ফের আলোয় অদ্ভুত দৃশ্য ঘটে। বোধ হয় ভারতবর্ষের দুশো বছরের প্রতিবাদের রুপক, একলা বাঁশহাতে লক্ষ্মণ দাস দাঁড়িয়ে আছে।

তার ডাক কেউ শোনে না, সবাই পাশ ফিরে দাঁড়ায়, কিন্তু সে কিংবদন্তীর নায়কের মতো প্রতিবাদ করে ফাঁসির দড়িতে ঝোলে। বহুকাল পর হয়ত তার স্ট্যাচু ওঠে, তাকে নিয়ে উদাত্ত লেখা হয়, কিন্তু লক্ষ্মণ দাস দুশো বছরে বারে বারেই একলা, সে অথবা তার দু চারটে সাকরেদ একলা লড়াই করে, একলা প্রাণ দেয়। শহীদরা যেন শুঁটকি মাছ, তাজা থাকতে তাদের বেশি লোকজন ছোঁয় না, যত বাসি হয়, তত মজে। লক্ষ্মণ দাস যখন বাঁশহাতে চিত্রার্পিত, ঠিক সে সময় তাঁতিপাড়ায় বৃদ্ধ সুরথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। জেলেদের মতো তাঁতিদেরও একই নাম, একই ভবিতব্য। তারা যেন কালের নাটকের দর্শক, তাদের ঘাড়ে পা দিয়ে দৃশ্যপট পাল্টায়, কিন্তু তারা নায়ক হয় না। লক্ষ্মণ দাস শুধু দর্শক হয়ে তৃপ্তি পায়নি, সে বাঁশহাতে কালের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেছিল।

এই কথাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুরথ বললে, 'বারো তেরো বছর আগে দুর্ভিক্ষ এল। এই তো সেদিনের কথা। বউ মারা গেল, ছেলে মারা গেল, দাদা মারা গেল, কাকা মারা গেল,'—মৃত্যুর লম্বা লিস্ট কাশিতে আটকে যায়।

'ও সব যা হয়েছে হয়েছে, ও সব কথা আর শুনতে চাই না। লক্ষ্মণকে বাঁচানো যায় না, সুরথদা ? তুমি বলো, আমরা লাঠি ধরি। আমরা এখানে চার-পাঁচশো ঘর তাঁতি। দুটো তেলেঙ্গী সেপাই কী করবে ?'

'তারপর ? তারপর কী ? কে তোদের পেছনে দাঁড়াবে ? জমিদার, ফৌজদার আমিন, তারা কোম্পানির পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। কোম্পানি বায়না বন্ধ করে দেবে। তারপর কী খাবি ?'

নদীর হাওয়া ওঠে। একটা ফুলন্ত সজনেগাছ চাঁদের আলোয় হাতছানি দেয়। সুরথ শান্তভাবে বললে, 'একটা লোক মরছে মরুক। এতগুলো লোক মরবে কেন ?'

শীতল দাওয়ায় উঠে বসে বললে, 'সে তো সুরথদা আমাদের জন্যেই মরছে। আমাদেরই কাপড়ের পেটি জোর করে পাইক, বরকন্দাজ নিয়ে যাচ্ছিল, তখন সে-ই রুখে দাঁড়িয়েছিল। কোম্পানি আমাদের কী দিচ্ছে ? আমরা তো সুতোর দামও পাই না, সুরথদা।'

সুরথ দাওয়ার বাইরেই নদীর পাড় পর্যন্ত চন্দ্রালোকিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। সত্যিই সে যদি বলে, তাহলে জনা পঞ্চাশেক তরুণ লাঠিহাতে বেরিয়ে আসবে। সেপাইদের লাশ ভাসবে জলে, কিন্তু এই সব ঝামেলা না করাই ভালো। বরং আগামীকাল সাহেবদের সে অনুনয় করবে যে,

লক্ষ্মণ একটা খ্যাপাটে লোক, তাঁতিদের কেউই তার মতবাদে বিশ্বাসী নয়, তারা কোম্পানির শাসনে সুখে আছে, শান্তিতে আছে। তাদের মালের দাম যেন আর কমানো না হয়।

কথাটা গলায় ঠিক আসে না, তবে রিহার্সাল দেবার মতো বিড় বিড় করে সুরথ, 'তোমরা আমাদের মা বাপ, সাহেব, তোমরা আমাদের মা বাপ, সাহেব।'

শীতল এসব কথা শুনতে পায় না, হাওয়ায় পাকা ধানের শব্দ আসে। কিছু কিছু ধান কাটা হয়েছে, কিছু ধান কেটে মাঠেই শুকোচ্ছে। তার দৃষ্টি অবলম্বন খোঁজে যাতে তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব কাটে, সেও লক্ষ্মণের মতো সাহসে বেপরোয়া হয়ে ওঠে।

'মরতে কী ভয় ? নবীন গাছ থেকে পড়ে মরল, গৌর জলে ডুবে মরল, মরতে কী ভয় ? জন্ম মানেই তো মরণ।'

এমন সময় দুশো গজ দূরে রামগতির ভৃত্যাবাস থেকে কোলাহল ওঠে। 'মার শালা, মার শালা ডাকু, মার!' সেপাইদের গর্জন ও আশেপাশের লোকের চিৎকার 'মেরে ফেললে! মেরে ফেললে!' আওয়াজে শীতল, সুরথ আরো পাশাপাশি ঘরের দশ-বারোজন বেরিয়ে সেদিকে দৌড়ে যায়।

ভৃত্যাবাসের সামনে একটা জনতা। মেয়েরা ডুকরে কাঁদছে। বন্দুকের কুঁদোর আঘাতে রক্তাপ্লুত লক্ষ্মণ অচেতন। হাত দিয়ে মাথাটা বাঁচাবার চেষ্টা করেও ফল হয় নি।

সেপাইদের কিছু লাগে নি, কিন্তু তাদের আত্মসম্মান প্রচণ্ড চোট খেয়েছিল। নদীর হাওয়ায় যখন নাসিকাগর্জন বেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে তখন হঠাৎ প্রবল শব্দে বাঁশের ডগার হালকা খোঁচায় ধড়মড় করে একটা সেপাই উঠে বসে। লক্ষ্মণের প্রতিবাদ বাস্তবিকই রূপকমাত্র। তার পায়ে বেড়ি, হাতে কড়া, কোমরের সঙ্গে মোটা কাঠের থাম শেকল দিয়ে বাঁধা। শেকলের শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে কোনো-রকমে মুঠোয় বাঁশের এক প্রান্ত ধরে লক্ষ্মণ তা তুলতে না তুলতেই হাতকড়া-আঁটা মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে যায় বাঁশ। আলতোভাবে একটা সেপাই-এর গাল স্পর্শ করেই তা সশব্দে মেঝেতে পড়ে।

একজন তেলেঙ্গী সেপাই সমবেত জনতার সামনে বন্দুক তুলে নাচতে সুরু করে, 'সব ডাকু, সব ডাকু, কোন্ লাঠি ভেজা, বোল্, মার ডালেগা।'

সুরথের গায়ের কাছে এসে সে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে। জনতা সরে যায়, পেছন-দিকের কেউ কেউ দৌড়ে পালায়। ভাঙা গলায় সুরথ বলে, 'আমরা কিছু

জানি না বাবা।'

ঠিক এমন সময় ভিড় ঠেলে সামনে এসে দাঁড়ায় রূপী। ষোল বছরের মেয়েটাকে এখন বালকের মতো দেখায়। মাথা থেকে ঘোমটা খসে গেছে, রুক্ষ চুল। গাছকোমর করে পরা লালপেড়ে ধুলোমাখা শাড়িটায় বুক, পিঠ এখনো প্রায় এক। তার চোখ জ্বলে। বিকৃতগলায় রূপী বললে, 'আমি করেছি শালা। আমার স্বামীকে তোরা ফাঁসি দিবি, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখব?'

'ইয়ে ডাকুকা রানী! পাকড়ো, পাকড়ো!' দুজন সেপাই ঝাঁপিয়ে পড়ে রূপীর ওপর। হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে তাকে ঘরের পাশে লক্ষ্মণের নিঃসাড় দেহটার ওপর ঠেলে দেয়।

শীতল ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, সুরথের শক্ত হাতখানা তার হাত চেপে ধরে, 'পাগলামি করিস না। ওর বউটাকে তো ওরা এমনিতেই নিয়ে যাবে। আজ না হয় কাল। ওর জন্যে দুঃখ করিস নি।' তারপর গলা উঁচিয়ে বললে, 'চল চল, এখানে আর ঝামেলা করিস নে।'

শীতলের হাত ধরে সুরথ ফিরল, আর সবাই ফিরে গেল যে যার ঘরে।

দোতলা বাড়ির সিঁড়িতে কলকাতা থেকে আনা বিলিতি দেয়ালঘড়িতে ঢং করে একটা বাজল। আর রামগতি দুই শয়নঘরের মাঝামাঝি বদ্ধ গুমোট বাক্সের ঘরে নিজের উরুতে চাপড় মেরে মশা তাড়ায়। প্রথমা স্ত্রীর ঘর থেকে সে আধ ঘণ্টা হল বেরিয়েছে, কিন্তু ছোট বউয়ের ঘরে ঢুকতে এখনো সাহস হচ্ছে না। জানালার গায়েই হাওয়ায় মর্মরিত নারকেলকুঞ্জ তার চোখে পড়ে, কিন্তু এ ঘরের অবস্থান এমনই যে, বাতাস ঢোকে না, ভৃত্যাবাস থেকে কোলাহল ভেসে এসেছিল হাওয়ায়, কিন্তু সে আমল দেয়নি। প্রথমে সামান্য দ্বন্দ্ব ছিল তার মনে, লক্ষ্মণকে কয়েদ করে কোম্পানির সেপাইয়ের হাতে তুলে দিতে প্রথমে তার মন রাজি হয়নি, কারণ নবাবের আমলে তাদের যে প্রতিপত্তি ছিল, কোম্পানির আমলে তা ম্লান। কোম্পানি আমিনদের পরোয়া করে না। তারা খাতাপত্তর দেখে না, খেয়ালখুশিমতো খাজনা ধার্য করে, আমিনদের মাথার ওপর দিয়েই রাজস্ব বিভাগের সমস্ত কাজকর্ম ঘটে যায়। এমতাবস্থায় কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রশ্ন ছিল না, কিন্তু রামগতি ভয় পেয়েছে অন্য কারণে। খুন চাপা থাকবে না এবং তারই নাকের ডগায় কোম্পানি পাইক খুন সহ্য করবে

না। যেটুকু প্রতিপত্তি আছে, ধানি জমি আছে, তাও যাবে। না, সে ঠিকই করেছে। আর কোনো গত্যন্তর ছিল না।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে রামগতি উঠে পড়ে। লক্ষ্মণ চুলোয় যাক। এখন ছোট বউ সামলানো আরো প্রয়োজনীয় ব্যাপার। আস্তে আস্তে ভেজানো দরজা খোলে রামগতি। যা ভেবেছিল ঠিক তেমনি অবস্থা। সেজের ঠাণ্ডা আলোয় দেয়ালের দিকে মুখ ফিরে কাঁথামুড়ি দিয়ে শোয়া ছোট বউয়ের দেহখানা স্পষ্ট চোখে পড়ে।

রামগতি ছোট বউয়ের কানের কাছে মুখ নিচু করে ডাকে, 'ছোট বউ, ছোট বউ।' কিন্তু ছোট বউ নড়ে না, সে যে ঘুমের ভাণ করে আছে তা স্পষ্ট এবং এক্ষেত্রে সচরাচর রামগতি যে পদ্ধতি অবলম্বন করে, সেই পদ্ধতি অনুযায়ী পা টিপবার জন্যে একটা পা নিজের কোলের ওপর টেনে নেয়। ছোট বউ আর একটা পা দিয়ে লাথি ঝাড়ে। বেশ আদরের লাথি নয়, পাটজোয়ান বউ-এর লাথিতে শীর্ণ রামগতি টাল খেয়ে পড়েছিল। কোনোরকমে সামলে নিয়ে সরে বসে। টের পায় আজকের অবস্থা আরো ঢিলে, একেবারে বিপর্যয়।

দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে চায় নি রামগতি। পিতার তিন স্ত্রীর অহরহঃ কলহের স্মৃতি নয়, বিষ্ণুপদর মৃত্যুর পর তিনদিন ধরে চিতা জ্বলেছিল এবং শেষদিন তার ছোট মায়ের লাফ দিয়ে চিতা ছেড়ে পালানো ও তাঁকে বাঁশ পিটিয়ে হত্যা তাকে যারপরনাই বিমর্ষ করেছিল। তবু গুরু বললেন, স্বাস্থ্য-হানি হচ্ছে এবং গুরুর কথাতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ। বড় বউ মাঝে মাঝে গলায় দড়ি দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় রামগতি আবার গুরুর শরণাপন্ন হয় এবং গুরুর সহায়তায় বড় বউ সামলেছে। আকাঙ্ক্ষার পরিণাম কি ভয়ানক এবং প্রত্যেক নর-নারীর, বিশেষ করে নারীর আকাঙ্ক্ষা-নিবারণ না হলে নরক-প্রবেশ যে অনিবার্য, তা কাহিনী-সংলাপে প্রতি সন্ধ্যায় বড় বউয়ের মনে গাঁথা হয়ে যাওয়ায় অনেকটা সামলেছে। তবে তার দাবি ছাড়ে নি। সপ্তাহে প্রথম তিন রাত তার, পরের চার রাত ছোট বউয়ের। সমস্ত ব্যাপারটা একটা নির্দিষ্ট ছকে এনে ফেলার পর সত্যিই রামগতির চেহারা ফিরে গিয়েছিল। প্রৌঢ়ত্বে দ্বিতীয় যৌবনলাভপ্রসঙ্গে যে-সব শাঁসাল স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক গুরু আবৃত্তি করতেন তার সারবত্তা হাতে-নাতে টের পাওয়া যাচ্ছিল, কিন্তু মুশকিল ছোট-বউকে নিয়ে, কোনো নির্দিষ্ট ছকে সে থাকতে চায় না। তার আকাঙ্ক্ষা দুর্নিবার। গুরু-প্রসঙ্গ উঠলেই বলে, 'তোমার গুরুর মুখে হাগি, বেটা ভণ্ড

লম্পট।'

ঢং ঢং করে দুটো বাজে। রামগতি নার্ভাস বোধ করে। আগামীকাল সাহেব-সুবো আসছে। তাদের আদর-আপ্যায়নের দায়িত্ব তার ওপর। মাংস, ফল, মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, কলকাতা থেকে এসেছে বাক্স বাক্স কেক, কয়েক ঝুড়ি আঙুর, মনাক্কা, কিসমিস, আখরোট। সেগুলো সাহেবদের বাবুর্চির হাতে জিম্মা করে দিতে হবে। তা ছাড়া যদি খাতাপত্তর দেখতে চায়, সকালে কাছারি-পরিদর্শনেরও কথা আছে। রামগতি হঠাৎ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিল। তার শীর্ণ বাহু দিয়েই হেঁচড়ে ছোট বউকে চিৎ করে শুইয়ে দেয়। ছোট বউ আপত্তি করে না, তার দিকে মোটা কাজলপরা চোখে হাসে। সবলে দু হাত দিয়ে স্বামীকে বুকের ওপর আকর্ষণ করে। 'যাক বাবা!' ছোট বউয়ের বুকে চেপ্টে থাকা রামগতির মুখ থেকে অস্পষ্ট আওয়াজ বেরোয়।

ঘন কুয়াশা ভেদ করে ভোর হচ্ছে। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে এই ভোর হাজির। উষা মানে অভ্যুদয়, যাত্রারম্ভ, কিন্তু এখন উষা মানে অস্তাচলে গমন, যাত্রাশেষ। অন্ধকার থাকতেই অস্পষ্ট আলোয় লক্ষ্মণ দাসের ঘুম ভাঙে।

মাথায়, ঘাড়ে রক্ত চাপড়া হয়ে জমে আছে, কিন্তু লক্ষ্মণের সাড় নেই। কোনো ব্যথা অনুভব করে না। দুঃখে অনেকে ধানাই-পানাই ভাবে, স্মৃতির আক্রমণে বিদ্ধ হয় কেউ। লক্ষ্মণের কোনো স্মৃতি নেই। তার বোধ হয় সে ইতিমধ্যেই মৃত, সে এই চারপাশের দৃশ্যমান জগৎ থেকে আলাদা দর্শক, অর্থাৎ চারপাশের সুখ-দুঃখের চাপে সে আর ভারাক্রান্ত নয়। ঘরের চাল, কড়িকাঠ, বন্ধ ভারী দরজা, জানলায় শিশিরে ভেজা কলাবনের একাংশ, মেঝের কোণে ইঁদুরের বড় গর্ত, সব কিছুর ওপর তার নিরাসক্ত চোখ ঘোরে। এমন সময় হাঁচি পড়ে। ভোরের ঠাণ্ডায় মেঝেতে কুঁকড়ে থাকা রূপী হাঁচি দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ধড়মড় করে উঠে বসে। জানলায় অস্পষ্ট আলোর দিকে সে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার চোখে আতঙ্ক।

রূপীর পায়ে এখনো বেড়ি নেই, সে উঠেই স্বামীর গা ঘেঁষে বসে, তারপর হাতকড়াবাঁধা হাত দু'খানা লক্ষ্মণের কোলে রাখে।

'তোকে বলেছিলাম পালাতে।'

'আমি পালাব না, যা হবার হবে', রোখা গলায় রূপী বললে।

তারপর নিজের মনেই বললে, 'সবাইকে বললাম, শেতলদা, সুরথদা, সারা গাঁয়ে

ঘুরলাম। কেউ এল না।'

'কেউ আসবে না।' লক্ষ্মণ গম্ভীর গলায় বললে।

রুপী তার মুখটা ঘষে লক্ষ্মণের বুকে। তারপর তার হাতকড়াপরা হাতখানা দিয়েই কপালে বাড়ি মারে।

'এটা কি করিস?'

'আমি একটা বোকা বউ।'

লক্ষ্মণ বুঝতে পারে, কিন্তু কিছু বলে না। বছর দুই আগে বিয়ের পর চিরা-চরিত প্রথা অনুযায়ী রুপী বাপের বাড়ি, মাস ছয়েক হল স্বামীর ঘর করছে, কিন্তু এখনো তারা শারীরিকভাবে মিলিত নয়। যতবারই লক্ষ্মণ এগিয়েছে, রুপী সিঁটিয়ে গেছে, একবার তার হাত কামড়ে ধরেছিল। বন্ধু শীতল বলেছিল, 'সবাই ওরকম প্রথম প্রথম করে, বছর ঘুরতেই ঠিক হয়ে যাবে।' লক্ষ্মণ বছর ঘোরার প্রতীক্ষায় ছিল, এখন আর প্রতীক্ষা নেই।

বাইরে তখনো সেপাইরা নাক ডাকাচ্ছে। রুপী তার হাতকড়াবাঁধা মুঠিতে তার হাত দিয়ে আর একজোড়া বাঁধা হাত তার বুকের ওপর রেখে ঘষে। সে যেন এই মুহূর্তে তার ভুলের খেসারৎ দেবে, তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করবে।

লক্ষ্মণের কোনো সাড় নেই। সে দেখে একটা ফিঙে শিশিরে ভেজা কলা-গাছের মাথায় বসেছে, দুবার ল্যাজ নাচিয়ে আবার উড়ে গেল। কুকুরের ডাক আসে। অদূরে গোয়ালে গরুগুলোর নড়াচড়ার আওয়াজ আসে। সেপাইদের নাকডাকা বন্ধ। সে শুনেছে মন্দিরের চত্বরের গায়েই ফাঁসির মঞ্চ তৈরি। যদি এখনই, এই ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় সূর্য উঠবার আগেই সব চুকেবুকে যেত, তা হলে ভালো হত।

'আমাকে তোমার কোলে নাও,' বলবার সঙ্গে সঙ্গেই রুপী তার হাল্কা শরীর-খানা লক্ষ্মণের উরুর ওপর তুলে আনে।

লক্ষ্মণ তার ঠোঁট দুটো রুক্ষ ধুলোয় ভরা চুলের জটার ওপর রেখে বলে, 'রুপী তুই ঠিক তেমনি পাগলি আছিস। এবার অনেকগুলো পাখির আওয়াজ আসে। সেপাইরা গলা-খাঁকারি দিয়ে উঠে পড়ে।

বন্ধ দরজার জোড়ে তাদের একজন উঁকি দিয়ে দেখে বললে, 'রাম রাম!'

৪

চন্দনপুর আসতেই মাল্লারা জিরোবার জন্যে নামে। এক নাগাড়ে তারা আড়াই ঘণ্টা দাঁড় টেনে আসছে। মেজর ফাউলার তার গোলাপি মখমলের ফ্রিল-দেওয়া জামার ভেতরের পকেট থেকে সোনার চেনে আঁটা ঘড়ি বার করে সূর্যের দিকে চেয়ে বললে, 'আমরা বোধ হয় বারোটার আগেই পৌঁছে যাব।'

পাশেই হাট বসেছে। গুড়ের নাগরির পাহাড়, বাতাসে ভারি মাতা-গন্ধ। চার্লস ম্যাকিনটশ লাফ দিয়ে বললে, 'চলুন, ঘুরে আসি।'

'আমি ঠিক আছি। তুমি দুটো সেপাই সঙ্গে নাও। চারদিকে সব ক্রিমিন্যাল টাইপ।'

দু-জন সেপাইয়ের সঙ্গে সাহেব হাটে ঢুকলে সাড়া পড়ে যায়। ব্যাপারীরা মুখ তুলে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তাদের চোখে কৌতুহলের সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্ক।

একজন ফড়ে এসে সেলাম করে। একটু দূরত্ব রেখে একপাল ছেলেমেয়ে তাদের সঙ্গ নেয়। একটু অবাক হয়ে চার্লস লক্ষ্য করলে, সে যে-রকমটি ভেবেছিল, ঠিক সে-রকমটি নয় বাংলাদেশের গ্রাম। তাকে বলা হয়েছিল, কঙ্কালের মিছিল দেখবার জন্যে প্রস্তুত থাকতে, কিন্তু বেশ স্বাস্থ্যবান, কালো, চকচকে চেহারা। গয়লানি, মেছুনিদের চেহারা তার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দীঘল মেহগিনি হাতে কারুর কারুর সোনার বালা। কাপড় ও রেশমের ব্যাপারীরা বেশ পরিচ্ছন্ন, কেউ কেউ দু-হাত তুলে নমস্কার করলে। এক জায়গায় ডাঁই করে কাঁথা রাখা হয়েছে। বস্তা বস্তা তুলো, কলার কাঁদি, চালের বোরা, গুড় আর অদ্ভুত চড়া রঙ ও গড়নের মাটি, শোলা, কাঠের পুতুল। এক জায়গায় প্রচুর গরু, ঘোড়া, ছাগল। গরুর গাড়ির চাকার রাস্তা বড় এবড়ো-খেবড়ো। চার্লস ম্যাকিনটশ হোঁচট খেয়ে পড়ে। ঝলমলে সাদা সার্টিনের প্যাণ্টে দাগড়া দাগড়া মাটির দাগ লাগে। পাশের সেপাইরা তাকে সঙ্গে সঙ্গে তুলে ধুলো ঝেড়ে দেয়। একটি বালক তার স্বাভাবিক চাপল্যে চিৎকার করে, 'এ মা ছি-ছি, সাহেবের পাছায় ও কি!' বয়স্ক লোকেরা তাকে ধমকায়, সেপাইরা চোখ

পাকায়। চার্লস ত্বরিত পায়ে নৌকোয় উঠে আসে।

দু-ধারে অপরিসীম সবুজ। জলের গায়ে অশ্বত্থ সবুজ রেশমী পোশাকে হাত-পা নাড়াচ্ছে। পাশেই নীলাভ সবুজ আখের ক্ষেত, মাঠে ধান কোথাও বেশি পেকেছে, কোথাও কম, ফলে কোথাও তামাটে, কোথাও হলুদ, আকাশে শরতের আভাস থাকায় সাদা, নীল।

'চমৎকার জায়গা কিন্তু, মেজর ফাউলার', চার্লস উৎসাহে বলে ওঠে।

তারা দু-জনে পানসির সামনে শক্ত কয়েক হাত চাঁদোয়ার নীচে। দু-জনে পাশাপাশি কারুকার্য-করা পেতলের হাতলে হাত রাখে।

জেল-সুপার মেজর ফাউলার তার জাঁদরেল গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'সব ক্রিমিনালদের জায়গা।'

মেজর ফাউলার সম্প্রতি মুর্শিদাবাদের একটা গ্রামে ফাঁসি দিয়ে এসেছে। সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে, একজন সম্ভ্রান্ত নীলকর সাহেবকে চাষীরা পিটিয়ে মারল, কিন্তু কোম্পানি এ ব্যাপারে এগোল না।

'এখানেও এ-ব্যাপার হত না যদি-না ওখানকার আমিন, ঐ যে মিত্র না কে, ব্যাটাকে ধরিয়ে না দিত। আমাদের তো সব জায়গায় লোকজন এখনো ঠিক বসে নি। পুরনো নবাবী শাসন তো এখনো আছে। জমিদার-ফৌজদার এই-সব ক্রিমিনালদের আশ্রয় দিচ্ছে। সেইজন্যেই তো মুশকিল।' আবার গোঁফ নাড়াচাড়া করে ফাউলার।

একটা ন্যাংটো ছেলে মস্ত একটা ছড়িহাতে নদীর পাড়ে ছাগল চরাচ্ছে। সে অবাক হয়ে সাহেবদের পানসি নজর করে। সবচেয়ে তাকে আশ্চর্য করে নীল কুর্তার ওপর জাফরানী পাগড়িপরা ছ-জন সেপাই সোজা খাড়া দাঁড়িয়ে আছে। এরকম রংদার দৃশ্য সে আগে কখনো দেখেনি। সেপাইদের তিনজনের কাঁধে তিনটে গাদা বন্দুক, আর তিনজনের হাতে খোলা তলোয়ার রোদ্দুরে ঝলকায়।

'আপনি এই ছেলেটার দিকে চেয়ে দেখুন। ন্যাংটো, কিন্তু কি চমৎকার স্বাস্থ্য! হাটে গিয়েও দেখলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়। বেশ স্বাস্থ্যবান, ভালো খায়দায়, বিশ্রাম করে, এরকম মানুষই বেশি।'

মেজর ভুরু কুঁচকে বললে, 'তুমি কী বলতে চাও, চার্লস?'

'বিশেষ কিছু না। ভেবেছিলাম কঙ্কাল দেখব বাংলাদেশের গ্রামে, কিন্তু দেখছি বেশ তাজা মানুষ।'

'এই অঞ্চলটাই ক্রিমিনালদের রাজত্ব, লুটপাট করে খায়, তাই পয়সা পায়।'

'এখানে শুনেছি অনেক ঘর তাঁতিদের বাস।'

'তুমি কি মনে কর তাঁতিরা ক্রিমিনাল নয়, সব ভালোমানুষ? এই যেখানে যাচ্ছি সেখানে লক্ষ্মণ দাসও তো তাঁতি ছিল। অবশ্য আমি ফিরে গিয়ে বলব, এ অঞ্চলের লোকজনদের যেন কাজ না দেওয়া হয়।'

চার্লস বললে, 'ওটা করবেন না। রজার্স আপনাকে বলে নি, নবগ্রামের আর রঘুনাথপুরের আড়ং থেকে আমার কুড়ি পার্সেণ্ট আসবে? এই যে দেখুন, আমার কাছে কাগজও আছে।' নার্ভাস আঙুলে রজার্সের চিঠিখানা বার করে চার্লস।

হাত তুলে বাধা দিয়ে ফাউলার বললে, 'ঠিক আছে, বলব না। তোমার ক্ষতি হবে এটা আমি চাই না, তবে খুব সাবধান। তুমি একটু ভালোমানুষ টাইপ দেখছি। ল্যাণ্ডস্কেপ দেখে মুগ্ধ হচ্ছ, লোকজনের চেহারা দেখে মুগ্ধ হচ্ছ। আমরা কিন্তু মুগ্ধ হবার জন্যে ইণ্ডিয়াতে আসি নি। আমরা এসেছি রাজত্ব করতে।

'ব্যবসা করতে বলুন।'

'ও-সব ভিরকুটি ছাড়, ওগুলো আমরা বাইরে বলব, কিন্তু আমরা তে ভেতরে ভেতরে জানি, আমরা কী করতে চাই। আমিনদের হটানো হচ্ছে ফৌজদারদের হটানো হচ্ছে, নবাবী আমলের সব কিছু চিহ্ন তলে তলে মুছে ফেলছি।'

উৎসাহের সঙ্গে ফাউলার সশব্দে হেসে বললে, 'গ্রেট গ্রেট।' গভর্ণর-জেনারেল সত্যিই গ্রেট!' একটু থেমে মুখ নামিয়ে বলে, 'তা ছাড়া হায়দার আলি মরে গেছে, আউধে, বাংলাদেশে নপুংসক নবাব, গোটা ভারতবর্ষ আমাদের হাতে একটা মস্ত সাজানো কেকের মতো উঠে আসছে। এখন আমরা টুক টুক করে কাটব, আর কুট কুট করে খাব।'

আবার একটা গ্রাম, ধানের মরাই, গরুর গাড়ি, শিবমন্দির। ঘাটে মেয়েরা ডুব দিচ্ছে, ছেলেরা জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে। একজন জটাধারী সাধু স্নান সেরে সূর্যবন্দনা করছে।

মেজর ফাউলার বললে, 'স্ট্রেঞ্জ ল্যাণ্ড, ফুল অফ সুপারস্টিশান।'

মুখের কাছে তার উত্তরটা এসেছিল 'স্ট্রেঞ্জ বলেই তো ভালো লাগছে,' কিন্তু জবাব না দিয়ে চার্লস একটা মাছরাঙার ওড়া দেখতে থাকে। ঝুপ করে জলে

পড়েই উড়তে উড়তে গাছের ডালে বসে। আট দাঁড় একসঙ্গে জল কাটে, তর তর করে পানসি এগোয়।

নবগ্রামের বাঁক দেখা যায়। দু-খানা পানসি সাঁ সাঁ করে চলেছে। পেছনের পানসিতে বল্লমহাতে দু-জন চোবদার এবং প্রথম নৌকোর মতো গাদাবন্দুক ও তরোয়াল হাতে খাড়া ছ-জন সেপাই। তাদের পরণেও নীল কোর্তা, মাথায় জাফরানী পাগড়ি। ঘাটের সামনে জনতা। অদূরে আমিন রামগতি মিত্রের অন্দরমহল থেকে শাঁখের আওয়াজ আসে। ঘাটে পানসি ভিড়বার আগে চোবদাররা বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়ে এবং শূন্যে গাদাবন্দুক তুলে সান্ত্রীরা ফায়ার করে। চারপাশের নৈস্তব্ধ্য খান খান হয়ে যায় তাঁতিপাড়া থেকে এক-একজন করে লোক বেরিয়ে ঘাট থেকে কিছু দূরে গোল হয়ে দাঁড়ায়। বাতাসে বারুদের গন্ধ আর গোল গোল ধোঁয়া ভাসে।

ঘাটের উঁচু পাড়ের কাদায় ক্ষীররঙা বাফ্‌তার থান পেতে দেওয়া হয়েছে। ম্যাকিনটশ প্রথমে নেমে ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু মেজর ফাউলার নির্দ্বন্দ্বে দাগরা দাগরা বুটের ছাপ দিয়ে এগিয়ে যায়! ম্যাকিনটশ অনুসরণ করে। উঠেই রামগতির এক বৃদ্ধ কর্মচারী পিতলের থালায় ফুল, চন্দন, মোহর এগিয়ে দেয় সাহেবদের দিকে। দু-জনে একটা-দুটো মোহর তাচ্ছিল্যভরে তুলে নিয়ে মাথা হেলায়। নায়েবমশাইয়ের হাত থেকে দুটো ফুলের তোড়া তুলে রামগতি সাহেবদের হাতে দেয়। তারা মৃদুস্বরে ধন্যবাদ জানায়।

রামগতি এবার সামনে এসে অর্ধেক সংস্কৃত ও অর্ধেক বাংলায় তার গুরুর তৈরি এক অভিবাদন মুখস্থ বলে যায়, মহানুভব কোম্পানি বাহাদুরের মহান প্রতিনিধিদ্বয় নবগ্রামে পদার্পণ করে ধরিত্রী ধন্য করিয়াছেন। তাঁহারা ন্যায়বিচারে যুধিষ্ঠির, মেধায় ভীষ্ম এবং ক্ষাত্রবীর্যে গাণ্ডীবধারী অর্জুন। তাঁহাদের আগমনের অপেক্ষায় গ্রামবাসী তৃষিত চাতকের ন্যায় কাতর। গ্রামবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন একজনমাত্র হঠকারী, দুরাচারী পামরের জঘন্য কর্মের জন্য সমস্ত তন্তুবায়সমাজকে নিগৃহীত না করেন। সমস্ত তন্তুবায়সমাজ এবং গ্রামের অধিবাসীগণ কোম্পানি বাহাদুরের ন্যায়বিচার ও সদাচারে সম্পূর্ণ আস্থাবান। আইন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিয়াছে। দেশবাসী জানেন, কোম্পানি বাহাদুরের সুযোগ্য শাসনে দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সামাজিক প্রগতি ত্বরান্বিত। সেইজন্য পুনর্বার অনুরোধ, অপরাধীকে সমুচিত দণ্ডদান ও নিরপরাধ নিরীহ মানুষকে আশ্বাসপ্রদান করা

হউক।

শেষের অংশে অভিরাম মুনশী তার ঢ্যাঙা শরীরটা বাঁকিয়ে হাত-পা নেড়ে অনুবাদ করে। সবটা আসে না, অনেকটা এইরকম দাঁড়ায়: 'দে ফরগিভ্, দে রিপেণ্ট, ইউ আর দ্য ফাদার, মাদার, দে অ্যাফ্রেড।' ফাউলার তাকে হাত নাড়িয়ে থামায়।

এর পর চা-পান। গতকাল সন্ধেবেলায় দেবদারুপাতা দিয়ে কাছারিবাড়ি সুন্দর করে সাজানো হয়েছে, ফরাশ পাতা হয়েছে, ঝুল ঝেড়ে ঝকঝকে তকতকে করা হয়েছে। রামগতির সরকারমশাই লাল, নীল কালিতে বড় বড় অক্ষরে লিখেছেন, 'স্বাগতম্'। রামগতির মামাশ্বশুর কলকাতার ব্যানিয়ান। সেখান থেকে সে চীনদেশীয় চা এবং ফ্রুট কেক আনিয়েছিল। তা ছাড়া সন্দেশ, আখরোট, বাদাম। পাঁউরুটি জোগাড় হয় নি বলে রামগতির মনটা খুঁৎখুঁৎ করে।

মেজর ফাউলার তরুণ সহকর্মীকে বললে, 'তুমি নিশ্চয় এদের আতিথেয়তার খুব মুগ্ধ।'

'আমার বরাবরই মনে হয়েছে, দক্ষিণ ভারত আর বাংলাদেশ আলাদা। আমি তো ভাবতেই পারি না, আমাদের দেশে ফরাসিদের আমরা এমনভাবে অভ্যর্থনা করব।'

'তোমার উপমাটা একদম বাজে। ইউরোপ আর এশিয়ার মধ্যে কোনো উপমা হয় না। ফরাসিদের কালচার আর বাঙালিদের কালচার। কার সঙ্গে কী তুলনা করছ?'

'না, আমি ঠিক এইভাবে তুলনা করছি না, কিন্তু আপনি দেখুন এদের মুখ-চোখ। কোনো জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, আমাদের অভ্যর্থনা করাই যেন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

মেজর ফাউলার একটা কেক ভেঙে মুখ দিয়ে বললে, 'বাঃ, বেশ ভালো তো।'

রামগতি ফরাশ থেকে তার লম্বা রোগা দেহটা সামনের দিকে বাড়িয়ে বললে, 'আমার মামাশ্বশুর স্যার কলকাতায় মার্টিন কোম্পানির ব্যানিয়ান। কেক, চা, ফ্রুটস সব পাঠিয়েছে। তবে স্যার পাঁউরুটিটা বাসি হয়ে ছাতা পড়ে গেছে।

অভিরাম মুনশী আর-একবার অনুবাদের চেষ্টা করে, কিন্তু পাঁউরুটিপ্রসঙ্গ আয়ত্ত করতে পারে না।

'ইউ আর এ ডিউটিফুল আমিন,' মেজর ফাউলার বললে।

ফরাশে হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে রামগতি বললে, 'আমাদের স্যার একটু দেখবেন স্যার। এখন নবাব থেকেও নেই। আপনারাই নবাব, আপনারাই মা, বাপ।'

মেজর ফাউলারের গোঁফের ওপর হাসির রেখা ফোটে। 'আমরা যদি মা, বাপ হই, তা হলে বলব, আমাদের ছেলেরা একদম সজাগ নয়। তারা কি দিনদুপুরে ঘুমিয়েছিল যে, তাদের চোখের সামনে আমাদের পাইক খুন হয়?' বলেই মুনশীর দিকে চেয়ে থাকে। মুনশী প্রমাদ গোণে। একেবারেই বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। এমন ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বলার কী দরকার। সে দশ বছর মুনশীর কাজ করছে, কিন্তু এই গত দশ বছরে ইংরেজি ভাষার পেছনে সে মরীচিকার মতো ধাবমান, কিন্তু দমে না, দমলেই সর্বনাশ। চোখ, মুখ পাকিয়ে বললে, 'সাহেব কি বলছে বুঝতে পারছ। সাহেব রেগে গেছে। সাহেব বলছে, যে খুন করেছে, সে এখনো বেঁচে আছে কেন?'

ফাউলার অল্প বাংলা শিখেছে। সে অভিরামের উদ্ভাবনীশক্তির মনে মনে তারিফ করে। সত্যিই এই কথাটাই সে বলতে চেয়েছে। নেটিভদের মধ্যে যদি এই রকম বিশ্বস্ত এক সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যারা কোম্পানির প্রয়োজনমাফিক নিজেরাই আইনপ্রয়োগ করতে অভ্যস্ত, তা হলে এই স্বল্প কয়েকজন ইংরেজ অফিসারকে গ্রামাঞ্চলে দৌড়ে আসতে হয় না। মেজর ফাউলারের মনে পড়ে যায়, আজ গ্র্যাণ্ট সাহেবের বাড়িতে বলনাচের আসর।

ম্যাকিনটশ বললে, 'এখনই কি আসামীর ফাঁসি দেওয়া হবে?'

'পাগল। জিরিয়ে নাও। অত তাড়া কিসের?'

এমন সময় দুজন হুঁকোবরদার দুটো রুপোর গড়গড়া নিয়ে আসে। বাস্তবিক পানসিতে কয়েক ঘণ্টা পিঠ খাড়া করে বসে থাকতে থাকতে চার্লস ম্যাকিনটশেরও পিঠ ধরে গেছে। হুঁকোর নলটা হাতে তুলে নিয়ে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে সে গড়গড়ায় টান দেয়।

মেজর ফাউলার বললে, 'তুমি ইণ্ডিয়াতে যাই কর সবই একটা গ্র্যাণ্ড স্টাইলে করতে হবে যাতে লোকের ধারণা হবে যে, এখন যা ঘটছে তা সম্পূর্ণ আলাদা, তা নবাবদের আমলে হয় নি।'

'দ্যাটস রাইট।' উৎসাহের সঙ্গে বললে তার তরুণ সহকর্মী।

৫

চারটে ছাগল আর চারটে ভেড়া কাটার হুকুম দিয়েছে সরকারবাবু। সাহেবদের হেড বাবুর্চি রান্নার ভার নিয়েছে। তা ছাড়া রামগতি লোক লাগিয়ে দু-জোড়া খরগোশ আর তিতির মারিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো ঘি, গরম মসলা আর রকমারি মাংসের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। ছেলেপিলেরা দৌড়াদৌড়ি সুরু করে দেয় এবং মাঝে মাঝে সেপাইরা বাজখাঁই গলায় তাদের হাঁকিয়ে দেয়। ফাঁসির উৎসব সুরু হয়েছে নবগ্রামে।

গন্ধে এক প্রবল আকর্ষণ আছে। সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত কিংবা কৃষ্ণচূড়া, পলাশের বাহারে চোখ আকৃষ্ট হয় কিন্তু মাংসের গন্ধ, ফোড়নের গন্ধ, গরমে পোড়া মাটির ওপর প্রথম বৃষ্টির গন্ধ—এদের আকর্ষণ অন্য জাতের। তা যেন আমাদের এই ধুলোভরা পৃথিবীটাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে আসে, আরো বাঁচতে ইচ্ছে করে। লক্ষণ দাসের তন্দ্রা ছুটে যায় এই ঘ্রাণে। সহসা তার মনে হয়, সে পরপারের লোক নয়, সে আর পাঁচটা মানুষের মতো। অভুক্ত অবসাদে অচেতন স্ত্রীকে ডাক দেয়, 'রূপী, রূপী!' রূপী ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে পড়ে যায় পায়ের বেড়িতে। তারপর আস্তে আস্তে কনুইয়ে ভর করে উঠে বসে। উঠেই বলে, 'বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।'

'আমারও।'

'খুব রান্নাবাড়ি হচ্ছে সাহেবদের জন্যে।'

লক্ষণ যেন ঘুমের ঘোরে বললে, 'আমাকে একদিন মাংস খাওয়াবি রূপী। কচি পাঁঠার ঝোল। একটা গোটা কচি পাঁঠার ঝোল করবি। প্যাঁজ, রসুন লাগবে না। শুধু আদা দিবি আর কাঁচা লঙ্কা।'

'আমি তো রাঁধতেই পারি না', রূপী হাসে।

'শিখবি, শিখবি, সব শিখে যাবি। আমি আগে রেশমের কাজ জানতাম? জানতাম না। সুতো জড়িয়ে জট পড়ে যেত।'

রূপী তার শেকলে বাঁধা হাত দুখানা দিয়ে কাঁধ চুলকে বলে, 'শুনেছি, আমায় বেচে দেবে। গরু-ভেড়ার মতো বেচে দেবে।'

লক্ষণ রূপীর কথায় কান দেয় না। বলে, 'তোকে আমি বুনো শুয়োরের মাংস খাওয়াব। একেবারে রসগোল্লা। গোটাটাই তেল!'

'বুনো শুয়োর ?'

আমাদের বটতলা পেরিয়ে যে মাঠ, সেখানে যে মোটা বাবলাগাছটা আছে, ওখানে রোজ আসে। আমি তীর মারতেই ছুটে এল। ছুটে এসেই গাছটার ওপর আছড়ে পড়ল। আমি পেছনে হটে গিয়ে সড়কি মারলাম। একেবারে রসগোল্লা, জানিস রুপী, আগাগোড়া তেল।'

'তুমি ঐ বাঁশটা দিয়ে আমার মাথায় একটা বাড়ি দাও। সব শেষ। আবার কোথায় যাব ? কোথায় নিয়ে যাবে ?'

'দূর বোকা! বেঁচে থাক। যখন পৃথিবীতে এসেইছিস, সব কিছু দেখে নে। মরতে কতক্ষণ ? আমরা তো মরেই আছি।'

একটুক্ষণ থেমে বললে, 'তোকে বোধ হয় কলকাতায় নিয়ে যাবে। সাহেবদের সঙ্গে থাকবি। যদি পছন্দ হয়, নিকেও করে নিতে পারে।' লক্ষণ সশব্দে হেসে ওঠে।

'তার চেয়ে আমাকে মেরে ফেলো না।'

এমন সময় ভারি বুটের আওয়াজ আসে।'

'বেঁচে থাক রুপী, বেঁচে থাক।'। লক্ষণ বলসে।

মেজর ফাউলার যাই করে, সবই গ্র্যান্ড স্টাইলে করতে ভালোবাসে। ঝপ করে মারদাঙ্গার মারফৎ গ্রামাঞ্চলে ত্রাসসৃষ্টি, তার ইচ্ছে নয়। সে-সব ফৌজদারি ব্যাপার ফৌজদারদের সময় হত, কিন্তু ইংরেজদের শাসন আইনের শাসন। তাই আইনের পথে থেকেই আতঙ্কের জমকালো পরিবেশসৃষ্টি করার পক্ষপাতী মেজর ফাউলার। সামান্য বিশ্রাম নিয়েই ঢেঁড়া দেওয়ার হুকুম দিয়েছে সে এবং গঙ্গার পার দিয়ে ঢেঁড়াপেটার আওয়াজ আসছে। মন্দিরের চত্বরে ইতিমধ্যেই লোক আসতে সুরু করেছে। শুধু তাঁতিপাড়া নয়, পাশের গাঁয়ের বর্ধিষ্ণু কামারপাড়া থেকেও লোক আসতে শুরু করেছে। রটে গিয়েছে আসামী এবং আসামীর স্ত্রী দুজনকেই ফাঁসি দেওয়া হবে। একটা না বাজতেই সেপাইরা সার দিয়ে ভৃত্যাবাসের দিকে এগিয়ে যায়। বন্ধ দরজার তালা খুলেই হাঁক দেয়, 'ওঠো, ওঠো।' একজন বললে, 'দোনোকো একসাথ মে ফাঁসি।'

'তাই ভালো, আমাকেও ফাঁসি দাও।'

লক্ষণের উঠতে মাথা ঘুরে যায়। এমনিতে পায়ে বেড়ি ও হাতকড়া থাকায় শরীরের ভারসাম্য রাখা মুশকিল। তারপর তিনদিনের নির্জলা অনাহার এবং মাথার গভীর ক্ষতে সে কাবু বোধ করে। সেপাইরা তাকে হেঁচড়াতে

হে'চড়াতে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চের গায়ে বসিয়ে দেয়। হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়ি পরে র্পীও তার পাশে বসে।

এবং র্পীও বিশ্বাস করে যে, সেও পরলোকের যাত্রী। চারপাশের কোলাহল, কৌতূহলী চোখ তাকে স্পর্শ করে না। বাব্দের ঘরে স্ত্রীলোকদের সহমরণের কথা তার এক-একবার মনে হয়, তবে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার চেয়ে ফাঁসে দমবন্ধ হয়ে মরা বরং ভালো। বে'চে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। র্পী মাথা তুলে মন্দিরের মাথায় ঘট আর নিশানের ওপর এক ট্করো মেঘ লক্ষ্য করে। শীতের কোমল রোদ্দ্রের স্নেহভরা আলিঙ্গনে সে ঝিমোতে থাকে। জীবনের কাছ থেকে তার খ্ব একটা প্রত্যাশা নেই।

অনতিদ্রে কাছারীবাড়িতে তখন লাঞ্চ-টেবিলে খাবার দেওয়া হচ্ছে। রামগতির বাড়ি থেকে গদি-আঁটা উ'চু চেয়ার পাতা হয়েছে। থরে থরে খাবার সাজানো টেবিলে। ফাউলার সাহেবের বাব্র্চি বেড়ে রে'ধেছে। চার্লস ম্যাকিনটশের জিভে ঘিয়েভাজা তিতির অপ্র্ব লাগে। কিছ্ক্ষণ আগে আধবোতল ক্ল্যারেট উড়িয়েছিল, তার সঙ্গে অল্প ঝাল, অল্প মিষ্টি মাংস। তিতিরের পরে একটা গোটা খরগোশের রোস্টে সে মনোনিবেশ করে। খেতে খেতে তার নাক দিয়ে জল গড়ায়।

সেদিকে চেয়ে ম্চকি হেসে ফাউলার বললে, 'খ্ব খারাপ রাঁধে না আমার বাব্র্চি, কি বলো?'

'একসেলেন্ট! একসেলেন্ট!'

'তুমি বড্ড বেশি শব্দ করে খাচ্ছ।'

'এটা ইণ্ডিয়া।' ম্যাকিনটশ শ্ন্যে কাঁটা তুলে প্রতিবাদ করে।

খেতে খেতে বেলা বাড়ে। খাবার পর এক বোতল ম্যাডেইরা খোলা হয়। মেজর ফাউলারকে এখন দেখায় দ্ঢ়প্রতিজ্ঞ, তার কথা কমে আসে। বোতল যত শেষ হতে থাকে, তত সে লম্বা গোঁফে হাত ব্লোতে থাকে।

পেটা-ঘড়িতে ঢং ঢং করে দ্টো বাজে। মেজর ফাউলার আঙ্ল তুলে ইশারা করে ম্ন্শীকে এবং ম্শির্দাবাদেও যেমন হয়েছে এবারেও সেই প্রনো নাটকের রিহার্সাল হয়। কাঁপা-কাঁপা গলায় একটা পাকানো লম্বা হল্দ কাগজ পাঠ করতে করতে ম্ন্শী চে'চিয়ে আব্ত্তি করে, 'মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জের অসীম কর্ণায় ভারতে বাণিজ্যরত মহান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ডিরেক্টরগণ সমস্ত দেশে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ ও বিহারে আইন ও

শৃঙ্খলা-প্রবর্তনে ব্রতী হইয়া কোম্পানির কর্মচারীকে নির্দেশ দিয়াছেন। সেই আদেশ অনুসারে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে উদ্যোগী হইয়া কোম্পানি ফৌজদারদের হস্ত হইতে নিজের হস্তে আইন ও শৃঙ্খলার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।'

মেজর ফাউলার বাংলা বোঝে। সে একাগ্রভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে শুনতে থাকে! কিন্তু চার্লস ম্যাকিনটশের কানে কিছু ঢোকে না। মুখে গড়গড়া দিয়ে আধবোঁজা চোখে সে নেতিয়ে পড়ে চেয়ারের হাতলে। ফাঁসির ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখা তার পছন্দ হয় নি। এখানে নামার আধ ঘণ্টার মধ্যেই চুকিয়ে বুকিয়ে দিতে খেতে বসে সন্ধ্যা পর্যন্ত পান তার মনঃপুত ছিল। এদেশে পানের প্রতি আসক্তি তার দিনকে দিন বেড়ে গেছে। পান করলে সন্ধ্যার পর মশার কামড় টের পাওয়া যায় না, পানের স্বপক্ষে এই নতুন যুক্তি সে তার পরিচিত লোকজনের মহলে চালু করার চেষ্টা করছে।

বিশাল ভণিতার পর নবগ্রামের প্রসঙ্গ ওঠে। 'ইহার পরই নবগ্রামে যে নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা উল্লেখযোগ্য। কোম্পানি বাহাদুরের অপরিসীম করুণায় দুঃস্থ তাঁতিদের সাহায্যার্থে তাহাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যাহারা নীচ, দুর্মতি, তাহারা পরার্থপরায়ণ সদাশয় কোম্পানি বাহাদুরের এই মহানুভবতা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। লক্ষণ দাস এইরকম পামর যে, তাহার ভিতর কৃতজ্ঞতার লেশমাত্র নেই, সামান্য অনুতাপ-বোধও নাই। সে একবার হত্যা করিয়াই হৃষ্ট হয় নাই, বরং তাহার রক্ত-লোলুপতার চরিতার্থে দ্বিতীয়বার হত্যার প্রচেষ্টায় শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় কর্তব্য-পরায়ণ সেপাইদের আক্রমণ করিয়াছে। সত্যই বটে, লক্ষণ দাস এক রক্তপ-রাক্ষস। সমস্ত অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া এতদ্বারা ঘোষণা করা হইতেছে যে 'আজ অপরাহ্ণ সাড়ে তিন ঘটিকায় আসামীকে ফাঁসি দেওয়া হইবে।'

চার্লস ম্যাকিনটশের কানে কিছুই পেঁছিয় না। সে ঘড়র ঘড়র করে নাক ডাকতে সুরু করেছিল। ফাউলারের কনুইয়ের খোঁচায় সে ধড়মড় করে উঠে বসে।

ইতিমধ্যে একটা সোরগোলের আওয়াজ ওঠে। সুলেমান নামে যে স্লেভ ওয়্যার-হাউসের দালাল মেজর ফাউলারের সঙ্গে এসেছিল, দ্বিতীয় নৌকায় সে হন্তদন্ত হয়ে ঢোকে। 'আসামীকে ভাইভি বদমাস হ্যায়। উসকো পাকড় লিয়া।' লক্ষণের দূর-সম্পর্কের ভাই কানাই সুতো কিনতে দূরের গাঁয়ে গিয়েছিল। দুদিন পর ফিরেছে আজ সকালে। লক্ষণের পাশে রূপীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ

অবস্থায় দেখে লাঠিহাতে ছোকরা তেড়ে এসেছিল, শীতল, সুরথ অন্যান্য মাতব্বরকে তোয়াক্কা না করে। বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে তাকেও কয়েদ করা হয়েছে।

'পাকড়ো, পাকড়ো, গভর্ণর-জেনারেল সাব কা হুকুম। উসকো জরুকো পাকড়ো, উসকো ভাইকো পাকড়ো, উসকো বাচ্চাকো পাকড়ো।'

'বাচ্চা নেহি হ্যায় সাব।'

তারপর সুলেমান সোৎসাহে তার গ্রাম-পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে। গ্রামের লোকেরা বড়ই রক্ষণশীল এবং খুব বেশি ভেতরে যেতে তার সাহস হয় নি। তবে সে একেবারে রিক্তহস্ত নয়। একটা মুড়িওয়ালি তার আট বছরের ছেলেকে দেড় টাকায় বিক্রি করেছে।

'জরুর।'

'হঁ্যা, আইনকা মাফিক কাম।' মুড়িওয়ালির টিপসইদেওয়া একটি ময়লা কাগজ সুলেমান সামনে এগিয়ে দিয়েছিল, সেইদিকে চেয়ে ফাউলার বললে, 'চলো, এবার ওঠা যাক।'

'ম্যাকিনটশের তখনো তন্দ্রা ছোটে নি। আড়মোড়া ভেঙে বললে, 'আমাকেও যেতে হবে?'

কঠিনস্বরে ফাউলার বললে, 'ছেলেমানুষি কোরো না। ছেলেমানুষি করার জন্যে তোমাকে কোম্পানি পয়সা দিচ্ছে না।'

৬

লক্ষ্মণ আর কানাই দুই ছায়াপথ। লক্ষ্মণ তর্ক করে, প্রতিবাদ করে, কানাই শুধু মেনে নেয় তাই নয়, সে মুগ্ধ হয়। লক্ষ্মণ যখন মাঝে মাঝে অন্ধকার রাতে লম্ফের আলোয় দেশকাল সম্পর্কে বক্তৃতা করেছে, নবাবী শাসনে কারিগরদের আর্থিক স্বনির্ভরতা কোম্পানির শাসন চুরমার করেছে, এই অভিযোগ প্রমাণের চেষ্টায় সুতোর দাম, জলকর ইত্যাদি প্রশ্নর অবতারণা করেছে, তখন তার দশ বছরের ছোট ভাই নদীর পাড়ে বসে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছে।

শুধু নবগ্রাম কেন, তার পাশে বীরপুর, মালঞ্চ, চারপাশের গ্রামে তাঁতিপাড়ার কানাইয়ের পরিচয় তন্তুবায় নয়, সে একজন যাত্রাপার্টির শিল্পী। কর্ণার্জুন-

পালায়, সীতার বনবাসে তার বাজনা মানুষকে অভিভূত করে। মহিলারা তাকে বাড়িতে ডেকে খাওয়ায়, কর্তাদের পালাপার্বণের উৎসবে তার ডাক পড়ে। ষোল বছরের বালক পরিষ্কার করে বলতে পারে নি দাদার কাছে তার মনের কথা। বরঞ্চ দাদার বউ যে তার খেলার সঙ্গী তাকে সে বুঝাবার চেষ্টা করেছে। সত্যিই কি এসে গেল, নবাব থাকল, না কোম্পানি থাকল। নদীর পাড় তো আছে। চাঁদনি রাত তো কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। ঝাঁকড়া অশ্বত্থের ছায়ায় সারা দুপুর ঘুমুতে তো কেউ বারণ করে নি। তা ছাড়া তার কান তৈরি হয়ে গেছে, সে বোঝে সুরের ঝর্না কতখানি মনকে ভরিয়ে রাখে। ভোরবেলায় গাঁয়ে ঢুকবার মুখেই যে বকুলবীথি, তার তলায় সে যখন গুনগুন ক'রে ভৈ'রো আলাপ করে, তখন এক প্রবল স্বয়ংসম্পূর্ণতাবোধ তাকে ভর করে থাকে। বাস্তবিক সবচেয়ে দুঃখ তো মৃত্যু। মরলে অনেক সময় পয়সার অভাবে আধপোড়া অবস্থায় নদীতে দেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সে দৃশ্য তাকে ভাবায় না, কারণ মৃত্যু তার কাছে ইউরোপীয় অর্থে ভয়ংকর নয়। মৃত্যুসলিলেই তো মানুষ ভেসে বেড়াচ্ছে, মৃত্যু সব সময় মানুষকে আলিঙ্গন করে আছে। কাজেই কানাই ভাবে জীবনও যা, মৃত্যুও তাই, অর্থাৎ জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। কানাই রূপীকে বলেছে 'এত আঁকপাঁক করবার কি আছে। যা আসছে আসতে দাও, যা যাচ্ছে যেতে দাও।' রূপী বলেছিল, 'কবিয়াল, তোমার কথা কেউ বোঝে না।'

'তুমি বোঝো?'

রূপী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, 'কি জানি!'

তারপর বকুনির গলায় রূপী হঠাৎ বলে উঠেছিল, 'মানুষ ভাববে না? সুতোর দাম চড়ে যাচ্ছে। কোম্পানি কাপড়ের যা দাম দিচ্ছে তাতে শুধু লোকসান খাচ্ছি আমরা। মানুষ ভাববে না, শুধু বাঁশি বাজাবে?'

'মানুষ কী করবে? গলায় দড়ি দিয়ে মরবে?'

'মরবে কেন?' লক্ষ্মণের কথার প্রতিধ্বনি করে রূপী। 'মানুষ জোট বাঁধবে, রুখবে। কাপড়ের পেটি নিতে এলে আমরা রুখে দেব। আমরা খেটে খেটে রক্ত জল করব আর তার বদলে দু মুঠো খেতে পাব না?'

'বাঃ! দাদার কথা মুখস্থ বলছ।'

'বলব না কেন, সত্যিকথা বার বার বলতে হয়।'

'দাদার মতো আর কটা লোক আছে তাঁতিপাড়ায় যে রুখবে।'

রূপী তার সরু হাতখানা মুঠি করে বললে, 'আমি আছি।'
হেসে উঠে কানাই বলেছিল, 'তা হলে আমিও আছি।'
সাতদিন যাত্রাগানের পার্টির সঙ্গে ঘুরে ঘুরে যখন তার রেস্ত ফুরিয়ে এসেছে, তখন সুতোকেনার কথা কানাইয়ের মনে পড়ে। মালঞ্চের হাটে সে কথাটা শুনল—দাদা ও রূপীর একইসঙ্গে মৃত্যুদণ্ডের কথা। তার সমস্ত জগৎটা হঠাৎ নিঃশেষিত হয়ে গেল। দাদা চিরকালই রোখা মানুষ। সে যদি কোম্পানির পাইক খুন করে থাকে, তা হলে তার মৃত্যুদণ্ড অন্যায্য নয়, কিন্তু রূপী তো মানুষ খুন করে নি, মানুষ খুন করা তার পক্ষে অসম্ভব। কোনোদিন কানাই প্রতিবাদ করতে অভ্যস্ত নয়। বরং যারা প্রতিবাদ করে তাদের সম্পর্কে একটা বাঁকা হাসি তার মুখে সব সময় লেগে থাকত, কিন্তু মালঞ্চের হাটে দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারল, প্রতিবাদ যেন জীবন্ত হয়ে তার গলা পর্যন্ত ঠেলে উঠেছে। সে সোজা মালঞ্চ থেকে তিন মাইল পথ দৌড়ে আসে তাঁতিপাড়ায়। সমস্ত পাড়া ফাঁকা। অনেকে ঝাঁপ বন্ধ করে মন্দিরের চত্বরে জমায়েত হয়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে তার লম্বা দেহটা দুমড়ে সে পিসির খুপরিতে ঢোকে।
বৃদ্ধা অন্ধ, বাতেও পঙ্গু। পায়ের শব্দে ঘাড় তুলে বললে, 'শুয়ারেরা ছেলেকে ফাঁসি দেবে। গাঁয়ে কি একটা পুরুষমানুষ নেই?'
'রূপী?'
'রূপী! রূপী!' বিকৃত গলায় শূন্যতা খামচায় বৃদ্ধা। রূপী জাহান্নামে গেছে।'
মুগ্ধ কিশোর অন্ধকার ঘরের কোণ থেকে তার দাদার লাঠিটা তুলে নেয় যে লাঠি দিয়ে লক্ষ্মণ সাপ মারত।

লাঠি হাতে মন্দিরের চত্বরে কানাইয়ের প্রবেশে একটা হই হই পড়ে যায়। বয়স্করাও কৌতূহলীচোখে দেখে, যে ছেলেটা বাঁশি বাজায়, তার হাতে লাঠি। একেবারে যাত্রাদলের লাঠিয়ালের মতো কানাই তাল ঠুকে হাঁক পাড়ে, 'রূপীকে ছেড়ে দে বলছি, নইলে এখনই তোদের সবংশে নিধন করব।' শূন্যে লাঠিখানা একটা বৃত্ত টানবার সঙ্গে সঙ্গেই পেছন থেকে সুলেমান তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর একজন সিপাইয়ের সাহায্যে তাকে পিছমোড়া করে বাঁধে। ঠিক এমন সময় একটা চাপা কোলাহল শোনা যায় জনতার মধ্যে। সুলেমানের দু-তিন হাত দূরে একটা ঢিল পড়ে। একজন মাঝবয়সী মহিলা চেঁচিয়ে ওঠে। 'ওরে ছেড়ে দাও, ওরে ছেড়ে দাও।' সিপাইয়ের হাতে কানাইকে ছেড়ে

সুলেমান দৌড়ে যায় সাহেবদের দিকে। সে স্লেভ ওয়্যার-হাউসের লোক, চতুর ও বিচক্ষণ বলে তার খ্যাতি আছে। ব্যাপারটা যেদিকে ঘুরছে তাতে গুরুতর আকার নেবার আশঙ্কা আছে।

আড়াইটের ঘণ্টা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই সাহেবদের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। প্রতিবাদের যে ঢেউ উঠব উঠব করছিল তা ঝিমিয়ে পড়ে। সর্বাগ্রে মেজর ফাউলার দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে আসে। তার পেছনেই চার্লস ম্যাকিনটশ, পদক্ষেপ তার মোটেই দৃঢ় নয়। কাছারিবাড়ি থেকে মন্দিরের চত্বর পর্যন্ত রাস্তায় লম্বা সতরঞ্চি বিছানো, তার মাঝখানে কোথাও কোথাও ঢাকা গাড়াগর্তে পা পড়তে অতি কষ্টে নিজেকে সামলায় তরুণ ইংরেজটি। পেছনে পেছনে ছ-জন বন্দুকধারী সান্ত্রী। তারা জনতা ও সাহেবদের মাঝখানে দশ-বারো হাত দূরে সার দিয়ে দাঁড়ায়।

জনতা এখনো খেয়াল করে নি। চত্বরের একপাশে একটা বাঁশ পোতা হয়েছে কেন। নীচে ফুলের টব। মেজর ফাউলার ধীর পদক্ষেপে সে দিকে এগোয়। তারপর রাজকীয় ভঙ্গিতে পতাকা উত্তোলন করে। যে ইউনিয়ন জ্যাকটা তাদের পানসিতে লাগানো ছিল সেটাই এখন হাওয়ায় উড়তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে ছ-জন সান্ত্রী আকাশের দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ফায়ার করে। বারুদের গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে একটা থমথমে নিস্তব্ধতা নেমে আসে চারপাশে।

'মুন্‌শী!' বিরাট আওয়াজ দেয় ফাউলার।

মুন্‌শী একটা কাঠিতে জড়ানো লম্বা হলুদ কাগজ আস্তে আস্তে খুলে গলা খাঁকারি দিয়ে সুরু করে: মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় রিচার্ডের অসীম করুণায়——।

'লাউডার, লাউডার!' ফাউলার হাঁক পাড়ে।

মুন্‌শী এবার এত জোরে চেঁচাতে থাকে যে তা বোঝা যায় না। তার চেঁচানো শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মেজর ফাউলার তড়াক করে লাফিয়ে উঠে সামনে একটা হাত তুলে বিচারকের ভঙ্গিতে বলে ওঠেন, 'আসামী লক্ষণ দাস জঘন্যতম নরহত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। অদ্য তিন ঘটিকায় এই নবগ্রামে আমিন রামগতি মিত্রের মন্দিরের চত্বরে তাহার ফাঁসি অনুষ্ঠিত হইবে।'

সীটে বসবার আগে চার্লস ম্যাকিনটশের হাতে আর-একখানা কাগজ সে গুঁজে দেয়। রোমান হরফে দু লাইন বাংলা। চার্লস আগেই তা মুখস্থ করেছিল, কিন্তু এখন প্রচুর মদ্যপানের ফলে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'মহামান্য গভর্ণর-

জেনারেল ওয়ারেণ হেস্টিংসের আদেশ অনুসারে আসামীর আত্মীয়স্বজন, তাহার স্ত্রী ও ভ্রাতাকে ক্রীতদাসরূপে কোম্পানি গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানি নিজ হস্তে লইয়াছে।'

প্রথমতঃ অতিরিক্ত মদ্যপান এবং দ্বিতীয়তঃ বাংলা উচ্চারণে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতায় বিকট শোনায় চার্লস ম্যাকিনটশের কথা। মুনশী এবার সাদামাটাভাবে বুঝিয়ে দেয়।

কানাই প্রশ্ন করে, 'রূপীর ফাঁসি হবে? সেদিকে না চেয়ে মুনশী গভর্ণর-জেনারেলের নতুন আদেশ ব্যাখ্যা করে। এই আদেশ অনুযায়ী মুর্শিদাবাদে, নদীয়াতে প্রত্যেক ফাঁসির আসামীর নিকট আত্মীয়স্বজনকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হয়েছে। মুনশী বলে, দেশে আইন ও শৃঙ্খলা যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্যই মহানুভব গভর্ণর-জেনারেলের চেষ্টা। কারণ, শৃঙ্খলায় হয় জাতির অভ্যুদয়। শেষ লাইনটা কবিতা করে বলে মুনশী।

চত্বরের একপাশে নাটমন্দিরের একটা কোণ চিক দিয়ে ঢাকা হয়েছে। রামগতির ছোট বউ মাথায় হীরের ফুল গুঁজে পানের বাটাহাতে দাসীসমেত প্রথম সারিতে আগেভাগে বসেছে। পাশে তার ছোট ছেলে, মায় মেনি বেড়ালটা। সবাই এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের দর্শক হবার জন্যে উদগ্রীব। এক প্রবল আজবের আকর্ষণ সকলের চোখে-মুখে। বড় বউ-এর আসতে দেরি হয়ে গেছে, সংসারের কাজ তুলে নাটমন্দিরে প্রবেশ করে সেও ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসে। 'তোমার গতর এখানে ধরবে না বড়দি', ছোট বউ বললে। ঠাকুরমশাইয়ের তৃতীয়া পত্নী তার সঙ্গে জোট বেঁধেছে। চিকের মুখটা তারাই দখল করে বসেছে। বড় বউ ক্ষুব্ধ গলায় বললে, 'তুই কেবল সব সাধ-আহ্লাদ মেটাবি, আমরা কেউ নই?' ছোট বউ এইমাত্র আর-একখিলি পান মুখে গুঁজে মৌজ করে বসেছে। ইতিমধ্যে সান্ত্রীরা আসামীকে মাটি থেকে টেনে তুলছে, সেদিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চেয়ে ঠাকুরমশাইয়ের তৃতীয়া স্ত্রীকে বললে, 'মালা, তুই একটু চাপ তো এদিকে। আর ঘ্যান ঘ্যান কোরো না বড়দি, একটু দেখতে দাও।' বেড়ালটা সে কোলে তুলে নেয়।

জনতা এতক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে অপেক্ষা করছিল। বিশেষ করে গাদা বন্দুক-গুলো আকাশে গর্জন করে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার এক থমথমে ভাব।

আনমনে শীতল বললে, 'লক্ষণ খালি বলত জোট বাঁধতে।'

'ভগবানের মার ভাই, কিছু করার নেই।'

'তোমার ভগবানের নাম কোরো না। ইংরেজদের ভগবান কথা বলে, আমাদের ভগবান কথা বলে না।'

'নবাবদের ভগবান ?' পাশ থেকে একজন প্রশ্ন করে।

'এখন তো ইংরেজরাই নবাব। যাদের হাতে ক্ষমতা, তারাই নবাব।'

'আর আমরা ?'

'আমরা, গোলাম বাঁদী।'

'সুরথদা, তুমি বল, আমরা লাঠি ধরি।'

'পাগল।' সুরথ তার কাঁচাপাকা দাড়িতে হাত বুলোতে থাকে।

'লক্ষণকে ফাঁসি দেবে, রূপী কানাইকে কোমরে দড়ি দিয়ে গরু-ভেড়ার মতো বিক্রি করবে। এ আমরা সহ্য করব না।'

'সুরথ বললে, 'আসলে আমাদের কেউ নেই। সবাই আছে সাফাইয়ের ধান্দায়। রামগতিকে দ্যাখ, ঠিক লাইন দিয়েছে। সবাই ইংরেজদের পায়ে আছড়ে পড়েছে।'

'লক্ষণ পড়ে নি।'

'লক্ষণ একা।'

'ঐরকম একলা লোকই দুনিয়া পাল্টে দেয়। অভিমন্যু-পালায় দেখো নি, একলা লড়েছিল।'

'একলা লড়ে মরেছিল। একলা লড়লেই মরবি। আমি লক্ষণকে পই পই করে বলেছি। লক্ষণ শোনে নি। আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে। আগুন গায়ে হাত বোলায় না। আমার দুঃখ রূপীকে নিয়ে। কানাইকে নিয়ে।'

'তাদের জন্যে বল, আমরা লাঠি ধরি।' পাশ থেকে একটি উদ্গ্রীব তরুণ মুখের প্রশ্ন। আরো কয়েকটি মুখ তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুরথ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'তোরা আর কাউকে জোগাড় কর, তোদের মোড়ল বানা। আমি পারব না। বুড়ো হয়ে গেছি। অনেক দেখেছি। আর দেখতে চাই না।'

ইতিমধ্যে ফাঁসি-মঞ্চের দুদিকে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে সান্ত্রীরা, ইতিমধ্যে তারা আবার টোটা ভরে নিয়েছে বন্দুকে। সুলেমান ও আরো দুজন পাইকের ওপর ফাঁস দেবার ভার পড়েছে। সুলেমান নিচু হয়ে ভারি পাটাতনখানা তদারক করছে।

একঝাঁক পানকৌড়ি মাথার ওপর দিয়ে উড়তে উড়তে চলে যায়। সেদিকে চেয়ে আধ-ঘুমন্ত চার্লস ম্যাকিনটশ হঠাৎ চোখ খুলে বলে উঠল, 'লুক, হাউ বিউটিফুল।'

'ডোণ্ট বি সিলি! চাপা গর্জন করে ফাউলার।

এমন সময় দুজন সান্ত্রীকে পাশে নিয়ে আসামীকে মঞ্চের সামনে আনা হয়।

মুনশী গলা খাঁকারি দেয়। ইংরেজি আইনের জগতের অন্যতম ন্যাকামি ভাষায় রূপ দেবার জন্যে গলা ঝেড়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে: 'আসামী, তোমার শেষ ইচ্ছা কী?'

লক্ষণের কানে সে ডাক পেঁছয় না। সে যেন ইতিমধ্যেই অন্য জগতের লোক। তার মুখে মৃদু হাসি।

'আস্ক হিম এগেন। আবার বোলো।' ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে ফাউলার হাঁকে।

আবার গলা খাঁকারি দিয়ে মুনশী চিৎকার করে; 'তোমার কী শেষ ইচ্ছা, আসামী?'

'আমার শেষ ইচ্ছা তোমার মুখে মুতি', পরিষ্কার গলায় লক্ষণ বললে।

সামনের সারিতে যারা আসামীর কথা শুনতে পায় তাদের মধ্যে হাসির হিল্লোল ওঠে।

একজন সিপাই হাঁক দেয়, চোপ রও।'

পকেট থেকে সোনালি চেন-আঁটা ঘড়ি দেখে ফাউলার দাঁড়িয়ে ওঠে। হাঁক দেয়, 'সুলেমান।'

সুলেমান ও আর-একজন সান্ত্রী আসামীকে হাত ধরে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করায়। আসামীর হাত পেছনদিকে বাঁধা, কাজেই চট করে ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হয় তার গলায়। সুলেমান ও সান্ত্রী নেমে আসে। দুটো কাঠের খুঁটি দিয়ে আসামীর পায়ের নীচে তক্তাখানা দাঁড় করানো। একসঙ্গে বাঁশের খোঁচা দিয়ে খুঁটিগুলো সরানো হয়, কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তক্তাখানা আধখানা নেমে মাঝপথে একটা খিলে আটকে যায়। আসামী শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ঝুলতে থাকে, কিন্তু সে সম্পূর্ণ জীবন্ত। 'মাই গড্!' মাই গড্!' বলে ফাউলার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠবার আগেই ক্ষিপ্রগতিতে সুলেমান মঞ্চের ওপর উঠে দু হাতে প্রচণ্ড জোরে ফাঁস দিতে থাকে। শেষ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে লক্ষণের জোড়া পায়ের লাথি এসে লাগে সুলেমানের গায় এবং সঙ্গে সঙ্গে খিল খুলে যায়। বিস্ফারিতনেত্র জনতার সামনে লক্ষণ দাস ফাঁসিতে ঝুলতে থাকে।

৭

বিকেল থেকে বাদলা হাওয়া। মাঝে মাঝে এক আধ ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে। বড় দীঘি পেরিয়ে আড়ং। সাহেবরা দলবল নিয়ে সেদিকে রওনা দেয়। পুকুরের গা ঘেঁষে ঘন তালবন। হাঁসের ডাক আসে। ঘাস খেতে খেতে গরুগুলো মাথা তুলে আগন্তুকদের লক্ষ্য করে। পুকুরপাড় পেরলেই সারি সারি তাঁতিদের বাড়ি নীরব, কোনো আওয়াজ নেই। বেশির ভাগ বাড়িব ঝাঁপ নামানো। নীল শাড়িপরা একটা কমবয়সী বউ সাহেবদের দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়েই ঘরের মধ্যে ঢোকে। দুটো নেড়ি কুত্তাও সঙ্গ নেয়।

রামগতিকে ডেকে ফাউলার বললে, 'তোমাদের নতুন এজেণ্ট চার্লস ম্যাকিনটশ্।'

রামগতি হাত তুলে নমস্কার করলে।

আড়ং এ কয়েকজন বৃদ্ধ তাঁতি বসে আছে। কেউ কেউ তামাক খাচ্ছিল। সাহেবদের দেখে হুঁকো নামিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসে। তাদের চোখে আতঙ্ক। আড়ং-এ কাপড়ের পেটি বেশি নেই। প্রশ্ন করায় এক বৃদ্ধ বললে, 'কাজ করতে করতে আর চোখে দেখতে পাইনা সাহেব, তবু অন্ন জোটাতে পারি না। এমন কাজ করে কী লাভ সাহেব ?'

ফাউলার মুন্শীর দিকে চেয়ে বললে, 'হোয়াট, হোয়াট ?' ধীরে বললে সে বাংলা বেশ বোঝে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে একটু জড়িয়ে বললে ধরতে পারে না। ফাউলার বললে, 'বল, ওদের আরো শতকরা বিশ টাকা কমে মাল ছাড়তে হবে, নইলে আমরা কিনব না।'

'সাহেব কী বলছে, শুনেছ ? গলা খাঁকারি দিয়ে মুন্শী পুনরাবৃত্তি করে। এবার বৃদ্ধ লোকগুলোর চোখে, মুখে আতঙ্ক আরো প্রকট। একজন বললে, 'আমরা জীবনটা পার করে দিলাম সাহেব। আমাদের ছেলেমেয়েরা কী খাবে ? কী করে চলবে ?'

সাহেব স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে, 'ঠিক চলবে। তোমরা সব বদমাশ আছো, খাজনা দেবে না, ট্যাক্স দেবে না। এ-সব চলবে না।'

'ট্যাক্স তো আগেই চাপিয়েছ সাহেব। দশ টাকার মাল আট টাকায় দিচ্ছি।'

'দশ টাকার মাল পাঁচ টাকায় দেবে।'

'অর্ধেক দামে? আমরা হাটে বেচব।' ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বললে।
সরকার চেঁচিয়ে উঠল, 'কে রে? এখনো তোদের শিক্ষা হয়নি?'
ফাউলার রামগতিকে বললে, 'ডিরেক্টাররা আমাদের জানিয়েছে কলে অনেক সস্তায় ক্যালিকো তৈরি হচ্ছে ইংল্যাণ্ডে। আর কিছুকাল পরে জাহাজে জাহাজে মাল আসবে। তখন তোমাদের গাঁয়ের হাটে আমাদের মাল ছেয়ে যাবে।
পেছন থেকে একজন বললে, 'অসম্ভব! আমরা যে দামে দিচ্ছি কেউ তা দিতে পারবে না। এত কষ্ট কেউ সহ্য করবে না সাহেব।'
'তোমাদের একটা ওয়ার্নিং দিয়ে গেলাম। হয়ত দু-তিন বছর পর তোমাদের আর দরকার হবে না কোম্পানির। তখন কী করবে?'
ভিড়টা বেড়ে যাচ্ছে। যারা বন্ধ ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসেছে। রামগতির কিরকম একটা আসোয়াস্তি হয়। সাহেবদের এই গ্রামের ভেতরে চলে আসাটা তার পছন্দ হয়নি। সে লক্ষ্য করে, কারুর কারুর মুখে হতাশা কেমন একটা ঘেন্নায় পরিণত। সাহেবদের সম্পর্কে আর কৌতূহল নেই। গ্রামাঞ্চলে লোকে যেমন চোর, ডাকাত; ছ্যাঁচড়কে দেখে তেমনি চাহনি দেয় কেউ কেউ।
ফাউলারের দিকে চেয়ে নিচু গলায় রামগতি বললে, 'এখন ফিরি আমরা। আমি সব বুঝিয়ে দেব। আপনারা কিছু ভাববেন না। আপনাদের জন্যে চায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। সবাই অপেক্ষা করছে। চলুন।'
ফাউলারও বুঝলে। ঠিক এভাবে খোলাখুলি কোম্পানির পলিসি এই-সব নিরন্ন নেটিভদের সামনে না তুললেই ভালো ছিল।
'তুমি ঠিক বলেছ, রামগতি। চা-টা পেলে ভালো জমত।' বলেই সে দাওয়া থেকে নেমে আসে এবং যে ঘৃণা আস্তে আস্তে জমছিল কালো মেঘের মতো, তা আবার হাওয়ায় মিলিয়ে যায়।
ম্যাকিনটশ আর-একবার মাটির চাপড়ায় হোঁচট খেল।
ক্রুদ্ধ হয়ে ফাউলার বললে, 'এর পর তোমার একা একা আসতে হবে। টাকা রোজগার করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়।'
ম্যাকিনটশ লজ্জা পেয়ে তার টলমলে পা সামলাবার চেষ্টা করে, কিন্তু আবার হোঁচট খায়।

'সরি, বিল। জায়গাটা এখন অদ্ভুত। অথচ কিরকম একটা মায়াটে ভাব। হিন্দু হলে বলতাম, হয়ত আগের জন্মে আমি এই নবগ্রামে ছিলাম।'

'আমরা এখানে রাজ্যশাসন করতে এসেছি, চার্লস। তোমার এখনো সেই মেজাজটা আসেনি।'

'সেটা বুঝতে পারছি।'

'তুমি তা হলে ফিরে যাও ইংল্যাণ্ডে।'

'অসম্ভব! ফিরে গিয়ে আবার সেই টাউনশেণ্ড কোম্পানির কেরানি। ভাবতেই আমার গায়ে জ্বর আসে।'

'তুমি ভেব না, তোমাকে আমরা এখানে দুধের চামচে দিয়ে দুধ খাওয়াব। আমাদের অন্য কাজ আছে।'

'সরি, বিল। আমাকে আর-একটু সময় দাও। আমি একটু গেঁতো টাইপের। তবে কাজগুলো একবার ঠিক বুঝে নিলে অসুবিধে হবে না।'

'দেখা যাক', ফাউলার গম্ভীরভাবে বললে।

কাছারিবাড়ি পেঁছিতে না পেঁছিতেই চড়বড় করে জল নামে। এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়া দেয়।

'এগেন দ্যাট বিস্টলি ওয়েদার!' ফাউলার বললে।

চার্লস বললে, 'চমৎকার তোমার টি-সেট, রামগতি। এগুলো কোথা থেকে পেলে?'

'আমার ব্যানিয়ান মামাশ্বশুর স্যার। চায়না ট্রেডে আছে স্যার। নতুন সেট, আগে আর কেউ খায়নি। আপনাদের জন্যেই আনা হয়েছে।'

ফাউলারের গোঁফের পাশ দিয়ে হালকা হাসি ফুটে ওঠে।

হঠাৎ হাতজোড় করে রামগতি বললে, 'আমরা সাহেব পুরুষানুক্রমে দেওয়ানির কাজ করে আসছি। নবাবরা আমাদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতেন।'

'নবাবদের কথা বলবেন না। তারা প্রজাদের পীড়ন করত, নানারকম কর বসাত।'

'গোস্তাকি মাফ করবেন সাহেব। তাদের সময় কর আরো কম ছিল। তাঁতিরা আরো সুখে ছিল।'

ফাউলারের মুখ লাল হয়ে ওঠে। গোঁফ টানতে থাকে। ঘরের মধ্যে একটা থমথমে পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মাঝে মাঝে ঠাণ্ডা দমকা হাওয়ায়ও তা কাটে না।

'কোম্পানি সব পাল্টে দিতে চায়।' তারপর বাংলা ছেড়ে ইংরেজিতে বলেন, 'উই ওয়াণ্ট টু চেঞ্জ ইট লক স্টক অ্যাণ্ড ব্যারেল।' বলেই অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা উৎকণ্ঠিত মুন্‌শীর দিকে তাকালে। মুন্‌শী বললে, 'সাহেব বলছেন কোম্পানি

তালা পাল্টে দেবে।'

রামগতি হেসে ওঠে।

ফাউলার রেগে বললে, 'ইউ'আর ইনকমপিটেন্ট, মুন্‌শী। তোমার চেয়ে আমি আরো ভালো বাংলা বলতে পারি।'

রামগতি বললে, 'আমি সাহেব বুঝেছি, আপনি কি বলতে চাইছেন। কোম্পানি সব-কিছু ওলট-পালট করে দিতে চায়।'

'ঠিক।'

'সেইজন্যে ফৌজদার আমিন—এদের আর দরকার নেই।'

'আমরা নতুন শাসনব্যবস্থা, নতুন শিক্ষা, নতুন সভ্যতা এদেশে আনব,' গভর্ণর-জেনারেলের একটা ভাষণ উদ্‌ধৃত করে ফাউলার বললে।

'সবই ঠিক, কিন্তু কাছারিতে যদি জমিজমার কাগজপত্তরই না থাকে, তা হলে কার ভিত্তিতে আপনি শাসন করবেন? সেটা তো ন্যায়বিচার হবে না।'

'একজন ইংরেজকে ন্যায়বিচারের কথা শিখিও না। ইংল্যান্ড ন্যায়বিচারের দেশ।'

রামগতি গলায় অনুনয় ঢেলে বললে, 'আজ্ঞে, সেইজন্যেই তো বলছি।'

চায়ের কাপে চুমুক দিতেই আরামে সাহেবের চোখ বুজে আসে। 'লাভলি টি।' নিচু গলায় বললে। তারপর তাকিয়াতে শরীরটা মচকে দুমড়ে আরাম করে বসে বললে, 'আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি, রামগতি, কিন্তু আমাদের টাকা বড্ড দরকার।'

তারপর রামগতির চোখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে, 'আর সে টাকা যেভাবেই আসুক, আসতে দাও।...তবে তোমার কথা আমার মনে থাকবে। আমাদের ইন্টারেস্ট যদি তোমার মাথায় থাকে, তা হলে তোমার ইন্টারেস্টও আমরা দেখব।'

হুঁকোবরদার গড়গড়ার নল এগিয়ে দেয় সাহেবদের মুখে।

ফাউলার মুখ থেকে নল নামিয়ে বললে, 'তাঁতিদের উসকিও না আমাদের বিরুদ্ধে।'

সাহেবের বাংলায় দখল দেখে বিস্মিত হয়ে রামগতি বললে, 'আজ্ঞে।'

'আমি তো বলেছি আগে, মুন্‌শীর চেয়ে আমি ভালো বাংলা বলতে পারি। পাবলিকলি বলি না, সম্ভ্রম থাকবে না।

'আজ্ঞে।'

নলটা শ্ন্যে তুলে ফাউলার বললে, 'লক্ষ্মণ দাস আরো অনেক আছে তাঁতিদের মধ্যে। তারা যদি একসঙ্গে লাঠি ধরে, তা হলে আমাদের লোকজনও যেমন মরবে, তোমাদেরও খতম করবে।'
আজ্ঞে', রামগতি অভিভূত গলায় বললে।

কৃষ্ণকীর্তনের কোনো কোনো অংশে কানাই বড় বিব্রতবোধ করে। দেহ নিয়ে এই মাতামাতি সে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। যখন কৃষ্ণ রাধাকে সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা কোনো কারচুপি না করেই বলতে থাকে তখন ভাষা থেকে সুরের দিকে নজর দেয় কানাই, ভাবে খোল-করতাল আরো জোরে বাজুক, এই-সব বেয়াড়া চিন্তাগুলো চাপা পড়ুক। ঘুমন্ত রূপীর দিকে চেয়ে ভাবে, রূপীকে সে ভালো-বাসে, কিন্তু কই এরকম ভাবনা তো তার মনে কখনো খেলেনি।
তার চেয়ে রামায়ণ গান ভালো। সীতাকে হারিয়ে রামের কান্নাকাটি, বনে বনে ঘুরে লতাপাতা, পশু-পাখির কাছে সীতার খবর চাওয়া তার আরো মানবিক লাগে। রাম লড়াই করে ঠিকই, কিন্তু করতে হয় বলে করে, কোনো হাঁইফাঁই নেই। মহাভারত আবার ঠিক এই কারণেই তাকে বিহ্বল করে। মহাভারতের লোকজনগুলো ঠিক তার দাদার মতো, লড়াই করবার জন্যে এক পা এগিয়ে আছে। দাদার ফাঁসি-মঞ্চে ওঠার পর থেকে সে চোখ বুজে ছিল। চার পাশ থেকে একটা আতঙ্কিত কোলাহল কানে গিয়েছিল, কিন্তু সে চোখ খোলেনি, যখন খুলল, তখন দাদার দেহ ভারি চাদর দিয়ে ঢাকা।
মুড়িওয়ালির দশ বছরের ছেলে অমৃত। তারও কোমরে দড়ি। কানাইয়ের গা ঘেঁষে এসে বসলে। 'আমাদেরও কি কাল ফাঁসি দেবে?'
'না, আমাদের কলকাতায় নিয়ে যাবে।'
'সে দেশটা কেমন গো?'
'অনেক গাড়ি ঘোড়া, লোকজন, বাবুদের বাড়ি।'
অমৃত বললে, 'আমি যাব না, আমি তো কোনো দোষ করিনি।'
'তুই বিক্রি হয়ে গেছিস রে। আমিও বিক্রি হয়ে গেছি, রূপীও বিক্রি হয়ে গেছে।'
হাটে ছাগল বিক্রি স্মরণ করে বালকটি বললে, 'আমাদের কি কাটবে?'
'মানুষের মাংস সাহেবরা খায় না।'
অমৃত হঠাৎ কাঁদতে আরম্ভ করে। কান্না থামিয়ে বললে, 'আমার বড্ড ভয় করছে কানাইদা। লক্ষ্মণদাকে কিরকম গলা টিপে মারল। আমাদেরও মারবে।'

অমৃত আবার কান্না সুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে। বাদলা হাওয়া দিচ্ছে। লম্ফের আলোটা ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আবার দপ দপ করে জ্বলে ওঠে। গত রাতের মতো আজ রাতেও ধেড়ে ইঁদুরগলো খেলা করে ঘরময়। রূপীর গায়ের ওপর দিয়ে দৌড় মারে, কিন্তু রূপী অঘোরে ঘুমোয়।

এতক্ষণ বাইরে জল চলছিল। এবার আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসে এবং জানলায় নদীর উঁচু পাড়ে শ্মশানের আলো দেখা দেয়। সেই অন্ধকারে আলোর দিকে চেয়ে কড়াবাঁধা হাত-দুখানা কপালে ঠেকায় কানাই।

তখনো ভোরের আলো ফোটেনি, পাখির ডাক সুরু হয়নি, তবে অন্ধকার ফিকে হয়ে আসায় চারিদিক মায়াময়। রূপীর ঘুম ভাঙে এই ব্রাহ্ম-মুহূর্তে। সারারাত নাচানাচি করার পর ইঁদুরগুলো গর্তে ফিরে গেছে। তিনটে মাল-সায় মাড়-ভাত রেখে গিয়েছিল রামগতির মুনিষ। আধ খাওয়া ভাত ছিটিয়েছে ইঁদুরগুলো এদিক-ওদিক। রূপী শুনেছে, ক্রীতদাসদের একবেলা আটার গোলা খেতে দেওয়া হয়। কড়া-আঁটা নিজের হাতদুটোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দেয়; মৃত্যু তো নিজের হাতেই। যদি এমন-ওমন হয়, তা হলে গলায় ফাঁস দিয়ে সেও ঝুলে পড়বে। মরে যাওয়ার জন্মগত অধিকার তাকে বাঁচতে সাহস দেয়। এমন সময় কানাই পাশ ফিরে চিৎ হয়ে শোয়। অনেকক্ষণ ধরে আবছা অন্ধকারে চেয়ে থাকে রূপী সেই প্রিয় মুখখানার দিকে। মনে পড়ে তারা একইসঙ্গে সারা দুপুর বটের পাতার আঠা দিয়ে বুলবুলি ধরেছে, যাত্রার পালাগানে সমস্ত শব্দের মধ্যে কানাইয়ের বাঁশির আওয়াজ শুনবার জন্যে কান পেতে থেকেছে। গত দুদিনে তার জীবনের ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। নিজেকে এক-একবার তার দোষী বলেও মনে হয়। গত রাতে সে স্বামীর সান্নিধ্য চেয়েছিল, যে স্বামীর সঙ্গে সে এখনো সহবাস করেনি। তার স্বামী খুব ভালো, সবাইকে সাহস জোগায়। সবাইয়ের জন্যে সে করে। তার কথা মেনে না নিলেও তাঁতিপাড়ায় আর পাঁচটা লোক তাকে শ্রদ্ধা করে। এই লোকটা তার জীবন থেকে হঠাৎ চলে যাচ্ছে, সেইজন্যে সে তার প্রতি আকর্ষণবোধ করেছিল, কিন্তু কানাইয়ের প্রিয় মুখখানার দিকে চেয়ে সে বোঝে, এ মুখখানার আকর্ষণ অন্য জাতের। তার ক্রীতদাসত্বে যদি এই মুখখানা তার পাশে থাকে, তা হলে তার কোনো ভয় নেই, তা হলে সে সমস্ত নির্যাতন সইতে পারবে। আটার গোলা খেয়েও থাকতে পারবে। কড়া-আঁটা হাতে ঘুমন্ত ছেলেটির চুল ধরে টানতে টানতে ডাকে, 'এই পাগ্লা, পাগ্লা।'

কানাই চোখ খোলে। ঘরের মধ্যে অন্ধকার আরো ফিকে হয়ে এসেছে। রূপীর বাদামী ছুঁচলো কচি মুখখানার দিকে চেয়ে কানাই মৃদু হাসে।

রূপী তার চুল টানতে টানতে বললে, 'আমাকে ছেড়ে যাবি না বল।'

কানাই উঠবার চেষ্টা করলে রূপী তাকে জোর করে শুইয়ে রাখে। 'বল, আগে বল।'

কানাই হেসে বললে, 'কি করে বলব?'

'কোথায় যাবি? যাত্রাগানে?'

'আমি পালাব।

'আমাকে নিয়ে যাবি। বল, আমাকে নিয়ে যাবি!' রূপী পড় পড় করে কানাইয়ের চুল টানতে থাকে।

'লাগছে, লাগছে…নিয়ে যাব। নিয়ে যাব।'

রূপী তার ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'বল, আমাকে ভালোবাসিস বল।'

'ছাড় আমাকে ছাড়, ভাগ', কানাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে।

রূপী কানাইকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করে, হাতকড়া-লাগানো হাত-দুখানা মাথা গলিয়ে আলগোছে তার পিঠের ওপর রাখে। কানাই কিছু বলে না। তারা দুজনেই জানে না, তাদের দুজনার প্রতি দুজনের আকর্ষণের কী নাম। তারা দুজনেই ছিল খেলার সঙ্গী, এখন এক বিপজ্জনক ভবিষ্যতের অন্ধকার, দুজনে একই সঙ্গে পাড়ি দিতে চলেছে। এক হ্যাঁচকায় তারা অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন। তাদের এই নবগ্রামের ষোল বছরের জীবন এক ফুৎকারে উড়ে গেছে। সামনের ষোলটা বছর কেন, ষোলটা দিন কেমন যাবে তারা জানে না। হয়ত তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং আসন্ন বিচ্ছেদ তাদের দুজনকে এক টানে আরো কাছে নিয়ে আসে।

কানাই রূপীর আলিঙ্গনে বন্ধ থেকে বললে, 'দাদাটাকে মেরে ফেললে।'

'ও নিয়ে ভাবিস নে কানাই। ও নিয়ে আমি আর ভাবি না।'

অমৃত হঠাৎ ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হলুদ পাখি, হলুদ পাখি, ঐ যে দূরে বোকা!' আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

এখনো তারা জন্তুতে পরিণত হয়নি। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেণ হেস্টিংসের টাকা বানানোর কলে এখনো তাদের রক্ত, মাংস, মন তালগোল পাকিয়ে যায় নি। এখনো তারা ভালোবাসার কথা বলে, হলুদ পাখির স্বপ্ন দেখে। এই ভারতবর্ষের মায়াময় গ্রামের মাটির গন্ধ এখনো তাদের গায়ে। মৃত্যু তারা বারে

বারে দেখেছে, কিন্তু জীবন্মৃত অবস্থা তারা দেখেনি।

'রূপী, এর থেকে যদি আমি বাঁদর হয়ে জন্মাতাম, তা হলেও ভালো ছিল,' কানাই বললে।

রূপী তাকে আদর করে বললে, 'তুই তো এখনো বাঁদর।'

সেই ভোরে রামগতির শয়নকক্ষে হুলুস্থুল। রামগতির মেজাজটা ভালো ছিল। তার ধারণা, সাহেব পটেছে। তাদের পড়ন্ত অবস্থা এবার ফিরবে। আবার তার বাপ, ঠাকুর্দাদা যেরকম দোর্দণ্ডপ্রতাপে শাসন চালিয়েছেন, তেমনি প্রতাপ ফিরে আসবে। এইরকম মানসিক অবস্থা যখন তুঙ্গে, তখন রামগতি তার নিজস্ব ঘরে গিয়ে শুয়ে গভীর আরামে ঘুমিয়ে পড়ে এবং অনেক সময় যা হয়, ভোরে শরীরটা ঝরঝরে লাগায় ছোট বউয়ের শরীরখানার কথা মনে পড়ে যায়। ছোট বউ অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমোয়নি, লক্ষ্মণ দাসের ফাঁসির শেষ পর্বটার হিংস্রতা তাকে অভিভূত করেছিল। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করে সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল, এই অবস্থায় রামগতি উৎসাহের আধিক্যে স্ত্রীর কোমর ধরে ঝাঁকি দেয়। দিক্‌বিদিক্‌ চিন্তা না করে ছোট বউ লাথি ঝাড়লে এবং উঃ শব্দ করে গড়িয়ে পড়ল মেঝেতে রামগতি। প্রচণ্ড ব্যথায় অবসন্ন বোধ করে রামগতি। বোধ হয় কনুইয়ের হাড় ভেঙে গেছে। নিঃশব্দে মচকানো হাতকে মালিশ করতে থাকে। খুব অল্প অল্প নাক ডাকে ছোট বউর। ভোরের পাখির ডাকও সুরু হয়।

চতুর্থ পর্ব

গঙ্গার ওপর এই রঙ-জ্বলা ইঁট-বার করা জীর্ণ কুঠিবাড়িখানা দেখে ধারণা করা মুশকিল সত্তর-আশি বছর আগের চেহারা। বয়েল অ্যান্ড পিটার্স তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্লেভ-ট্রেডে দিগ্বিজয়ী। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে শয়ে শয়ে গোলাম, বাঁদী চালান হত বোর্নিও, সুমাত্রা, জাভা, ডাচ ফরাসি, ইংরেজ উপনিবেশে। তারপর বয়েল পিটার্সের বউ নিয়ে ভাগল উত্তর-আফ্রিকার এক ফরাসি উপনিবেশে, সেখান থেকে আর ফিরল না। তখন থেকেই ক্রমাগত হাত বদলাচ্ছে বাড়িখানা। পর্তুগীজ মাল্লাদের জন্যে 'কাফে মাদ্রিদ' বলে যে পানভোজনের রেস্তোরাঁ তৈরি হয়েছিল তার একটা টিনের প্ল্যাকার্ড এখনো বৃষ্টি-রোদ্দুরে পথচারীদের আহ্বান করে। মাঝখানে একেবারে ডুবে গিয়েছিল। হায়দার আলির লড়াইয়ের সময় থেকেই হঠাৎ দাক্ষিণাত্য-পথে তেলেঙ্গি গোলাম আসা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার বছর দুই হল ব্যবসাটা একটু একটু করে জাঁকিয়ে উঠেছে। এখন বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল থেকে সাপ্লাইয়ের উন্নতি হয়েছে যথেষ্ট।

এই সমস্ত ইতিবৃত্তের একমাত্র সাক্ষী জি. বালথাজারের পুত্র পি. বালথাজার। জি, বালথাজার ছিলেন বয়েল অ্যান্ড পিটার্সের ইনল্যান্ড ট্রেডের ম্যানেজার। তাঁর দালালরা ছিল অসমসাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ; প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্যে একবার তারা এক জমিদার-পত্নীকেও তুলে এনেছিল। জীবন সম্পর্কে আগ্রহের অন্ত ছিল না জি. বালথাজারের। পটাপট স্ত্রী মারা গিয়েছে এবং পটাপট তিনি বিয়ে করেছেন। স্লেভ-ট্রেডের এই নমস্য লোকটির শেষ জীবন অবশ্য সুখের হয়নি। ঋণের দায়ে কুঠিসংলগ্ন তাঁর দোতলা বাড়ি যা এখন গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত এবং নজন গোলাম ও উনচল্লিশজন বাঁদী ও কিছু অলংকার এক ফরাসি ভদ্রলোককে দিয়ে তিনি এই বাড়িতেই দেহ রাখেন। উনুনে শিক যতক্ষণ গরম হয়, পি. বালথাজার তখন মাঝে মাঝে সেই-সব দিনগুলোর কথা ভাবে।

এই ভাবনার মাঝখানে অমৃতের প্রবেশ। পেছনে চ্যাটার্টন কোম্পানির দুই পাইক। সদ্য নেড়া হওয়ায় তাকে চেনা যায় না। হাত-দুখানা পিছমোড়া

করে বাঁধা। বাঁ হাতখানা ফোলা, চুন-হলুদ লাগানো। গতকাল বাঁধা অবস্থাতেই সে কনুই দিয়ে গুঁতো মারতে লাল লোহার শিক চিমটে থেকে ফসকে বালথাজারের পায়ে পড়ে যায়। অকারণ নিষ্ঠুরতা বালথাজারের পছন্দ না, কারণ, অকারণ নিষ্ঠুরতায় কাজের ব্যাঘাত হয়, কিন্তু ছ্যাঁকা লেগে পায়ের বুড়ো আঙুল পুড়ে যাওয়ায় ছেলেটার হাত মটকে দিতে হয়। একদিন চুন-হলুদ লাগিয়ে তাকে আবার খাড়া করতে হবে। তার ফলে এই ব্যাচটা আরো দুদিন আটকে থাকবে। রুটিন অনুযায়ী লোকটা কাজ করতে অভ্যস্ত। তার বাবা রুটিন মানত না, সেইজন্যে এত বৈভব সত্ত্বেও তাঁর শেষ জীবনে এত দুঃখ। সে রুটিন মানে যাতে শেষ জীবনে বাপের অবস্থায় পড়তে না হয়। ইতিমধ্যেই হাজার তিনেক টাকার কোম্পানির কাগজ কিনে ফেলেছে। মরে গেলে সে একটা জাঁকালো ফিউনারাল চায়, লম্বা শোকযাত্রা হবে, চুঁচড়োয় ডাচদের বাগান থেকে ফুলের স্তবক আসবে, কয়েরের ছেলেরা গম্ভীর পোশাকে গান গাইবে গীর্জায়। জীবনটা সে একরকম প্রায় কাটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মৃত্যুটা সে আর-একভাবে চায়।

'আমাকে মেরে ফেলো না, মেরে ফেলো না। তোমরা কে আছ আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!' অমৃত ঢুকেই চিৎকার সুরু করে।

'তোর তো রস এখনো আছে দেখছি। আর একটা কনুই মটকে ভাঙি, নিয়ে আয়।'

কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো আঙুলগুলো বাড়ায় বালথাজার। চিমটে ধরে ধরে তার আঙুলগুলোর চেহারা অনেকটা ঐরকম।

অমৃত চেঁচাতে থাকে, 'আমাকে বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। তোমার আমি চাকর হয়ে থাকব, আমায় মেরো না।'

'ঝামেলা পাকাস না', চিমটে দিয়ে গনগনে লাল শিক টেনে নিতে নিতে বালথাজার বললে। বাবার সঙ্গে ইনল্যান্ড ট্রেডে থাকতে থাকতে সে বাংলা কথ্যভাষায় অসামান্য দখল অর্জন করেছে। দখুনে লোকগুলোকে সে অবিকল নকল করে, এমন-কি ছটকে ছুটকে ঢাকা অঞ্চল থেকে এক-আধটা সাপ্লাই এলে সে তাদের ঢঙে তাদের সঙ্গে কথা বলে। হঠাৎ সে গান জুড়ে দেয়, নবাবপুরের হাটে সে যে গান শুনেছিল, তার এক লাইন :

'ধুলোখেলা খেলব না মা
হরির নামে মন মেতেছে'

এবং 'মেতেছে' শেষ না হতেই তার ক্ষিপ্র আঙুলে চিমটে নাচিয়ে গনগনে লাল শিকে ঠিক অমৃতের বুকের মাঝখানে ছ্যাঁকা দেয় এবং পরমুহূর্তেই দুই বাহুতে দুটো ছ্যাঁকা। সঙ্গে সঙ্গে তুলিতে একটা নীল কালি লাগায় ক্ষতস্থানে।

আতঙ্কে চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবার ডুকরে ওঠে অমৃত। তারপর ফোঁপাতে থাকে।

'কিবে, মরে গেছিস, না বেঁচে আছিস?'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে, অমৃত বললে, 'সব শালা, সব চোর!'

উনুনে আবার শিক গরম করতে দিয়ে বালথাজার গান ধরে,

ধুলোখেলা খেলব না মা
হরির নামে মন মেতেছে।

তারপর হিন্দুগানে অরুচি লাগে। খ্রীস্টীয় ধর্মসংগীত গাইতে গাইতে 'হালেলুয়া, হালেলুয়া' বলে চেঁচাতে থাকে এবং তখন চুঁচড়োয় ওলন্দাজদের গির্জার ছবিখানা ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। সে ধর্মপ্রাণ, রোজ রবিবার এখান থেকে ছ মাইল হেঁটে পোনিতে চেপে চুঁচড়োয় যায় প্রার্থনাসভায় যোগ দিতে এবং সৎভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সে রোজগার করেছে। ছ্যাঁকা দেবার কাজে কলকাতা, খিদিরপুর, হুগলি, শ্রীরামপুরে তার মতো দ্বিতীয় কারিগর নেই। বালথাজার নিজেকে শিল্পী মনে করে। তার ছ্যাঁকার দাগেও আর্ট আছে, ঠিক যেন দেড় ইঞ্চি, দ্বাদশীর চাঁদ, গোলাম আর বাঁদীদের বুকে, বাহুতে সেই আর্টিস্টিক ছাপ অন্যান্য ছ্যাঁকার দাগ থেকে আলাদা। অন্য কারিগরের দাগ দাগড়া দাগড়া ক্ষত, কিন্তু বালথাজারের ছ্যাঁকা দেওয়া ক্ষত যেন ছবি।

বালথাজার গুন গুন করে গাইছিল। এমন সময় রূপীকে নিয়ে পাইকরা ঢোকে। সেদিকে অবাক হয়ে চেয়ে বালথাজার বললে, 'লেড়কা না লেড়কি?'

বস্তুতঃ রূপীর চেহারায় কোনো স্ত্রীলিঙ্গের ছাপ নেই। চাঁছা মাথায় সরু ছুঁচলো মুখখানা আরো প্রকট, বুকে অতি সামান্য তুঙ্গতা, সমস্ত চেহারার মধ্যে তার জ্বলজ্বলে দুখানা চোখ নজরে পড়ে। প্রায় অশরীরী লাগে তার উপস্থিতি। গত সাতদিনের অনাহার-অনিদ্রায় তার শরীরখানা আরো কাঠি পাকিয়েছে।

স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে চ্যাটার্টন কোম্পানির চটের মতো মোটা খসখসে সাদার ওপর নীল ডোরাকাটা উর্দিতে তাকে আরো অদ্ভুত দেখায়। যেন আজব

কাকতাড়ুয়া অথবা তার শরীরের কাঠিন্যে এবং চোখের অদ্ভুত দীপ্তিতে কোনো নারীমূর্তির অ্যাবস্ট্রাক্ট পেন্টিং। তার ঝলঝলে আলখাল্লা তুলে নেওয়ায় পর তার কচি দেহখানা করুণ দেখায়, এমন স্পর্শকাতর দীঘল মেহগিনি ত্বক যে, বালথাজারের মনে অজ্ঞাতসারে চুঁচড়োর গির্জায় রঙিন কাঁচে এক সন্তের মূর্তি ভেসে ওঠে।

মেরীমাতার নাম জপ করতে করতে বালথাজার বাঁদীর বুকে ছ্যাঁকা দেয়, কিন্তু তার কোন সাড়া নেই। সেই জ্বলজ্বলে চোখ দুটো সামনের দিকে খোলা জানলা পেরিয়ে গঙ্গার ধারে নারকেলকুঞ্জের ওপর নিবদ্ধ।

'কেয়া, পাগ্‌লী হ্যায় ?' বালথাজার সভয়ে প্রশ্ন করে।

আলখাল্লা তার মাথায় গলবার আগে সেই স্তব্ধ মূর্তির দিকে এক নজর তাকায় পাইক। তারপর তার ফুটন্ত কচি স্তনে আঙুলের টোকা দিয়ে যেন তার সম্বিৎ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে। 'হেই পাগ্‌লী। হেই পাগ্‌লী!'

নিঃস্পন্দ রূপী তেমনি একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

আজকাল জব স্যাটিসফ্যাকশান কথাটা বেশ চালু, অর্থাৎ টাকাই তো সব নয়. মানুষের মন আছে ইত্যাদি; কিন্তু বালথাজারের ক্ষেত্রে এই কাজে সন্তুষ্টির কোনো ঘাটতি হয়নি এবং তার পারদর্শিতার জন্যে তার পারিশ্রমিকও অন্যান্য কারিগর থেকে বেশি। প্রতিটি স্লেভ ছ্যাঁকা দিতে এক আনা নেয়। প্রায় ডবল মজুরিতে কাজ করে, কিন্তু চ্যাটার্টন কোম্পানির সে সেরা কারিগর। তবে কথনো কখনো, ঠিক যেমন এই মুহূর্তে, তার মনটা উদাস লাগে। আরো হাজার দু এক টাকার কোম্পানির কাগজ কিনে অবসর নিলে কি রকম হয়, এই-রকম সাময়িক দুর্বলতা তাকে পেয়ে বসে। অবশ্য কানাই ঢুকতে না ঢুকতেই তার আত্মজিজ্ঞাসায় ছেদ পড়ল।

'ব্যাটা খুব লায়েক হয়েছে', কানাইকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে।

কানাই টলছিল। ছ্যাঁকা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে চিৎকার করে পড়ে যায়।

'কেয়া সরমকা বাৎ। এ মরদ নেই, আওরৎ।'

কানাইয়ের জ্ঞান আসে দেরিতে। তখন বিকেল হয় হয়। আসলে ভয়ে নয়, প্রবল দুর্বলতায় সে জ্ঞান হারিয়েছিল। ষোল ফুট বাই বাইশ ফুট বড় ঘরখানা থিক থিক করছে মানুষ, ছেলে, বুড়ো, স্ত্রীলোক মাঝবয়সী, কিছু হিন্দুস্থানি, কিছু তেলেঙ্গি, কিছু বঙ্গদেশীয়, বলতে কি সারা ভারতবর্ষ উঠে এসেছে এই নবাব-

পুরের বন্দীশালায় এবং যে প্রবল মনুষ্য-সভ্যতার ওপর আঘাতে কানাই গত তিনদিনই খেতে পারেনি, সে আঘাত তো অনেক দেশেরই বন্দীশালায় আজও চালু, অর্থাৎ একই ঘরের এক কোণে জনা তিরিশ-পঁয়ত্রিশ পুরুষ-রমণীর পায়খানা-পেচ্ছাবের ব্যবস্থা। ঘরের কোণায় ড্রেণ এবং সেই ড্রেণ ভর্তি। ঘরের আর-এক কোণে যখন সারি সারি ফ্যান-ভাতের মালসা সাজিয়ে দেওয়া হল, তখন খিদের জ্বালায় রুপী, অমৃত অন্যান্য গোলাম-বাঁদীদের সঙ্গে মিশে সশব্দে খেয়ে নিল, কিন্তু কানাই ফ্যানভাত ছোঁয়নি। আলাদা করে নিয়েছিল, জিভ যখন কাজ করছে, তখন তাদের নাক কাজ করছে না, কিন্তু কানাই সব সময় চাপা গন্ধ পায়। সেই বোঁটকা গন্ধ ঘুমের মধ্যেও তাকে তাড়া করে বেড়ায়। সামনে অনিদ্রা আর অনাহারে সে প্রবল অসুস্থ।

বিকেলের আলোয় চোখ মেলে কানাই বললে, 'রুপী, আমি আর বাঁচব না।'

রুপী তার মাথায় হাত বোলায়। ঘরের কোণে জালাভর্তি গঙ্গাজল। একটা ভাঁড়ে করে জল নিয়ে রুপী তাকে ডাকে। কানাইয়ের হাত, পা কাঁপে, আবার সে জ্ঞান হারায়।

অমৃত অনেকটা ধাতস্থ হয়েছে। সে মাথা নাড়িয়ে বলে, 'কান্যইদা, মরলে কি জলে ফেলে দেবে?'

সে রাতে তিরিশ-পঁয়ত্রিশটা লোক কোনোরকমে ঠাণ্ডা মেঝেতে ঘুমোবার চেষ্টা করে। অনেকেরই পায়ের সঙ্গে পা, পিঠের সঙ্গে পিঠ, মাথায় মাথা ঠেকে যায়। তার মধ্যে একটা সাত-আট বছরের বালকের হাঁটু পর্যন্ত কাউর ঘা, ঘসর ঘসর করে চুলকোয় আর কাঁদে। পোঁ পোঁ করে মশা ওড়ে, অন্ধকারে লক্ষ্যভ্রষ্ট চড়ের আওয়াজ অহরহঃ শোনা যায়। অমৃত ঘুমের মধ্যে কথা বলে, 'মা, ওমা, মুড়ি ভাজবি না?'

রুপী একটা কোণ বেছে নিয়েছিল, কিন্তু ক্রমশ আধঘুমন্ত মানুষ সেদিকে গড়িয়ে পড়ে। এরই মধ্যে এক তেলেঙ্গি-দম্পতি বোধ হয় মৈথুনে মত্ত। কানাইয়ের ঘুম-জ্বর এসেছে। তাকে জড়িয়ে ধরে নিজেকে আড়াল করে রাখে রুপী। কানাইকে প্রাচীর দিয়ে সে নিজেকে আটকে রেখেছে। অমৃত ঠিকই বলেছে, যদি মরে যায়, তা হলে তাকে টান দিয়ে গঙ্গাজলে ফেলে দেবে। তখন আর রুপীর প্রাচীর থাকবে না, তখন তার আপনার বলতে কেউ থাকবে না। রুপী কানাইয়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে ডাকে, 'কানাই, কানাই।'

'উঁ।' অস্পষ্ট উত্তর আসে।

রূপী আশ্বস্ত হয়। তা হলে কানাই বেঁচে আছে। মেঝে ছ্যাঁকছ্যাঁক করে ঠাণ্ডায়। রূপী জ্বরতপ্ত কানাইয়ের দেহখানা বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে।

ভোরের দিকে কানাইয়ের জ্বর ছাড়ে। নড়ে-চড়ে তেলচিটে দেয়ালে আধ-ঠেসান দিয়ে বসে। সারারাত ঠাণ্ডা মেঝেতে এপাশ-ওপাশ করে অনেকে ঘুমিয়েছে, নাক ডাকার আওয়াজও আসছে। এখন কী করবে? পালিয়ে যাওয়া যায় না? কানাই দাঁড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করতেই তার মাথা ঘুরে যায়। জানালার বাইরেই দুজন পাইক নিদ্রামগ্ন। তা ছাড়া চারপাশে মানুষের দেহ। এত দেহ মাড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। কানাই বসতে গিয়ে রূপীকে জাগিয়ে দেয়।

ধড়মড় করে উঠে বসেই রূপী কানাইয়ের হাত চেপে ধরে বলে, 'পালাবি? চল।'

'পারব না, মাথা ঘুরছে।'

'তুই বড্ড বাচ্চা।'

কানাই মুখ বেজার করে বললে, আমি লক্ষণদা নই, আমাকে তুই ছেড়ে দে রূপী।'

রূপী তার কথায় কান না দিয়ে বললে, 'কাল যখন নৌকোয় তুলবে তখন আমরা জলে ঝাঁপ দেব।'

'ওদের বন্দুক আছে।'

রূপী রুখে বললে, না হয় মরব। এভাবে বেঁচে থেকে কী লাভ?'

বড় বড় চোখ তুলে কানাই রূপীর দিকে চেয়ে থাকে।

'তখন নদীতে জোয়ার থাকবে। আমরা সাঁতরে ওপারে চলে যাব।'

'তারপর?'

'তারপর কী? দেশে এত লোক আছে। কেউ-না-কেউ আমাদের থাকতে দেবে।'

কানাই মাথা নাড়ায়, 'কেউ দেবে না রূপী। আমাদের গায়ে ছাপ আছে। কোম্পানির চর সব জায়গায় ঘুরছে। আমরা আবার ধরা পড়ব।'

'ধরা পড়লে মরব। এমনিতে মরছি, অমনিতেও মরব।'

ইতিমধ্যে বন্দীদের কেউ কেউ গাত্রোত্থান করে। জালার একপাশে ছাইয়ের গাদা থেকে ছাই তুলে দাঁত মাজে, কেউ গঙ্গাজল খেয়ে আয়ু রাখবার করুণ চেষ্টা করে প্রাতঃকৃত্যে বসে। আওয়াজে, গন্ধে চারিদিক ভরে যায়।

'তোর মনে পড়ে রূপী, নদীর গায়ের আমগাছটা ? ওরকমটি আর হয় না।'

কানাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'আমি আর কোথাও যেতে চাই না, আমাদের সেই গ্রাম, মনে আছে, আমরা বটের আঠা দিয়ে···'

রূপী কঠিনভাবে তার মাথা নেড়ে বললে, 'আমি ফিরতে চাই না। যদি আমি পালাতে পারি, তা হলে একেবারে নতুন জীবন আরম্ভ করব।'

কানাইয়ের অবাক দৃষ্টি লক্ষ্য করে বলে, 'আমাদের গ্রাম আমাদের কী দিয়েছে ? আমাদের বাঁচাতে পেরেছে ? আমাদের মান-সম্মান যে দেশ কেড়ে নিয়েছে, সে দেশে আমি ফিরব না।'

'আমি আর কিছু ভাবতে পারি না আমাদের গাঁ ছাড়া।'

'তুই প্রথমদিন থেকেই গাঁয়ের কথা বলছিস। বিশ্বাস কর, আমি গাঁয়ের কথা ভুলে যেতে চাই, সব, সব ভুলে যেতে চাই।'

কানাই বিদ্রূপ করে বললে, 'তুই তা হলে ভালো বাঁদী হবি। সাহেবদের কথায় উঠবি বসবি।'

অদ্ভুতভাবে তাকায় রূপী। ঠিক এই বয়সের মেয়েরা এভাবে তাকাতে পারে না। যেন কয়েকদিনের ঝড় তাকে ওলোটপালট করে তাকে মানুষ সম্পর্কে এক অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে।

'তোর দাদাকে বলেছিলাম বাঁশের বাড়ি দিয়ে আমায় মেরে ফেলতে। তোর দাদা হেসেছিল, বলেছিল, সতী হবি ? আমি আর মরতে চাই না কানাই। দেখতে চাই, জীবনটা কোথায় নিয়ে যায়।'

ভোরে বালথাজারের ভাঙা গলা বাগান থেকে ভেসে আসে। বালথাজার গাইছে :

> আমরা সব প্রভুর সন্তান,
> আমরা সব প্রভুর সন্তান,
> প্রভু আমাদের করে ত্রাণ।
> প্রভুর বিজয়পতাকা আমরা বই
> প্রভু আমাদের করে ত্রাণ ॥

২

এখন যেখানে পার্ক স্ট্রীট, সে-অঞ্চলে একটা লম্বা হলুদ একতলা বিল্ডিঙের মাথায়, ইণ্ডিয়ান রোডে মস্ত বড় করে লেখা থাকত 'স্লেভ-ওয়্যারহাউস'।

সকাল তখন সাড়ে নটা। এইমাত্র উটের পিঠে আফিমের পেটি চলেছে গঙ্গার ঘাটে, তার পেছনে কোম্পানির জনৈক অফিসিয়ালের পালকি, সামনে দুজন বল্লমধারী বরকন্দাজ, আর হাতে কাগজ-পত্তর নিয়ে হরকরা। সেদিকে চেয়ে চেয়ে নিলামদার, রোগা ছিপছিপে ছোকরা জন পড তার সঙ্গীকে বললে, 'তোমার কি মনে হয় ম্যাক, গত সপ্তাহের মতো এই সপ্তাহটাও যাবে?

'নেটিভ অ্যাস্ট্রলজাররা কিন্তু ওয়াণ্ডারফুল। আমার ভাইয়ের অফিসে একটা ফোঁটাকাটা পামিস্ট আসে, সে আমার হাত দেখে বলেছে, এই সামনের দুটো মাস এমন ধনলাভ হবে, যা আমি কল্পনাও করতে পারি না।' উৎসাহে মোটাসোটা তরুণটির চোখ চকচক করে।

রোগা ছোকরাটি বেজারভাবে বললে, 'দ্যাখো। আমি তো তোমাদের মাইনে-করা লোক, আর তুমি হলে ওয়্যারহাউসের মালিক।'

ম্যাক বললে, 'আরে আমরা দুজনেই এসেছি এই জাহান্নামে ভাগ্যের সন্ধানে। আমার বেশি লাভ হলে তোমাকে কমিশন দেব আগেই বলেছি।'

'তুমি তো সেই এপ্রিল মাস থেকে বলে আসছ। গভর্ণর-জেনারেলের নতুন আইনের ফলে এখন ট্রেডে বুম্ চলেছে। রোজ শয়ে শয়ে স্লেভ বিক্রি হচ্ছে। আর তুমি আমার এতকালের বন্ধু হয়ে...' আবেগে জন পডের গলা বন্ধ হয়ে আসে।

'তুমি খুড্ড সেণ্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ছ জন। আমি জানি, তোমার কাজে ইমোশনাল স্ট্রেন হয়, কিন্তু আমরা একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছি. একসঙ্গে প্রথম নারীদেহের স্বাদ পেয়েছি...'

জন পড বললে, 'আমি জানি, তুমি আমার দুর্বলতা জানো, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি, এইভাবে বেশিদিন চলবে না।'

উত্তেজনায় তার মুখ, চোখ লাল হয়ে ওঠে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ফেলে। ওয়্যারহাউসের পেটা ঘড়িতে দশটা বাজে।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', ওয়্যারহাউসের সিনিয়র পার্টনার হাত নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলে, 'তবে তুমি ভাই, বাগানটা একটু দেখো। আমার খুব ইচ্ছে, এবারের শীতে আমার ওয়্যারহাউসের বাগানটা একটু সাজাই। এতে আখেরে তোমারই লাভ। আরো বেশি খদ্দের আসবে, তোমারও কমিশন বাড়বে।'

কথা শেষ হতে না-হতেই মুখ দিয়ে তার অদ্ভুত আওয়াজ বেরোয় 'ব্রেত! ব্রেত।'

ইতিমধ্যে একটা চমৎকার বগি-গাড়ি গেটের সামনে দাঁড়িয়েছে। গাড়ি, ঘোড়া এবং গাড়োয়ান, বেয়ারা সবাই অভিজাত সওয়ারির ইঙ্গিত দেয়। গাড়ির দরজা বেয়ারা খুলে দিতেই দীর্ঘকায়, কালো পোশাক ও সাদা ফ্রিলের কলার-আঁটা, চোখে প্যাশনে আঁরি ব্রেত নামেন, পেছনে নীল গাউনের ওপর লম্বা ঢোলা হাতওয়ালা কামিজ ও জাপানি পাখাহাতে মাদাম। দীর্ঘকায়, ছিমছাম পুরুষটির পাশে বিশালবপু মহিলাটি যখন ধীরগতিতে এগিয়ে আসে, তখন ম্যাকগ্রেগরের গলা দিয়ে অদ্ভুত সব আওয়াজ বেরোয়, 'আজকে লটকে লট, আজকে লটকে লট।' 'ভাবা যায়?' 'আশ্চর্য।'

গেটের কাছে ছুটে গিয়ে সে মাথা ঝুঁকিয়ে অভিবাদন করে তীক্ষ্ণস্বরে, 'বঁজু মাদাম। বঁজু মসিও। আপনারা আসুন আসুন। আমার কি সৌভাগ্য।' বাইরে রিসেপশান-কক্ষে মানুষ-সমান বিরাট হাতপাখা নিয়ে দুজন লোক ঝিমোচ্ছিল। তাদের একজনকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে সে অতিথিদের ভেতরে নিয়ে যায়। দুজন আধ-ঘুমন্ত লোক সজোরে বাতাস করতে করতে ক্রমশঃ ধীর হয়ে পড়ে। মসিও ও মাদাম নিচুস্বরে আলাপ করতে থাকে।

'তুমি যদি এই শীতের কয়েকটা মাস ঠেকা দিতে পার, তা হলে একবার আমি জাভা-সুমাত্রা ঘুরে আসি। শুনেছি ওদিকে বাণিজ্যের প্রচুর সম্ভাবনা।'

মাদাম বললে, 'তোমার যদি মেয়েছেলে করার দরকার থাকে, অত সুদূর দেশে পাড়ি দেওয়ার কী দরকার। কলকাতাতেই যথেষ্ট পাওয়া যাবে।'

ঝকঝকে হাসিতে মুখ ভরিয়ে ব্রেত বললে, 'তুমি তো জানই আমি এখন সাধু-সন্ত হয়ে যাচ্ছি। ইণ্ডিয়ান ক্লাইমেটে সাধু হওয়া ছাড়া উপায় নেই।'

'ও-সব কথা আমাকে কেন বলছ আঁরি। আমাদের দেশের পাদরিদের জানি না? সাধুরাও ঐ-রকম। ধর্মটা আর-কিছুই না, মাগিবাজি করার পাসপোর্ট।'

'তুমি বড্ড গম্ভীর কথা বলতে আরম্ভ করছ মারি। আমি বুঝতে পারছি, এবার গরমটা তোমায় খুব কষ্ট দিয়েছে। তখন যদি আমার পরামর্শটা নিতে,

এখানকার যা নিয়ম, চুলটা চেঁছে ফেলতে। অবশ্য তোমার গোল্ডেন কার্ল চলে গেলে আমিই সবচেয়ে দুঃখিত হতাম।'

'থাক, থাক! এই-সব বোকা জন্তুগুলো তোমার কথা শুনে হাসবে', মাদাম পাংখাওয়ালাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে বলে। 'তাও বুঝতাম যদি মাদাম ইমহোপের মতো হীরের নেকলেস পেতাম। মুক্তোর হারটা একেবারে ম্যাড়-মেড়ে। আমার মনে হয় তোমাকে ঠকিয়েছে, অথবা তুমি জেনেশুনেই ঠকেছ কম দামে পাবে বলে।'

'তোমার মন পাওয়া আর ঈশ্বরদর্শন প্রায় একই কথা।'

'প্রত্যেক লম্পটই তার স্ত্রীকে এ কথা বলে।'

'তুমি তা হলে আমাকে ডিভোর্স কর-না কেন? আমি তো তোমাকে বারে-বারেই বলেছি।' ব্রেত বুক-পকেট থেকে রুমাল বার করে কপাল পোঁছে।

মাদাম উত্তেজিত হয়ে হাতপাখা চালাতে চালাতে বললে, 'ডিভোর্স কেন করিনি তা তো তুমি জান। করিনি আমার বাবার জন্যে। একটা কেলেংকারি হবে। মুখে চুনকালি পড়বে।'

'পয়সা খরচ করলে চুনকালির দাগ উঠে যায়।'

'তোমার তো সব কিছুই পয়সা।'

'আর তোমার? হীরে-জহরতের জন্যে তোমারও যে মন সব সময় ছোঁক ছোঁক করছে। তুমি আর যাই হোক, সন্ন্যাসিনী নও।'

উত্তেজনায় মাদাম বাকরুদ্ধ। ঘন ঘন হাতপাখা নাড়ায়। চোখের কাছে জল উছলে আসে। চারদিকে চাপা সেণ্টের গন্ধ।

সুন্দর করে কাটা নখ, ওডিকোলন-মাখা কোটিপতির হাতখানা নেমে আসে স্ত্রীর হাতের ওপর। মৃদু চাপ দিয়ে ব্রেত বলে, 'আমি তো সেই কথাই বার বার তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করে আসছি, আমরা কেউ সাধু-সন্ত নই। আমরা নেহাৎ মানুষ, আমরা টাকা চাই, পয়সা চাই। দরকার হলে কিছু কিছু অবৈধ সম্পর্কও চাই।...আমার সবচাইতে কষ্ট কি হয় জান মারি, যখন দেখি, ইয়োরোপ সবদিক থেকে শৌর্যে-বীর্যে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ মনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে। যা চায় তা বলতে পারি না। আমি তোমাকে নিঃসংশয়ে বলছি মারি, তোমার যদি আমাকে ছাড়াও সেক্সের দরকার হয়, আমি বাধা দেব না। আমরা দুজনা দুজনকে বুঝে নেব।'

হঠাৎ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে মাদাম বললে, 'আমি তোমাকে ছাড়া কাউকে

ভাবতে পারিনা আমি।'

ব্রেত' তাড়াতাড়ি তার রুমালটা এগিয়ে দেয় স্ত্রীর হাতে।

'আমি সত্যি বলছি, ভগবান শপথ!'

'আমি জানি, জানি মারি। ভালোবাসা কি বলার জিনিস!' মৃদু হাতের চাপ দেয় ব্রেত' স্ত্রীর হাতে, কিন্তু তার মুখে বেজার-ভাব ফুটে ওঠে। পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সময় দেখে।

'আমার মনে হয় কি মারি। তোমার জন্যে একটা ভালো মেয়েছেলে দরকার। আমার মাদাগাসকারের জন্যে একটা লট নিতে হবে। তার সঙ্গে তোমার একটা অ্যাটেনডেন্ট।'

'দ্যাখো!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাদাম বললে।

এমন সময় দুজন মধ্যবয়সী পর্তুগীজ ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলে। পি. রডারিগ ও এস. রডারিগ, দুই ভাই-ই স্লেভ-ট্রেডের সঙ্গে জড়িত। তাদের ব্যবসায় বোর্ণিও, জাভার সঙ্গে। এর পর চকচকে টাক-মাথায় ম্যাকডাওয়েল। বোর্ড অফ ট্রেডের সভ্য হিসেবে তার প্রকাশ্যে স্লেভ ট্রেডের সঙ্গে যোগাযোগ কিছুটা দৃষ্টিকটু হলেও যেহেতু সে গভর্ণর-জেনারেলের সদ্য-প্রতিষ্ঠিত একটি বিভাগের কর্তা হয়েছে, সেই সূত্রে এখানে আসা নিয়ে কেউ বিশেষ ভাবে না। স্লেভ-ট্রেডও কোম্পানির 'ইকনমিক রিভাইটালাইজেশান ডিপার্টমেন্ট' বা 'আর্থিক অভ্যুত্থান-বিভাগের' এক অংশ। এবার ঢুকলো একজন সৌম্য দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান, হাতে সোনার বাঁটওয়ালা ছড়ি। পিছনে তিন-চারজন কোম্পানির অফিশিয়াল, মেজর ফাউলার, ডক্টর ডিক।

ঢং ঢং করে দশটা বাজে। জন পডের উত্তেজিত মুখখানা দরজার গোড়ায় দেখা যায়। ম্যাকগ্রেসর অভিবাদন করে বললে, 'হলে আসতে আজ্ঞা হোক।'

হলের লম্বা দুটি দেয়ালে দুটি তৈলচিত্র। প্রথমটি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর, দ্বিতীয়টি গভর্ণর-জেনারেলের। প্রথম তেলের কাজ তৎকালীন এক প্রসিদ্ধ পর্তুগীজ চিত্রকরের। এই ক্রুশবিদ্ধ যিশুর নীচেই চার সারি ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী। লম্বা কাঠের খোঁয়াড়ে চল্লিশজন করে এক-একটা লট। একশ ষাট জন অপেক্ষমান পুরুষ-রমণী-শিশু। গত পনেরোদিনের প্রবল অত্যাচারে, অর্ধাহারে তারা সবাই ক্ষয়ে গেছে। চাহনিতে সামান্য দীপ্তি নেই। ঠিক গরুর খোঁয়াড়ের মতোই এই মানুষের খোঁয়াড়, কারণ, বেশির ভাগ গোলাম-বাঁদীর চোখে ফ্যাল-ফেলে জন্তুর দৃষ্টি। নিলামের দু-দিন আগে থেকে তাদের অবশ্য ঘষা-মাজা

হচ্ছে, লোকে যেমন ঘটি বাটি মাজে, তেমনি ছাই-খোল আর বালতি বালতি জল দিয়ে তাদের ঘষে, পাখলে ঝকঝকে করবার চেষ্টা হয়েছে। গতকাল আটার গোলার বদলে দুবেলা ভাত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু, এই যত্নে বিশেষ কাজ হয়নি। কেউ-কেউ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, কেউ ঝিমোচ্ছে, কেউ কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকতে অসমর্থ। খোঁয়াড়ের কাঠে হেলান দিয়ে মাথা নিচু করে ঘুমিয়ে নিচ্ছে।

টুকটুকে লাল সার্ট আর ডোরাকাটা-কালো প্যাণ্টপরা জন পড চেঁচানো সুরু করার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় নাচতে থাকে; এই প্রথম সারিতে যাদের দেখছেন তারা সেই বিখ্যাত ভাগলপুরের লট। আপনারা নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন, ভাগলপুর কী? ভাগলপুর বিহারে অধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের সবচেয়ে স্বাস্থ্যকর স্থান। জল এখানে দুধ। এখানকার লোকেরা শারীরিক ক্ষমতায় অপরাজেয়। আড়াইমণি পাথর বয়ে নিয়ে যাবে দশ মাইল। মৃত্যুকেও এদের পরোয়া নেই, মৃত্যুর আগেও টুঁ শব্দটি করবে না। এরা, আপনারা সবাই জানেন, বাটাভিয়ায় মালয়ের জঙ্গল সাফ করেছে, মাদাগাস্কারে রাস্তা বানিয়েছে। শারীরিক ক্ষমতায় এই অতুলনীয় মানুষদের—একটা জিনিস জেনে আনন্দিত হবেন—মন বলে কিছু নেই। যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন, সেই গুণটি এদের আছে।'

এক নিঃশ্বাসে এতদূর বলার পর পড হাঁপায়। একবার তীব্র কটাক্ষ দেয় তার প্রাক্তন বন্ধু ও ওয়্যারহাউসের মালিক ম্যাকগ্রেগরের দিকে।

ম্যাকগ্রেগর অমনি বলতে থাকে, 'আমার বন্ধু যা বলছেন, তা সস্তা জিনিস চালাবার বিজ্ঞাপন নয়। আপনারা সবাই বিশেষজ্ঞ, আপনারা নিজেরাই মালের কদর জানেন।'

জন পড দম নিয়ে লাল শার্টের ওপর নীল টাই ঠিক করে সরু বুকখানা চিতিয়ে বলতে থাকে, 'আপনারা নিশ্চয় স্লেভ-পিছু কুড়ি টাকা বেশি মনে করেন না। চল্লিশ জনের এই লট যাচ্ছে আট শ টাকায়।' টেবিলের ওপর কাঠের হাতুড়ি ঠক ঠক করে পিটতে সুরু করে।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ক্রেতারা খোঁয়াড়ের চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জ্যেষ্ঠ রডারিগ একজন ক্রীতদাসের হাতের গুলি পরীক্ষা করবার জন্য ছড়ি দিয়ে একটা খোঁচা দেয়। ক্রীতদাসটির মুখে ভাবান্তর নেই। ম্যাকগ্রেগর এগিয়ে এসে একজন যুবতীর বুকের কাপড় হাত দিয়ে ফাঁক করে বলে, 'জাস্ট এ মিল্‌চ কাউ। ভাগলপুর ইজ ফেমাস ফর মিল্‌চ কাউজ।' ব্রেত নাকের ওপর প্যাশনে ঠিক

করে সেদিকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে, মাদামের চোখেও কৌতূহল।
ক্রীতদাস ক্রীতদাসীদের এইভাবে দেখেশুনে কেনাকাটা খুবই স্বাভাবিক। ক্রীতদাসীদের বিশেষ করে সন্তান পয়দা করার ক্ষমতার ওপর দাম ওঠে-নামে। অনেক ক্রেতারা ক্রীতদাসী পছন্দ করে, কারণ তাদের খাটিয়ে আরো দশ-বারোটা স্লেভ ফোকটে পাওয়া যাবে।
সৌম্য দাড়িওয়ালা আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকটি এবার এগিয়ে আসে এবং লোকে মুর্গী কিনবার আগে তার যেমন বুক, পিঠ টিপে দেখে, তেমনিভাবে একজন জোয়ান ক্রীতদাসের ঘাড়, হাতের গুলি টিপতে থাকে।
এদিকে জন পডের গলা উত্তাল: 'আই সে এগেন, এইট হান্ড্রেড ফর ফরটি-ওয়ান', বলে খটাস করে কাঠের হাতুড়ি ঠোকে।
'এইট টুয়েন্টি।' বোধ হয় কনিষ্ঠ রডারিগের গলা।
'থ্যাংক ইউ।' পড যেন লাফিয়ে ওঠে। 'এইট টুয়েন্টি! অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ভাগলপুর! আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন! তুলনাহীন! আই সে এইট টুয়েন্টি ফর ওয়ান! এইট টুয়েন্টি ফর টু!'
বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান চেঁচিয়ে উঠল, 'এইট ফিফটি!'
'থ্যাংক ইউ স্যার। রতনে-রতন চেনে। আজকে এখানে ট্রেডের বিশেষজ্ঞরা সমাগত। আমি জানি, ভাগলপুর কখনো ব্যর্থ হবে না, ভাগলপুর স্লেভ-ট্রেডের ম্যাপে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আই সে এইট ফিফটি ফর ওয়ান।'
পেছন থেকে গলা আসে, 'নাইন হান্ড্রেড', ডক্টর ডিকির গলা।
'থ্যাংক ইউ ডক্টর।' লাল টুকটুকে শার্ট শূন্যে লাফিয়ে ওঠে। 'আই সে নাইন হান্ড্রেড ফর ওয়ান, নাইন হান্ড্রেড ফর টু, নাইন হান্ড্রেড ফর থ্রি।' ধম্ করে শেষবারের মতো পড হাতুড়ি পেটে।
এবার দ্বিতীয় সারির ডাক সুরু হয়। কালো-কুচকুচে, শক্ত-সমর্থ মানুষগুলোর পেছনে বিহ্বলচোখে অমৃত। এরা মালাবার অঞ্চলের চাষী। দু-বছর পর-পর প্রচণ্ড আকালের দরুণ অনেকে স্বেচ্ছায় দাসত্ব স্বীকার করেছে দু-মুঠো খাবারের প্রত্যাশায়, কিন্তু জাহাজে আসবার সময় একজনের অর্ধাহারে মৃত্যুর জন্যে চল্লিশের লট অপূর্ণ থাকে। লট পূর্ণ করতে অমৃতকে ভেড়ানো।
এই লটটার দিকে ব্রেত এগিয়ে আসে। প্যাশনে নাকের ওপর তুলে মুখ নিচু করে যেন গা শুঁকে নেয় তাদের, মাদামের দিকে চেয়ে ফিসফিসিয়ে বলে, 'আরো ভালো লট। আরো টাফ। মাদাগাস্কারে সড়ক বানাবার পক্ষে চমৎকার।'

'একসল' !' 'একসল' ! 'সোলিদ' ! 'তেমাসিতে' ! ইত্যাদি ফরাসি বিশেষণ, বিশেষ্য হাওয়ায় ঘোরে। রডারিগ-ভ্রাতৃদ্বয় তেমন উৎসাহ দেখায় না। তারা বরং পরবর্তী সারিতে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের লোকজনের প্রতি আকৃষ্ট। ছোট রডারিগের রূপীকে দেখে লিঙ্গভ্রম হয়। শেষে ম্যাকগ্রেগর তার আলখাল্লা তুলে তার ফুটন্ত স্তনের দিকে আঙুল দেখায়। পেছনেই কানাই। সে সামনে চেয়ে থাকে, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না।

জন পড এবার লাফিয়ে টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। গলা ঝেড়ে নেয়। ম্যাকগ্রেগরের দিকে পিছু ফিরে নিচু গলায় বললে, 'খাটিয়ে তো জান কালি করে দিচ্ছ ব্রাদার। ডাক্তার বলেছে, বেশি চেঁচালে টি. বি. হবে।' ম্যাক তার মোটা থাবা তুলে বললে, 'ডোণ্ট বি সিলি।'

ইতিমধ্যে নিচু চৌকির ওপর লাফ দিয়ে উঠে পড হাতুড়ি পেটে। আবার উঁচু সুরেলা গলায় চেঁচাতে থাকে, 'আজ বারোই অক্টোবর, সতের-শ তিরাশি, একটা জ্বলজ্বলে দিন, একটা সৌভাগ্যের দিন, একটা—' তার আবার কাশি উঠে পড়ে, প্রবল কাশির দমক সামলে দুঃখপ্রকাশ করে বলে, 'আজকে আমাদের ট্রেডের সবচেয়ে গণ্যমান্য লোকজন আমাদের ওয়্যারহাউসে পদার্পণ করেছেন। এর জন্য বিশেষ করে কৃতজ্ঞ আমরা মাদাম ব্রেতঁর কাছে।' পড ঘাড় নুইয়ে থিয়েটারি ভঙ্গিতে অভিবাদন করে ব্রেতঁ-দম্পতিকে। প্রত্যুত্তরে তারাও স্মিত হেসে মাথা নোয়ায়।

'আমাদের ট্রেডের সঙ্গে যারাই যুক্ত, তারাই নিশ্চয় মালাবারের নাম শুনেছেন। এমন কষ্টসহিষ্ণু লোক শুনি কেবলমাত্র জাপানে পাওয়া যায়। এরা সাতদিন না খেয়ে কাজ করবে, টুঁ শব্দটি করবে না। আমি এক মালাবারি স্লেভকে জানি, যে বাঘের সঙ্গে শুধুহাতে লড়াই করে তার মনিবপুত্রের প্রাণ বাঁচিয়েছে। এদের বুকে সিংহ, পেশীতে হাতুড়ি, পায়ে ঘোড়া। হ্যাঁ, বিশ্বাস করুন, এরা ঘোড়ার মতো দৌড়য়। দরকার হলে আপনার গ্যাড়ি টেনে নিয়ে যাবে।' পড আবার হাঁফিয়ে ওঠে। কপালের ঘাম মোছে রুমাল দিয়ে। একবার গভর্ণর-জেনারেলের তৈলচিত্রের দিকে একনজর চেয়ে আবার বুক চিতিয়ে হাতুড়ি পেটে। 'এই-সব দুনিয়ার বিস্ময়ের জন্যে মাথা-পিছু অন্ততঃ তিরিশ টাকাও তো দেবেন। তার মানে এই লটের জন্যে মাত্র বারো-শ টাকা। অবশ্য একটা এলেবেলে আছে। আমরা ঠিক চল্লিশজন জোগাড় করতে পারিনি। সঙ্গে একটি বালক আছে, কিন্তু আপনারা বিশেষজ্ঞ-মাত্রই জানেন ; বালকদের সম্ভাবনা

খুব বেশি। তারা কম খেয়ে সবরকম কাজই করতে পারে।'
দুবার হাতুড়ি ঠক ঠক করে পিটে বললে, 'আই সে টুয়েলভ হাণ্ড্রেড ফর ওয়ান, টুয়েলভ হাণ্ড্রেড ফর টু।'
'থার্টিন হাণ্ড্রেড!' ব্রেত'র চাঁছাছোলা গলা সঙ্গে সঙ্গে বেজে ওঠে।
'থ্যাঙ্ক ইউ! থ্যাঙ্ক ইউ মসিও! আমি তো বলেইছি রতনে রতন চেনে। আমাদের আজকে এক সৌভাগ্যের দিন। আজকে সতের-শ তিরাশি সালের…'
আবার কাশির দমক ওঠে জন পডের।
আবার নিজেকে সামলে নিয়ে পড হাতুড়ি বাজায়। 'আই সে, থার্টিন হাণ্ড্রেড ফর ওয়ান।'
'থার্টিন হাণ্ড্রেড ফিফটি।' সেই দাড়িওয়ালা সৌম্য আর্মেনিয়ান ভদ্রলোকটি মৃদুগলায় বললে।
কথাটা লুফে নিয়ে পড বললে, 'থার্টিন হাণ্ড্রেড ফিফটি ফর ওয়ান…'
এবং তার কথা শেষ না হতে-হতেই আবার সেই চাঁছাছোলা স্বর বেজে ওঠে, 'ফিফটিন হাণ্ড্রেড। শেষ ডাক।'
একটা চাপা সোরগোল ওঠে ক্রেতাদের মধ্যে, খানিকটা অসন্তোষের, খানিকটা প্রতিবাদের। 'ফরাসীরা সব সময়েই আমাদের পেছনে কাঠি দেবার তাল করছে, ম্যাকডাওয়েল মাথা নাড়িয়ে বললে। ম্যাকগ্রেগরের মুখ উদ্ভাসিত। পডকে চোখ মেরে উৎসাহিত করে সে মসিও ব্রেত'র করমর্দন করে।
আর দুই সারি বাঙালি। বাংলাদেশের গাঁয়ের মানুষ। তারই মাঝখানে রুপী আর কানাই। এবার জন কোম্পানির অফিশিয়ালদের মধ্যে তৎপরতা দেখা যায়। ডক্টর ডিকি এগিয়ে এসে কয়েকজন মানুষের গা, পা টিপতে থাকে। দুই সারির পর পাঁচ-ছ মিনিট বিশ্রাম। জন পড একটা চুরুট ধরিয়ে ম্যাকগ্রেগরকে বাইরে ডাকে।
'আমি সাফ বলে দিচ্ছি একটা কথা,' ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে পড বললে।
'তুমি তো অনেকবারই আমাকে বলেছ। আমার ঠিক মনে আছে।'
'ঠিক আছে, তোমার নিলাম থাকল। বাকি নিলামটা তুমি কর। আমি চললাম।'
ম্যাকগ্রেগর চোখ বড় করে বললে, 'তুমি কি পাগল হয়েছ জন?'
গলার টাই ঠিক করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্বরে জন পড বললে, 'হ্যাঁ, আমি পাগল হয়েছি। তোমাকে এখনই ফার্ম কমিটমেণ্ট করতে হবে। যদি এই মাস থেকেই ফাইভ পার্সেণ্ট দাও, তা হলে আমি নিলাম ডাকছি, নইলে আমি চললাম।'

ম্যাকগ্রেগর পডের আপাদমস্তক ভালোভাবে দেখে। এটা ঠিক তার ঘ্যানঘ্যানানি নয়। আর সত্যিই সে একটু মাথাপাগলা। যদি নিলামের মাঝখানে কেটে পড়ে, তা হলে ডাহা লস। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'ঠিক আছে। তোমার কথাই মেনে নিলাম, কিন্তু ভদ্রলোকের এক কথা। দেড় পার্সেন্ট দিলেই আমার লোকসান। তবু তোমার পুরনো বন্ধুত্বের কথা মনে করে টু পার্সেন্টেই রাজি হচ্ছি।'

গল গল করে ধোঁয়া ছাড়ে পড। তারপর স্থিরদৃষ্টিতে ওয়্যারহাউসের মালিকের দিকে চেয়ে বললে, 'তুমি কি চাও না ম্যাক, আমি আর-পাঁচটা লোকের মতো সংসার করি? কদ্দিন আর এই নেটিভ মেয়েদের গা শুঁকে শুঁকে বেড়াব? তা ছাড়া আমার মতো অকশনিয়ার এই কলকাতা শহরে কটা আছে? তুমি নিজেই বল। খিদিরপুরের রিচার্ডসনটা তো একটা হিজড়ে, আর তুমি ভাবছ লালবাজারের ইয়াং? একমাসে অন্ততঃ সাত-আটদিন মাল খেয়ে পড়ে থাকে।

ম্যাকগ্রেগর পডের পিঠে হাত রেখে বললে, 'তুমি যা বলছ তা সবই সত্যি। সত্যিই তুমি আর্টিস্ট। তোমার কবিত্বশক্তি আছে। রিচার্ডসন, ইয়াং তা কোথায় পাবে?'

'তবে? তোমার আপত্তিটা কোথায়?'

'তুমি আমার বন্ধু, তুমি নিশ্চয় বুঝবে। কবিত্বশক্তি দিয়ে ক্রেতাদের আকর্ষণ করা যায়, কিন্তু একটা গোটা স্লেভ-ওয়্যারহাউস চালাতে পারা যায় না। এখন বুঝ্ যাচ্ছে সত্যি কথা। গভর্ণর-জেনারেল একজন মহাপুরুষ, কিন্তু দু-বছর আগে ট্রেড-ডিপ্রেশন সুরু হয়েছিল। বিশ্বাস কর, সেদিনের লস এখনো আমার শোধ হয়নি।'

'তোমার মতো ব্লাফ দিতে দুটি লোক দেখিনি।'

'টু পার্সেন্ট, টু পার্সেন্ট। চল, সময় বয়ে যাচ্ছে। আর দু-মাসের মধ্যেই তোমার বিয়ে দিচ্ছি। ও ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও।'

মেয়েদের প্রসঙ্গে জন পডের গলার আওয়াজ মোলায়েম হয়ে আসে। বললে, 'বয়স হয়ে যাচ্ছে ম্যাক। বুড়ো হয়ে যাচ্ছি। সামনের মার্চে পঁয়ত্রিশ। ভাবা যায়!' চুরুটে হালকাভাবে সুখটান দেয় পড।

'কালবেই জাহাজ থেকে এক ঝাঁক নেমেছে। তাদের মধ্যে সেই টেম্পল ইন বারের মেয়েটার মতো অবিকল দেখতে, সেইরকম ঝকঝকে দাঁতের হাসি, চকচকে চোখ।'

ওঃ, কদ্দিন হয়ে গেল, না ম্যাক?' নরম গলায় পড বললে, 'কি যেন নাম ছিল? মলি? না?'

হ্যাঁ, মলি অ্যান্ডারসন। আমি কথা দিচ্ছি, ঐরকম একটা মলি জোগাড় হয়ে যাবে। তুমি একটু ধৈর্য ধর জন। সবুরে মেওয়া ফলে কথাটা সব দেশেই সত্যি। চল চল, আমাদের জন্যে সবাই অপেক্ষা করছে।'

জন পড আবার উদ্দীপ্ত হয়ে পড়ে। টাই ঠিক করে গলা খাঁকারি দিয়ে হাতুড়ি পিটে বলে, 'এবারে যে দুই সারি দেখছেন, তারা বাংলাদেশের লোক। আপনারা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানেন, এরা কিরকম বুদ্ধিমান। আপনাদের ব্যানিয়ানদের কথা স্মরণ করুন। ব্যানিয়ানদের রক্ত এদেরই গায়ে। এরা মালাবারের লোকের মতো জঙ্গল সাফ করতে পারবে না কিংবা ভাগলপুরের লোকের মতো মাল বইতে পারবে না, কিন্তু বুদ্ধিতে সবাইকে টেক্কা দেবে। আপনারা নিশ্চয় ভাবছেন, ভৃত্যের বুদ্ধি মানেই বিপদ, কিন্তু মাদাম এখানে আছেন, উনি সবচেয়ে ভালো বুঝবেন, বোকা লোক চরাবার কি পরিশ্রম! একটা ভালো খিদমদগারের মাইনে অনেক বেশি। এদের একজনকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিন, দেখবেন, গড়গড়ার নল ঠিক সময় আপনার ঠোঁটের কাছে, ক্ল্যারেট এবং ম্যাডেরিয়ার পার্থক্য এবং কোন্ সময় কোন্‌টা মনিবের মনে ধরবে তা তারা মনিবের চেয়েও ভালো বুঝবে। আর এদের মেয়েদের কেশ-পরিচর্যার ঐতিহ্য আছে। এই দুঃসহ গরমের দেশে লেডিজ অ্যাটেন্ডেন্টরূপে এদের মেয়েরা অনবদ্য। এই লটের ব্যাপারে আমরা খুব সামান্য মুনাফা রাখব স্থির করেছি। মাত্র কুড়ি টাকা করে ধরছি। জেনে রাখবেন, একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে এদের রিয়েল ভ্যালু অসামান্য। কুড়ি টাকাতে কিনে আপনি দু-বছর পর দু-শ টাকাতেও বেচতে পারেন।'

আবার গলা খাঁকারি দিয়ে পরিষ্কার করে কপালের ঘাম মুছে খটাস করে কাঠের হাতুড়ি ঠোকে জন পড। 'আই সে, ওনলি সিক্স হান্ড্রেড রুপিস ফর দিস লট। আই সে, সিক্স হান্ড্রেড ফর ওয়ান - '

'সেভেন হান্ড্রেড!' ডক্টর ডিকির গলা।

'থ্যাঙ্ক ইউ, ডক্টর।' আপনারা জানেন ডক্টর ডিকি একজন অসামান্য চিকিৎসক। ইংল্যান্ডে থাকলে তিনি ইংল্যান্ডেশ্বরের চিকিৎসক হতে পারতেন। আই সে, সেভেন হান্ড্রেড ফর ওয়ান, সেভেন হান্ড্রেড ফর টু...'

'এইট হান্ড্রেড!' মেজর ফাউলারের গলা।

'গ্রেট ! গ্রেট !' উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে পড। 'আমি বলেছিলাম, না আজ এক সৌভাগ্যের দিন, আজ এক জ্বলজ্বলে দিন ! আই সে, এইট হাণ্ড্রেড। এইট হাণ্ড্রেড ফর ওয়ান, এইট হাণ্ড্রেড ফর টু…'

নাইন হাণ্ড্রেড !' আবার সেই চাঁছাছোলা ফরাসী গলা।

এবার একটা চাপা অসন্তোষ পেছনের লাইন থেকে ওঠে।

পড মঁসিও ও মাদামের দিকে অভিবাদন করে বলে, 'ব্রেবিঁয়া, ব্রেবিঁয়া ! রতনে রতন চেনে। আই সে, নাইন হাণ্ড্রেড। নাইন হাণ্ড্রেড ফর ওয়ান, নাইন হাণ্ড্রেড ফর টু…'

'ওয়ান থাউজেণ্ড !' ডক্টর ডিকির মরীয়া গলা।

জন পড উৎসাহে প্রায় নাচতে থাকে। 'ডক্টর ডিকি অসামান্য চিকিৎসক ! আই সে, ওয়ান থাউজেণ্ড ! এই-সব প্রতিভাবান নরনারী, মাত্র ওয়ান থাউজেণ্ড। এক হাজার টাকা কী ? এক রাত্তিরেই কয়েকজন বন্ধু মিলে এক হাজার টাকা উড়িয়ে দেওয়া যায়। যা বেঁচে থাকে তা হল মানুষের কাজ, মানুষের চিন্তা।' আবার কাশি এসে পড়ে। সামলে নিয়ে পড হাতুড়ি পেটে।

ডিকির ওপরে আর ডাক ওঠে না। ফরাসী কোটিপতি বোধ হয় ইচ্ছে করেই ডাকে না। কারণ, কোম্পানি মহলে ডিকির প্রতিপত্তি অসামান্য, গভর্ণর-জেনারেলকেও সম্প্রতি দই খেতে পরামর্শ দিয়েছে। তা ছাড়া রূপীর দিকে নজর থাকলেও লট থেকে তাকে এখন আলাদা করে নেওয়া যাবে না। বাকি লোকজন মাদাগাস্কারে অচল, না পারবে পাথর ভাঙতে, না পারবে জঙ্গল সাফ করতে।

'আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি ঐ ফরাসী এজেণ্টটার সঙ্গে টক্কর দিয়ে জিতব', ডক্টর ডিকি মেজর ফাউলারকে বললে।

ঢং ঢং করে এগারোটা বাজে। শেষ সারি নিয়ে খুব ডাকাডাকি হল না। লটটা বড় ডারিগ ন-শ টাকায় কিনলে। পড শেষবারের মতো হাতুড়ি পিটে বললে, 'সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, স্লেভ-ওয়্যারহাউসের তরফ থেকে আমার ও আমার বন্ধু মিস্টার ম্যাকগ্রেগরের আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ করুন। আগামী বুধবার সকাল দশটায় আবার নিলাম ডাকছি। এবারেও নতুন-নতুন জায়গা থেকে নতুন-নতুন ক্রীতদাস এনে আপনাদের মনোরঞ্জন করা হবে। সামনের বুধবার সকাল দশটা। ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ !'

তারপর ঘরখানা আস্তে আস্তে ফাঁকা হয়ে যায় ! গোলাম-বাঁদীদের দাঁড়িয়ে

দাঁড়িয়ে পা ধরে যায়, কারুর কারুর গলায় মৃদু আর্তনাদ বেরোয়, কেউ কাঠের ওপর শরীর ভর দিয়ে সম্পূর্ণ ঘুমিয়ে পড়ে। ঘরের মধ্যে কতকগুলো চড়ুই-পাখি ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে উড়ে বেড়ায়, কিন্তু ক্রেতারা কিংবা ওয়্যারহাউসের লোকজন কেউ নেই। ঢং ঢং করে বারোটা বাজে, তারপর ঢং করে একটা বাজল। একটার পর গেটের কাছে সারি সারি গরুর গাড়ি, মোষের গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়ায়। বেলা আড়াইটের সময় ম্যাকগ্রেগর লাঞ্চ খেয়ে হাজির হয়, সঙ্গে সুলেমান স্লেভ-হাউসের সরকার, বাবু, পাইক-বরকন্দাজ। তারপর কোমরে দড়ি দিয়ে সার-সার অভুক্ত বন্দীদের গাড়িতে তোলা হতে থাকে। হঠাৎ অমৃত চেঁচিয়ে ওঠে, 'আমি দিদির সঙ্গে যাব, আমি দিদির সঙ্গে যাব।' অদূরে দাঁড়ানো রূপীর দিকে সে আঙুল দিয়ে দেখায়।

সুলেমান বললে, 'দূর, তুই যাচ্ছিস জাহাজে চেপে, তোর জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে।' অমৃত আর্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, 'কোথায়? কোথায় যাব আমি?'

'তুই যাবি বেহেস্তে।'

'সেটা কোথায়? আমাদের গাঁয়ের কাছে?'

'হ্যাঁ, গাঁয়ের পাশে', সুলেমান তাকে এক ধাক্কায় সামনের চলমান বন্দীদের দিকে ঠেলে দেয়।

'দিদি?' স্লেভ-হাউসের বাইরে থেকে একটা চিৎকার আসে। রূপীর কানে তা পেঁছয়নি। রূপী তখন ঘুমোচ্ছিল।

৩

সেন্ট জন্স চার্চে সেদিন ফুলের বাসর। ফুলের গন্ধের সঙ্গে ফরাসী সেন্টের সুবাসে বাতাস ভারি। বাইরে কাতার দিয়ে ফিটন, বগি, ব্রুহাম, ল্যান্ডো, ব্যানিয়ানদের নানা ধরনের পালকি, চৌপাল, জেহালদার। কেউ কেউ এসেছি দামী আরবী ঘোড়া চেপে। ঘোড়াগুলো মাঝে মাঝে পা দাপায়, হ্রেষারব তোলে। নুড়ি-বিছানো রাস্তার ওপরে একাশিয়া গাছগুলোয় গোলাপী সাদা ফুলের ছড়া, মাঝে মাঝে বেগুনি জারুল। গত দু-দিন ক্রমান্বয় বৃষ্টি-বাদলার পর আকাশ ঘন নীল এবং এই সময়টা কলকাতার আকাশে ভাসন্ত সাদা মেঘ, মন্দ-মন্দ হাওয়ায় এক ধরণের প্রত্যাশা।

গির্জায় ঘণ্টা বাজে। ঈশ্বরকে তাঁর সৃষ্টির জন্যে ধন্যবাদ জানানো হয়। বর-কনে পাদরির সামনে দাঁড়িয়ে আংটি পালটায়, পরস্পর মুখচুম্বন করে। সেই পরম পবিত্র মুহূর্তে ম্যাকডাওয়েল ভাবলে সে জিতে গেছে। তার সমস্ত জিজীবিষাই আজ সার্থক। কোম্পানির ট্রেজারিতে তার নামে যে টাকা জমেছে, তা থেকে সুদই আসছে মাসিক পাঁচ হাজার পাউণ্ড। তাঁর স্ত্রীর হীরে-হজরত, কোনো বাসনাই অপূর্ণ থাকবে না। সুগন্ধ রুমাল বার করে কপালের ঘাম মোছে ম্যাকডাওয়েল। নববধূর দিকে চেয়ে চেয়ে গর্বে বুক ভরে ওঠে। তেইশ বছরের যুবতী পেলেও হয়ত নকরা-ছকরা পেত। আসলে জনৈক কাউন্সিল মেম্বরের তাকে ছিল মিস্। তবে কাউন্সিল মেম্বর আর বোর্ড অফ ট্রেডের সদস্যের মাঝখানে ব্যবধান ক্ষীণ, টাকাই আসল।

আর স্মিতহাসিতে উদ্ভাসিতমুখ মিস ক্র্যাফটন ভাবে, যাক, প্রায় দশ-এগারো মাসের অনিশ্চিতির ছেদ পড়ল। বরের চকচকে টাক সে আর ভাবে না, বয়সের পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়। নইলে চার্লস ম্যাকিনটশ, যে বরের সেকেণ্ড হয়ে একটু পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, তার মতো ছোকরাদের বিয়ে করে দারিদ্র্যের গলায় মালা পরানো ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তা ছাড়া—ম্যাকিনটশের দিকে আড়-চোখে চেয়ে মিস ক্র্যাফটন ভাবলে, জীবন তো পড়ে আছে।

কনেরা, কি হিন্দু বিয়ে কিংবা ক্রিশ্চান বিয়েতে, কি বিংশ শতাব্দীতে কি অষ্টা-দশ শতাব্দীতে, সর্বকালেই বায়বীয়। অসংখ্য ফ্রিল-আঁটা প্যারিসের বিখ্যাত এক দোকানের তৈরি এই গাউন সেই আশ্চর্য রূপকথার নায়িকায় পরিবর্তিত করে মিস ক্র্যাফটনকে। চার্লস ম্যাকিনটশ স্মরণ করে এই গাউনই জাহাজে চুরি যাওয়ায় তার মালিকানী কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল এবং ক্যাপ্টেন নর্টন এক চুরনী সহযাত্রিণীর প্যাঁটরা থেকে তা উদ্ধার করে। বাস্তবিক এই রূপকথার নায়িকা, এই সাদা ধবধবে পরীর সঙ্গে তার জাহাজের সহযাত্রিণীর একেবারে মেলে না। ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে কনের সঙ্গী মিসেস ডিকির দিকে চেয়ে চার্লস দ্বিতীয়বার অভিবাদন জানায়।

মিসেস ডিকি খলবল করে ওঠে। এতক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বিবাহের সমস্ত অনুষ্ঠান সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। কেউ কথা বলে উঠলে ঠোঁটের ওপর আঙুল চেপে 'শিষ!' 'শিষ!' শব্দে নৈস্তব্ধ্যভঙ্গের প্রতিবাদ জানাচ্ছিল, কিন্তু এখন বিবাহপর্ব সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠে, 'এ গ্রেট ডে। এ গ্রেট ডে ফর অল অফ আস্।' তার মাথায় এখন কদমছাঁট চুল। তার ওপর

বেগনি ভেল।

গির্জার ভিড়টা এবার বর-কনেকে ঘিরে ধরে। কাউন্সিল-সদস্য থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ফ্যাক্টর রাইটার কেউ বাদ যায়নি। 'ল্যাকি ম্যান! ল্যাকি ম্যান!' মেজর ফাউলার চেঁচিয়ে ওঠে। মিস ক্র্যাফটনের উদ্ভাসিত মুখ লক্ষ্য করে বরের বয়স্ক বন্ধুরা 'আমাদের সবাইয়ের হিংসে হচ্ছে' বলে রসিকতা করে। মিসেস ডিকি তার প্রকাণ্ড ভেল নাড়িয়ে বলে, 'তোমরা সবাই বুড়ো হয়ে গেছ, ম্যাকডাওয়েল এখনো ছোকরা।' একজন মহিলা ভিড়ের মধ্যে চেঁচিয়ে ওঠে, 'লুক অ্যাট হার গোল্ডেন কার্লস।'

বাইরে বারান্দায়, থামের এদিক-ওদিক ভারতীয় ব্যানিয়ান ব্যবসায়ীরা। যারা সকলেই ম্যাকডাওয়েলের কৃপাপ্রার্থী, তারাও অনেকে হাজির। ম্যাকডাওয়েলের চোখ কাকে যেন খোঁজে। তারপর তার ভুরু কুঁচকে ওঠে। ব্যানিয়ান গোকুল এগিয়ে এসে বলে, 'কৃষ্ণগোপাল আসেনি স্যার। আমি বলেছিলাম। কোনো কথা বললে না। লোকটা…'ম্যাকডাওয়েল হাত নাড়িয়ে তাকে থামিয়ে দিলে।

একাশিয়ার ডালে এক জোড়া মধুচুষকি এসে ডাকাডাকি সুরু করে। চার্লস ম্যাকিনটশ অন্যমনস্কভাবে ভাবছিল, তার ভাগ্য তাকে কবে এই গির্জায় সাদা ফ্রিল-আঁটা গাউনপরা এইরকম এক ধবধবে সাদা পরীর হাত ধরাবে। টাকা-পয়সার দুর্ভাবনা খানিক কেটেছে, কিন্তু সন্ধ্যের পর মনটা দমে থাকে। ভৃত্য-পরিবেষ্টিত হয়ে ম্যাডেরিয়া, ক্ল্যারেটের বোতল উড়িয়েও ঠিক শান্তি পাচ্ছে না। বিশেষ করে অনেকদিন পর মিস ক্র্যাফটনকে দেখে তার মন আনচান করে।

ম্যাকডাওয়েল এসে তার হাত ধরে বললে, 'ঠিক সন্ধ্যে সাতটা। একদম নড়চড় যেন না হয়। সারা রাতের প্রোগ্রাম।…অত চিন্তার কি কারণ আছে! কত বিনিদ্র রাত আমিও কাটিয়েছি, সবে তো সুরু। তোমারও ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। ভগবানে বিশ্বাস রেখো।'

'দেরি করবেন না কিন্তু, মিস ক্র্যাফটন তার দিকে চেয়ে মিষ্টি হেসে মাথা দুলিয়ে বললে।

'নিশ্চয়, দেরি হবে না।'

মিসেস ডিকি পিসিমার মতো বললে, 'চার্লসের জন্যে কিছু ভাবতে হবে না। আমার উপর ভার।' তারপর তার দিকে চেয়ে চোখ মটকে বললে, 'এই সব কমবয়সি বুড়োদের নিয়ে পারা যায় না।'

সেদিন সন্ধ্যায় লালবাজারে তৎকালীন বিখ্যাত হারমনিক ট্যাভার্ণ জমজমাট। গোল দেবদারু পাতার বিন্যাস, অজস্র গোলাপঝাড়, আতরদানি, সুগন্ধ জলের প্রস্রবণ, গড়ের বাদ্য, ট্যাভার্ণের আশেপাশে ভারীদের মাথায় আলোর ঝাড়; সবটা মিলেমিশে এমন-একটা উৎসব যা কলকাতায় বহু বছর হয়নি। আগে এই ট্যাভার্ণে যে-সব বড় বড় উৎসব হয়েছে, এমন-কি বছর দেড়েক পরে ওয়ারেণ হেস্টিংসের বিদায়কালে তাঁর বিশাল ভক্তবৃন্দের মানপত্রদানকালেও এত বড় কাণ্ড ঘটেনি।

মিস ক্র্যাফটনের অনাবৃত গলায় পায়রার ডিমের মতো মুক্তোর হার অনেক অভিজাত মহিলার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এমন-কি মাদাম ইম্‌হোপও বার-দুয়েক সেদিকে ভুরু কুঁচকে তাকায়। কেউ কেউ নিচু গলায় মন্তব্য করে, লুটের মাল। নবাব কিংবা মহারাজাদের অন্দরমহল ছাড়া এ ধরণের চিজ বড় চোখে পড়ে না। সবুজ কোটপরা হেস্টিংস কনের সঙ্গে কয়েক মিনিট নেচে আবার ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যায়। মাদাম ইম্‌হোপের চারপাশে ভক্তবৃন্দ। তার চোখ কোনো বিশেষ লক্ষ্যের ওপর নেই—নর্তক-নর্তকীদের মাথার ওপর দিয়ে ঝাড়-লণ্ঠনে কিংবা কোনো যুবকের মখমলের কোটের ওপর গিয়ে পড়ে। আশেপাশের সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে কখন কোন্‌ দিকে তার মাথা হেলবে, কোনো কোনো মহিলা সেই পরম মুহূর্তের প্রত্যাশায় ইতিমধ্যেই স্মিত-হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করেছে; কিন্তু মাদাম সে দিকে ফিরলেন না। আশে-পাশের প্রায় প্রত্যেক মুখেই হাসি জমাট বেঁধে থাকে এবং ক্রমাগত হাসির ব্যর্থ চেষ্টায় অকারণে মুখের পেশী-সংকোচনে কোনো কোনো পুরুষ বা মহিলাকে বেশ কুৎসিত দেখায়।

সম্প্রতি ইয়োরোপীয় মহিলাদের কয়েকটি দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর ট্যাভার্ণের কর্তৃপক্ষ তাদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছে। ঘণ্টাখানেক নাচের পরই গরমে কোনো কোনো মহিলা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। গত মাসে দুজনের মৃত্যুও ঘটেছে! কাজেই মিসেস ডিকির তত্ত্বাবধানায় ঘামে-ভেজা মিস ক্র্যাফটনকে পাশের ঘরে আনা হয়। সেখানে কয়েকজন জোয়ান পাংখাওয়ালার ব্যবস্থা, তারা সজোরে তাদের পেশীবহুল হাতে হাওয়ার ঝড় তোলে। আরো কয়েকজন মহিলার সঙ্গে কেবল এক টুকরো জাঙিয়া পরে মিস ক্র্যাফটন বিশ্রাম নেয়। আবার এক প্রস্থ ওডিকোলন ফরাসী সেণ্টে চাপুর-চুপুর হয়ে জামা-কাপড় পাল্টে তারা নাচের আসরে নামে।

ওদিকে পুরুষদের টেবিলে ফটাফট মদের বোতল খোলা হতে থাকে। ফাউলার এগিয়ে এসে ম্যাকিনটশের পিঠে এক থাপ্পড় কষে বললে, 'শুনছি, তোমার এখন রেভোলিউশন উড়ে গেছে। হতে বাধ্য। আমি তোমাকে বলেছিলাম না, গোড়াতে আমরা সবাই থাকি রেভোলিউশনারি, তারপর আমরা মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতে শিখি!'

'ভারতবর্ষের মাটিতে বড্ড কাদা', চার্লস বললে।

'তা অবশ্য, তা অবশ্য! ঠিক বলেছ, হা-হা! চমৎকার বলেছ', ডাচ ক্লারেটের গেলাস উপুড় করতে করতে বললে, 'শুনেছ ম্যাক, চার্লস কি বলছে, বড্ড কাদা ভারতবর্ষের মাটিতে, হা-হা!'

ম্যাকডাওয়েল বললে, এ চার্লস সে চার্লস নয়। এখন ও অনেক পারপাসফুল'। ইতিমধ্যেই ও স্লেভ-ওয়্যারহাউসে যেতে সুরু করেছে।'

'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!'

কাউন্সিলের একজন ঢ্যাঙা সদস্য কিঞ্চিৎ বয়স্থ। চারপাশ একবার দেখে তার সঙ্গীকে বললে, 'গভর্ণর-জেনারেলের নতুন সার্কুলারটা দেখেছ? একেবারে যাচ্ছেতাই। তোমরা কেউ রাজা-মহারাজা-নবাবদের কাছ থেকে উৎকোচ নেবে না, কারণ জন কোম্পানির সুনাম ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। আরে শালা, তোর মাদামের গলায় যেটা ঝুলিয়েছিস, উৎকোচ ছাড়া সেটা সম্ভব হত?

পাশ থেকে একজন ফুঁসে উঠল, 'ইংল্যাণ্ডে নেই? সুইস আর টোরি পার্টির সব কটাই তো চোর। সবাই দেশে বসে কমিশন খাবে তলে তলে, আর করাপশানের নামে চেঁচাবে।'

একজন নিচু গলায় বললে, 'ব্রাইডের গলায় মুক্তোর ছড়াটা দেখেছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঢ্যাঙা কাউন্সিল-সদস্য বললে, 'ম্যাকডাওয়েল সত্যিই লাকি। সব রকমই সে করলে জীবনে। করাপশানের রাজা। এখন করাপশান ঠেকাবার কমিটির চেয়ারম্যান। ভাবলাম, অন্ততঃ একটা দিক বাদ যাবে। নেটিভ বাইজীদের নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে, তেমনি কাটবে। এদিকে তেইশ বছরের...'

ফাউলার বললে, 'আমরা তো স্যার জানতাম, মিস ক্র্যাফটন আপনারই বাগদত্তা।'

'শাট আপ! ইউ আর এ স্কাউণ্ড্রেল!'

ফাউলার পাশের চেয়ার উলটিয়ে ঘুঁষি পাকিয়ে এগিয়ে আসে। বেয়ারারা বোতলগুলো হাতের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। আশেপাশের লোকজনরা কোলাহল করে এগিয়ে আসে। মিসেস ডিকি আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেজর!

ডোণ্ট বি সিলি !'

মেজর গম্ভীর গলায় বললে, 'হয়, তুমি তোমার কথা উইথড্র কর অথবা আমার আত্মসম্মানের জন্যে সামনের সোমবার...'

ঠিক আছে, আমি অ্যাকসেপ্ট করছি।'

এদিকে যখন ডুয়েলের সব ঠিকঠাক হচ্ছে, তখন ওদিকে চার্লস ম্যাকিনটশ নববধূর সঙ্গে নাচতে নাচতে বললে, 'তোমাকে ঠিক পরীর মতো লাগছে। আমি কল্পনা করতে পারছি না, তুমি আমার একই জাহাজের সহযাত্রিণী ছিলে। যা মহার্ঘ, তা অনেক সময় মানুষের চোখ এড়িয়ে যায়, তাই না ?'

নববধূ মিষ্টি হেসে বললে, 'দুষ্টুমি কোরো না চার্লস।'

গলায় আবেগ নিয়ে ম্যাকিনটশ বললে, 'ম্যাডাম, মনে রেখো তোমার অসংখ্য ভক্তের মধ্যে আমিও একজন।'

দাঁতের মাজনের বিজ্ঞাপন উছলে ওঠে নববধূর হাসিতে, 'তুমি প্রধান চার্লস, তুমিই প্রধান।'

ম্যাকিনটশ অভিভূত হয়ে একদৃষ্টিতে তার সঙ্গিণীর চোখে কোন সুদূর ইশারা খোঁজে, কিন্তু তার চেষ্টা ব্যাহত হয় মাঝপথে। একজন লম্বা-চওড়া রাশভারী লোক, হেস্টিংসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, রিচার্ড বারওয়েল এসে নববধূকে অভিবাদন জানায়। চার্লস ম্যাকিনটশ সরে দাঁড়ায়। বারওয়েল নববধূর সঙ্গে নাচ সুরু করে।

ম্যাকডাওয়েল তার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ানো ভক্তবৃন্দের দিকে চেয়ে বললে, 'না, না, তোমরা বড্ড বেশি বলছ। আমি কে? এখন পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ভারতের আকাশে কেন, এশিয়ার আকাশে নতুন সূর্য হয়ে উঠেছে। কে সেই মানুষ, আমরা সবাই জানি।'

ভিড়ের একটু দূরে হেস্টিংসের সবুজ কোট মিলিয়ে যায়। 'আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, আমার সমস্ত কাজের চিন্তার পেছনে আছেন এই মানুষটি। নিজেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে দিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষের ভাগ্য নিজের মুঠোর মধ্যে ধরে বসে আছেন এইরকম একজন লোক আমাদের এই ঘরের মধ্যেই এই মুহূর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ কথা ভাবতেই আমি রোমাঞ্চিত হই।'

'হিয়ার! হিয়ার!' সমস্বরে চিৎকার ওঠে।

'আমার শুধু এইটুকু কাজ। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির অর্থনৈতিক বনিয়াদ দৃঢ় করা। আমি কুণ্ঠিত নই, লজ্জিত নই আমার অতীত সম্পর্কে। আমার

বাবা লণ্ডি চালাতেন। শুনেছি, ইংল্যাণ্ডের কোনো কোনো কাগজে ঠাট্টাও বেরিয়েছে, কিন্তু আপনারা ভেবে দেখুন, আমরা কি সেই পুরনো কুসংস্কার —রাজার ছেলের রাজা হওয়ার কথাই ভাবব? আমি আজ পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ মানুষের সেবক, এইটাই আমার সবচেয়ে বড় পরিচয় নয় কি? কিছু লোক দূরে দাঁড়িয়ে কেচ্ছা বরাবরই কাটে। তাদের দিয়ে ইতিহাস তৈরি হয় না। ইতিহাস আমরা তৈরি করি।'

আবার 'হিয়ার, হিয়ার!'

'সবচেয়ে সুখবর, আমরা এক নতুন বিপ্লবের সামনে। ইংল্যাণ্ডের তৈরি কটন পিস গুডস ক্যালিকো আমদানি হতে সুরু করেছে। এই কোটি কোটি ভারতবর্ষের লোক বার্মিংহাম ম্যাঞ্চেস্টারের ক্যালিকো পরে জীবন কাটাচ্ছে— ভাবতেই আমার গা রোমাঞ্চিত হয়। ইউনিয়ন জ্যাকের এইটাই সবচেয়ে বড় অবদান, ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক উত্থান। এর পর ইংল্যাণ্ডকে ঠেকায় কে? এশিয়া, আফ্রিকা—সর্বত্র আমাদের জয়যাত্রা।'

ম্যাকডাওয়েল কপালের ঘাম মুছে গেলাস খালি করে।

এবার খাবারঘরে অতিথিদের ডাক পড়ে। সুপ-পর্ব সমাপ্ত হবার পরই বাবুর্চিরা থরে থরে খাবার নিয়ে আসে। খাসি, গরু, মুর্গি, তিতির, খরগোশ, শুকর, ময়ূর, কিছুই বাদ যায়নি। কোনো কোনো ডিশ যথেষ্ট মসলা-সহযোগে মোগলাই কায়দায় তৈরি, কিন্তু অতিথিরা ঘামতে ঘামতে এবং ঝালের জন্যে মাঝে মাঝে হু, হা করে তাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে থাকে। পেস্তা, বাদাম, আখরোট, খেজুর, আঙুরের পাহাড়, এগুলো বেশির ভাগই বাণিজ্য-তরীতে আরব-পারস্য থেকে আনা। দলে দলে বাবুর্চিরা ভরা প্লেট হাতে প্রবেশ করে এবং খালি প্লেট তোলে। কোনো কোনো অতিথি ভুঁড়ির বোতাম আলগা করে, কেউ গলার বো টাই। গল গল করে ঘামতে ঘামতে গপ্ গপ্ করে গেলায় কেউ বিশেষ আত্মসচেতন নয়। চার্লস ম্যাকিনটশের ময়ূর খাবার বাসনা এতদিনে পূর্ণ হল। দমদমের কাছেই তখন পাখিওয়ালারা জাল দিয়ে ময়ূর ধরত এবং শয়ে শয়ে কলকাতার টেবিলে চালান যেত। রোস্ট খরগোশ খেতে খেতে মিসেস ডিকি নিচু গলায় চার্লসকে বললে, ডেলিশাস!' তারপর নেটিভ বাবুর্চিদের প্রশংসায় বললে, 'সত্যি, ওরা জাদু জানে।'

'বাবুর্চিরাই ইণ্ডিয়ার সবচেয়ে গুণী লোক', ফাউলার বললে।

লম্বা হলে পাঁচটা বড় বড় বেলোয়ারি ঝাড়ে অজস্র মোমবাতি এবং দেয়ালে

দেয়ালে মানুষ-সমান আয়নায় তা প্রতিবিম্বিত, রোশনাইয়ে ঝলমল করে চারদিক, কিন্তু গরম হয় প্রচণ্ড। দেয়ালে গা-লাগানো নিশ্চল মূর্তিগুলোর অল্প অল্প হাত নড়ে, পাছে হাওয়ার ঝাপটায় আলো নেভে। মিষ্টি মনাক্কা-পোরা মুর্গির স্যুইট ডিশ এগিয়ে দিয়ে ম্যাকডাওয়েল নববধূকে বললে, 'ডার্লিং, এটা বিশেষ করে তোমার জন্যে।'

'আমি তো বলছি আর পারছি না', বলে এক পিস্ কেটে তুলে নিলে নববধূ।

গলা বাড়িয়ে মুখ নিচু করে ম্যাকডাওয়েল বললে, 'আমি খালি ভাবছি কখন এই হৈ-হল্লা শেষ হবে, কখন কেবল নির্জনে তোমাকে একা পাব।'

'আমিও তাই ভাবছি ডার্লিং।'

তারপর চুলের সোনালি গুচ্ছ মাথা ঝাঁকিয়ে সরিয়ে বললে, 'আমি ভাবছি কখন গভর্ণর জেনারেল আর মাদাম চলে গেলেন।'

'এইটাও আশ্চর্য। বোধ হয় গ্রেটনেসের লক্ষণ। সকলের সঙ্গে থেকেও সে আলাদা।'

'তোমাকে বলে যায়নি ?'

হ্যাঁ, নিশ্চয়' এবং মাদামও জানিয়েছেন তোমাকে বলতে। তুমি তখন বারওয়েলের সঙ্গে নাচছিলে।'

'আমি খুশি হতাম যদি মাদাম ইম্হোপ আমাকে সরাসরি বলে যেতেন।'

ম্যাকডাওয়েল অঘাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তার তরুণী ভার্যার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধাও জন্মায়। নিচু গলায় বললে, 'তোমার সঙ্গে মাদাম ইম্হোপের অনেক মিল আছে চেহারায়, আচরণে।'

'আমি আর-যাই করি, জাহাজে নার্সিং করে দ্বিতীয় নম্বর স্বামী পাকড়াও করিনি।'

ম্যাকডাওয়েল বিহ্বলভাবে বললে, 'ঠিক, ঠিক। জুন, তুমি সত্যিই আনকোরা, এভাবে তো আমি কখনো ভাবিনি।'

তুমি ডার্লিং, কটন পিস গুড জানো, আফিং জানো, স্লেভ জানো, ইণ্ডিগো জানো, নারীর মন কতটুকু জানো ?'

'সত্যিই ঠিক বলেছ জুন। নারীর মন। বাকি জীবনটা তোমার সাহচর্যে এই নারীর মনটা খুঁজতেই কাটিয়ে দেব।'

নববধূর চোখ হঠাৎ তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে, 'ঠাট্টা করছ ?'

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকডাওয়েল কুঁচকে যায়, 'কি যে বলো, কি যে বলো জুন,

তোমাকে আমি ঠাট্টা করতে পারি !'

এবং সে এই প্রথম টের পায়, গভর্ণর-জেনারেলের চেয়েও তার একজন ওপর-ওয়ালা আছে, যে তার সমস্ত চুলচেরা বিশ্লেষণ করবে, তার কোন্‌টা উচিত, কোন্‌টা অনুচিত স্থির করে দেবে। তার বিগত পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনতার স্মৃতি তাকে এই মুহূর্তে বিষণ্ন করে তোলে।

এবার দলে দলে হুঁকোবরদাররা আসতে সুরু করে, সঙ্গে সোনার ফুলতোলা রুপোর গড়গড়া। লম্বা লম্বা রুপোলি সাপ নিয়ে যখন তারা একজন একজন করে ঢোকে, তখন কেউ সেদিকে ফিরেও তাকায় না। বস্তুতঃ আশেপাশে ভারতীয় নফরদের অস্তিত্ব সম্পর্কে কেউ সামান্য সজাগ নয়।

ডক্টর ডিকি তার হুঁকোবরদারের প্রসারিত হাত থেকে রুপোলি নলটা মুখে দিয়ে আরামে টানতে টানতে ফাউলারকে বললে, 'এ ব্যাটাকে চিনতে পারছ ?'

ফাউলার বিরক্ত চোখ কুঁচকে পেছন ফিরে তাকায়।

'আরে, নবগ্রাম থেকে তোমাদের আনা সেই স্লেভটা। গোটা লট কিনে আমরা ভাগ করে নিয়েছি। দারুণ শেপ করেছে। তুমি বলছিলে না, ইণ্ডিয়ান বাবুর্চির কথা। ইণ্ডিয়াতে চাকরও মাঝে মাঝে দারুণ পাওয়া যায়। ব্যাটার গান-বাজনার খুব শখ। ইণ্ডিয়ানে ফ্লুট বেশ বাজায়। অবশ্য আমি ওদের সুর-টুর বুঝি না। ভাবছি নিলামে একটা ফ্রেঞ্চ হর্ণ কিনে দেব। ফ্রেঞ্চ হর্ণ তো এখন স্ট্যাটাস সিম্বল ? তাই না ?'

ঠিক এই সময় ঘটনাটা ঘটে, কিংবা ঘটতে ঘটতেও ঘটে না। কুলকুল করে ঘামতে থাকে ম্যাকডাওয়েল, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে এবং মাংসখণ্ডসমেত কাঁটাখানা ঠং শব্দে প্লেটের ওপর গিয়ে পড়ে, কিন্তু সেই মুহূর্তে তার পাশে বসা ডক্‌টর ডিকির সঙ্গে মেজর ফাউলারের উত্তেজিত আলোচনা চলছে।

আমি তোমার সঙ্গে একমত মেজর, ইণ্ডিয়ান ব্যবসায়ীরা এক একটা শয়তান, কিন্তু কিছু কিছু লোককে আমাদের বিশ্বাস করতেই হবে, ঝুঁকি নিয়েই করতে হবে। তা ছাড়া আমাদের উপায় নেই।'

ওটা তোমার ডিকিটিস্ট কথা ডাক্তার। আমাদের ছেলেরা চান্স পাচ্ছে না, আর এই-সব বাঙালি বেনেদের আশকারা দিয়ে মাথায় তোলা হচ্ছে।'

ডক্‌টর ডিকি মাথা নেড়ে বললে, 'দ্যাখো, স্বজাতি-প্রীতিতে আর-কারুর চেয়ে আমি কম যাই না, কিন্তু ব্যবসা জিনিসটা অভিজ্ঞতার ব্যাপার।'

তাই বলে তুমি কৃষ্ণগোপালের মতো একজন দাম্ভিক শয়তানকে বিশ্বাস করবে? ওরা তলায় তলায় ফরাসী, ডাচ, সকলের সঙ্গে হাত মেলাতে তৎপর।'

'তুমি তো জানো মেজর, যুদ্ধে ব্যবসায় এবং স্ত্রীলোকের ক্ষেত্রে কোনো আইন নেই। আমরাও যখন যার সঙ্গে সুবিধে, হাত মেলাই।'

'রবিন্স বলে যে ছোকরাটাকে পাঠিয়েছিলাম, তাকে তোমার বন্ধু ম্যাকডাওয়েল না করে দিয়েছে।'

'ঠিকই করেছে। তুমি তো নিজেই জানো, রবিন্স একেবারে ছ্যাঁচড়া পার্টি, কোম্পানির কাছ থেকে অ্যাডভান্স পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে টাকা ফুঁকে দিয়ে জাহাজে উঠবে।'

ফাউলার বললে, 'না, না, অতখানি অবিশ্বাস করার কারণ নেই। আমরা সবাই টাকা রোজগারের ধান্দায় এসেছি। সবাই আমরা অ্যাডভেঞ্চারার, রবিন্সকে দোষ দিয়ে কি লাভ?'

'দ্যাখো, এই-সব এঁড়ে তর্ক করে কি লাভ? কৃষ্ণগোপালের এজেন্সি আমরা কেটে দিয়েছি, কিন্তু আমরা নিজেরাই জানি, যার হাতে দেব, সেই আমাদের স্বদেশবাসীর ওটা কম্ম নয়। শেষ পর্যন্ত আবার কৃষ্ণগোপালের দোরে যেতে হবে।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'বোধ হয় এ রকমই চলবে আরো বিশ-তিরিশ বছর, অন্ততঃ এই সেঞ্চুরিটা, তারপর ব্রিটিশ শাসনটা আরো থিতবে, আমরা তখন আর দিশি জিনিসের এজেন্ট হয়ে আমদানি-রপ্তানি করব না। ইংল্যাণ্ডের তৈরি মালে ভারতবর্ষের বাজার ফ্লাড করে দেব। তখন হয়ত আমাদের অর্গানাইজেশন আরো তৈরি হয়ে যাবে। তখন আর দরকার হবে না এই-সব কৃষ্ণগোপালদের মতো দাম্ভিক নেটিভদের।'

ওদিকে নববধূর পাশে বসা বারওয়েল বললে, 'তোমার গলায় যে মালা দুলছে, তা অযোধ্যার বেগমকেও লজ্জা দেবে। সত্যিই অপূর্ব লাগছে তোমাকে। ম্যাকডাওয়েলের রুচিজ্ঞানের আমরা সব সময় তারিফ করি।'

তারপর আখরোট ভাঙতে ভাঙতে বললে, 'তুমি খুব আপনার লোক ভেবেই বলছি, ম্যাকডাওয়েলের মতো লোক আমাদের এখন সবচেয়ে বেশি দরকার। গভর্ণর-জেনারেলের হাত যারা জোরালো করতে পারে, এ রকম এফিশিয়েন্ট লোক হাতে গোণা যায়। ম্যাকডাওয়েল তাদের প্রথম সারিতে। তোমার হাতেই তার ভবিষ্যৎ।'

এই-সব রাশভারী বক্তব্যের ঠিক মর্ম উপলব্ধি করার মেজাজ বোধ হয় নববধূর

ছিল না। মিষ্টি হেসে বললে, 'তোমার ডায়মণ্ড টাই-পিনটা আশ্চর্য সুন্দর!' ঠিক এমন সময় ঠং করে আওয়াজ হয়, কিন্তু, চারপাশের কোলাহল অট্টহাসিতে তা চাপা পড়ে যায়।

'জান তো, আমাদের গভর্ণর-জেনারেল একজন উঁচুদরের কবি? কবিদের মতোই সে মেয়েদের মনের খবর রাখে।

'রিয়ালি?' এবার কৌতূহল খেলে তরুণীর চোখে।

এমন সময় 'গড সেভ্ দ্য কিং' বলে সমস্বরে কয়েকজন পুরুষ গান গাইতে থাকে। ম্যাকডাওয়েলের মাথা ঝুঁকে পড়েছিল সামনের দিকে। ধীরে ধীরে সে যেন বহুদূরের সমুদ্রগর্জন শোনে। প্রায় মিনিট-দুয়েক বোধ হয় চৈতন্য হারিয়েছিল এবার ধড়মড় করে সোজা হয়ে উঠে বসে। তারপর আখরোট ভাঙতে ভাঙতে সেও নিচু গলায় গান গাইতে থাকে। আড়চোখে তার নববধূর দিকে তাকায়। সেই মুহূর্তে বারওয়েলের রসিকতায় সে তখন উচ্চস্বরে হেসে উঠল।

রাত একটায় অতিথিরা একে একে বেরিয়ে আসে। বাইরে ম্লান জ্যোৎস্না-লোকিত খোয়ার রাস্তা। অতিথিদের কেউ কেউ আনন্দধ্বনি তোলে, 'থ্রি চিয়ার্স ফর ম্যাকডাওয়েল, হিপ্ হিপ্ হুররে।' মাকডাওয়েল টলমল করতে করতে কোচবক্সে গিয়ে ওঠে, পাশে নবপরিণীতা।

ডক্টর ডিকি হেসে বললে, 'কেমন লাগছে ম্যাক?'

'ফাইন, ফাইন!' সজোরে দুই ঘোড়াকে চাবুক কষিয়ে দেয় ম্যাকডাওয়েল। একটার পর একটা গাড়ির চাকায় চন্দ্রালোকিত লালবাজারের রাস্তা মুখর।

চার্লস ম্যাকিনটশের সে রাত্তিরে নতুন অভিজ্ঞতা। মত্ত অবস্থায় ক্লোকরুমে ঢুকতে-না ঢুকতেই একসঙ্গে অনেকগুলো পুরুষের হাত তাকে বেড়ে ধরে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তার আঁটসাট মখমলের জামার বদলে হাল্কা সিল্কের পাজামা, কামিজ গায়ে উঠে আসে। বিছানায় আসতে-না-আসতেই আর এক জোড়া হাত তাকে জড়িয়ে ধরে। এ দুটো হাত কি মিস ক্র্যাফটনের? এ রকম চিন্তা মনে হতে না-হতেই চড়া আতরের গন্ধ নাকে আসে। তার মানে গহরের বোন? ম্যাকডাওয়েল সত্যিই গ্রেট।

'গহরস সিস্টার?'

উত্তর-ভারতীয় ফর্সা মুখখানা চকচক করে। সুরমা-মাখা চোখ নামিয়ে তরুণী বললে, 'ছোড়ো, সাব, ছোড়ো, বাত ছোড়ো, কাম করো।'

'ইউ আর এ বীচ।'

ইংরেজি-অনভিজ্ঞ গহরের বোন প্রতিধ্বনি করে, 'ইউ আর এ বীচ।'
চার্লস বললে, 'আই অ্যাম এ ডগ।' সবলে সে গহরের বোনকে আকর্ষণ করে।

8

'দেবীদি, সব্বোনাশ হয়েছে', রূপী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললে।
দেবী গডফ্রে ঠোঁট দিয়ে ফিতে চেপে টান করে কাঁচা-পাকা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে উদাসীকণ্ঠে বললে, 'সব্বোনাশ তো এখনো কিছু হয়নি মা, সব্বোনাশের দিন তো পড়ে আছে।'
শান্তিপুরের কাছে পাথরপুকুরগ্রামের মেয়ে দেবী। পনেরো বছর বয়সে গ্রাম ছেড়েছে মন্বন্তরেরও অনেক আগে। তারপর আর গাঁয়ে যায়নি, কিন্তু সাহেব-সুবোদের সঙ্গে এতদিন ঘর করেও তার মিঠে বাংলাটা মরেনি।
'সব্বোনাশের আর কি বাকি আছে দেবীদি, সেই যে ফুলকাটা সুপ-প্লেটখানা সাজানো থাকে মোমবাতির পাশে, সেটা আমার হাত লেগে পড়ে ভেঙে গেছে।'
'তুই মরবি রূপী। কাপড় খুলে তোকে চেলাকাঠ দিয়ে পিটবে।'
'কাপড় খুলে?' আতঙ্কে চোখ বড় বড় করে বললে।
'হ্যাঁ মা, নইলে লাগবে কেন?'
রূপী ধুপ করে বসে বললে, 'তুমি কেমন যেন দেবীদি। মাঝে মাঝে সত্যিই তোমাকে দিদির মতো লাগে।'
ফিতে দিয়ে চুল বাঁধতে বাঁধতে দেবী বললে, 'বাঁদীর কোনো ভাইবোন নাই। সন্তানও নেই।' তীক্ষ্ণচোখে আয়নায় চোখ বুলিয়ে নেয়, দু-একবার ঘাড় এদিক-ওদিক করে।
ভয়ানক ধোঁয়া আসছে চারদিক থেকে। ডক্টর ডিকির এই ভৃত্যাবাস তার দু-বিঘে বাগানের এক কোণে। এক চিলতে কাঁচা উঠোনের সামনে লম্বা ব্যারাকের মতো একতলা কয়েকখানা ঘর। ভৃত্যাবাসের গায়েই রান্নাঘর, সেখান থেকে কাঁচা কয়লার ধোঁয়া গলগল করে আসছে। ম্লান চাঁদনিতে ডক্টর ডিকির উনিশজন ভৃত্য ঘোরাফেরা করে। এইমাত্র টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে গড়গড়া-হাতে কানাই বেরিয়ে গেল বাড়ির দিকে। ধোঁয়ার ভেতর থেকেও টের পাওয়া যায়, রকমারি বাতিদান ছাই দিয়ে সাফ করছে জগা আর জগদীশ। রূপী

আসায় আগে আরো তিনজন স্ত্রীলোক ছিল, তারা চুঁচুড়োয় ডাচ গভর্ণরের প্রাইভেট সেক্রেটারির বাড়িতে চড়া দামে বিক্রি হয়েছে।

'তুমি মাঝে মাঝে বলেছ, নিজের কথা বলবে দেবীদি', রূপী বললে।

'এই তো বললাম, বাঁদীর সন্তান নেই, স্বামী নেই, বাবা, মা নেই, ভাই, বোন নেই।'

'সে বাঁচবে কেমন করে দেবীদি?'

কাঠের পা আঁটা আয়নাটা সরিয়ে রেখে লম্ফটা ঠেলে দেয় দেবী মুখের সামনে থেকে। তারপর অস্পষ্ট চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে চুপ করে থাকে।

'কথা বলছ না যে?'

'আমি তো বেঁচে আছি রূপী, আমি তো মরিনি।'

আবার সে চুপ করে থাকে। যেন কথার কোনো মানে নেই, কথা দিয়ে কিছুই করা যায় না, এমন কি বলাও যায় না।

'আমাকে দেখে মনে হয়?' হঠাৎ যেন একটা ঘুমন্ত মানুষ জেগে ওঠে। 'আমাকে দেখে মনে হয়, আমি এগারোটা সন্তান জন্ম দিয়েছি? অবশ্য বাঁচেনি। একটা মরা ছেলে জন্মায়, পাঁচ-ছটা ছেলেবেলাতেই মরে। তিন ছেলে আর এক মেয়ে বেঁচেছিল। কাউকেই ধরে রাখতে পারিনি নিজের কাছে।

'কোথায় গেল তারা?'

আবার চুপ মেরে যায় দেবী গডফ্রে। 'আমার বাবা আমায় স্বেচ্ছায় বেচে দেয় তিন টাকায়। প্রথমে এক বুড়ো আর্মেনিয়ান বেনে, রাত্তিরে আমাদের লোহার খাঁচায় পুরে রাখত, এক-একদিন মনে হত, দমবন্ধ হয়ে মরে যাব। পায়ের বেড়ি থেকে একটা ঘা হয়েছিল, কত বচ্ছর লেগেছিল শুকোতে।'

'তোমার ছেলেমেয়েরা কোথায় গেল?'

'সেখানে আমার পেটে প্রথম সন্তান এল। কার ছেলে জানি না, জানবার কথাও নয়। মরা ছেলে প্রসব করলাম। এমন রোগে ধরল, মনে হল আর বাঁচব না, কিন্তু ঠিক বেঁচে গেলাম।'

রূপী স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। সে কল্পনা করে তার জীবন—স্বামী নেই, সন্তান নেই, আপনার বলতে কেউ নেই।

'ডাক্তার সাহেব ভালো লোক। আমার শেষ চারটে ছেলেমেয়ে ডাক্তার সাহেবের। তবে ডাক্তার আমাকে মারেনি। আমিও কাজ দিয়েছি। আমার ঐ চারটে ছেলেমেয়ের দাম পেয়েছে ডাক্তার এগারো শ টাকা।'

অজান্তেই রূপীর গলা দিয়ে বেরোলো, 'এগারো শ ?'

'হবে না ? ছোট ছেলেটা দেখতে-শুনতে, কাজে একেবারে ওস্তাদ। সবরকম রাঁধতে পারে, মোগলাই, ইংলিশ, ফ্রেঞ্চ। একটা লম্বা ফ্রেঞ্চ সাহেব কিনে নিলে বাড়িতে এসে। দাম দিয়েছে সাড়ে চার শ টাকা। ডাক্তার সাহেব কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। যে দাম সেই, এক পয়সা কমায়নি।' দেবী গডফ্রের গলায় সন্তানের গর্ব।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে শুরু করেছে। এতক্ষণে ধোঁয়ার জাল কেটে গিয়ে উঠোনে ধবধবে চাঁদের আলো খেলে। পাঁচিলের গায়ে কলাবনের শোভা বাড়ে! 'আমি পালাব দেবীদি।'

'আমিও পালিয়েছিলাম। কোথায় পালাব ? একটা দোকানওয়ালা আমাকে ধরিয়ে দিল। বেশিদূর যেতেও পারিনি। ম্যাজিস্টার সাহেব আমায় কুড়ি ঘা বেত মারার হুকুম দিলে। আমার তখন রক্তের জোর ছিল। ইংরেজ ম্যাজিস্টার আমায় বললে, 'তুমি খুব গর্হিত কাজ করিয়াছো—তুমি তাহা মানো ?' আমি মাথা নাড়িয়ে বললাম, 'আমি ঠিক করেছি সাহেব।' আমাকে হুপিং হাউসে নিয়ে গেল। দশ ঘা খাবার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। তখন জল ছিটিয়ে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আরো দশ ঘা দিল। এখন অন্ধকারে দেখতে পাবি না। কাল সকালে দেখাব মারের দাগ।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'তোর কাছেও আসবে।'

'আমার কাছে' ? আতঙ্কে রূপীর চোখ বড় হয়ে যায়।

'তুই কি ভাবছিস, মেমসাহেবের নেড়ামাথায় ভেল আঁটার জন্যে, তার গা টেপার জন্যে, তোকে শুধু রাখা হয়েছে ? তবে জগাকে সাবধান। আমি বুঝতে পারছি, জগা তোকে তাক করছে। জগা কিছু করলে আমায় বলিস।'

রূপী গুম হয়ে থাকে। ক্রীতদাসী-জীবনের চেহারা এতদিন আবছা ছিল। এবার ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে।

বেশ চেপে ঠাণ্ডা পড়ছে। দোর ভেজিয়ে দিয়ে মোটা চটখানা বাড়িয়ে দেবী বললে, 'তুই যখন এলি তখন তো কাঠির মতো ছিলিস। আর এখন ?'

রূপী লম্ফের আলোয় তার সুঠাম হাতের দিকে চেয়ে থাকে।

'এখন বুঝতে পারছিস না, সারা গায়ে তোর যৌবনের ঢল নেমেছে। এখন থেকে আশেপাশে যত মাছি তোর গায়ের ওপর ভন্ ভন্ করে উড়বে।''

রূপী বললে, 'তোমার কথা শুনে দেবীদি, আমার গা ঘোলাচ্ছে।'

দেবী গডফ্রে বাটা থেকে পান বার করে নিজে একটা পান খেয়ে বাটা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'একটা পান খা।'

রূপী না করায় খুট করে পানের বাটা বন্ধ করে বললে, 'তোর ভয় নেই, তোকে খৃীস্টান বানাবে।'

'আমি যেমন আছি, তেমনি থাকব।'

'আরে খৃীস্টান হলে কি তোর ডানা গজাবে? এইরকম থাকবি। তবে একটু সুবিধে হয়, জগা, জগদীশ, এরা একটু ভয় পায়। সবাই জানবে, তুই সাহেবের লোক, কিছু করার আগে একবার ভাববে।'

'তোমার কাছে বিষ আছে, দেবীদি?'

'তুই এত ভাবছিস কেন রূপী, এত ভাবছিস কেন? আমার দিকে চেয়ে দ্যাখ না। কতবার ভেবেছি, মরে গেলেই ভালো ছিল। রোগে পড়েছি। এক একটা ছেলে মরেছে অচিকিৎসায়, আর মরা ছেলে নিয়ে যিশুর কাছে বর চেয়েছি, আমাকে মৃত্যু দাও।'

রূপী গায়ের কাপড়টা মুড়িসুড়ি দিয়ে বসে বললে, 'আচ্ছা দেবীদি, খৃীস্টান হওয়াটা কেমন?'

'খৃীস্টান হওয়াটা আর কিছুই না, এই হিন্দু হওয়ারই মতো। সাহেবরা বলে, অদ্ভুত একটা কিছু। একটা উঁচু বড় বাড়ী, একজন বলে দেউল, মন্দির, একজন বলে গির্জে। সেই ফুল দেয় ঘণ্টা, বাজে। আর সব ভালো ভালো কথা বলে, যেগুলো কেউ মানে না। সবাই বলে আমরা পাপী, যিশু আমাদের ত্রাণ করবে, কিন্তু নরকের ভয় থাকলে কি ব্যবসা করা যায়? নরকের ভয় থাকলে কি সাহেবরা মাঝ রাতে বাঁদীর ঘরে এসে ওঠে? ভালো কাজ মানুষের করা উচিত, এ কথাটা বুঝবার জন্যে বাইবেলেরও দরকার হয় না, গীতারও দরকার পড়ে না। এবার একটা পান খা, নে।'

'দাও', বাটা থেকে একটা পান তুলে নেয় রূপী।

এমন সময় কানাইয়ের গলা পাওয়া যায়, 'রূপী, রূপী, তোকে মেমসাহেব ডাকছে, এখানে বসে কী করছিস?'

পাতলা হাসির রেখা ফুটে ওঠে দেবী গডফ্রের ঠোঁটে। 'তোর কানাইটা একদম ভেড়ুয়া বনে গেছে।'

রূপী উঠে পড়ে বললে, 'ওরকম বোলো না দেবীদি। ও আমাকে ভালোবাসে, সেইজন্যেই বলছে।'

'ওরকম ভালোবাসা আকছার পাবি। আকছার! ভালোবাসায় বিশ্বেস করিস না। একেবারে ঠকে যাবি।'
রূপী ফিরে বললে, 'ভালোবেসে ঠকতে রাজি আছি দেবীদি, কিন্তু আমি ঘেন্নার মধ্যে বাঁচতে পারব না।'

রূপী ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই বিবসনা স্থূলাঙ্গিণী মেমসাহেব ঠাঁই করে রূপীর গালে চড় কষিয়ে দিল। বৃদ্ধা পরিচারিকা তাকে করসেট পরাতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে ফেলেছে। ঘেমে নেয়ে মেমসাহেব হাঁপাচ্ছে। রাগে লাল হয়ে ইংরেজিতে গাল পাড়তে লাগে রূপীকে দেখবার সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু মাঝে মাঝে শূয়ারকা বাচ্চা কথাটি ছাড়া আর কোনো কথা হৃদয়ঙ্গম হয় না।
রূপীর গাল জ্বলছিল, কিন্তু সে করসেটের ফিতে হাতে নিয়েই কষে বাঁধতে থাকে। পরিচারিকা প্রাণপণে হাওয়া করে, কিন্তু এই তাল তাল মাংস কোথায় বাঁধবে বুঝতে না পেরে রূপী দিশেহারা বোধ করে। গতদিন কিভাবে হয়ে গিয়েছিল. মেমসাহেবের পছন্দ হয়েছিল। তলপেট যেন শরীর থেকে আলাদা একখানা ব্যাপার! রূপী দাঁতে দাঁত চিপে ফিতে আঁটে, বিদ্রোহী মাংসের তালগুলো কোনোরকমে তেবড়ে-তুবড়ে মোটা বর্মের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে থাকে। 'দ্যাটস্ রাইট। দ্যাটস রাইট!' মেমসাহেব তারিফ করে, তারপর পরিচারিকাকে হাঁক পাড়ে। 'পাংখা কর, পাংখা কর।'
শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ডিকির কাঁচা-পাকা চুলের গুছি নেমেছে। সম্প্রতি ফরাসী হেয়ার-ড্রেসারের কাছ থেকে চুল ড্রেস করে আসার পর তার অঙ্গ-সঞ্চালনের কিঞ্চিৎ অসুবিধে হচ্ছে। কারণ, দাসী পরিচারিকাদের চড়চাপড়ের আধিক্যে চুলের সাজ অবিন্যস্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। আয়নার সামনে বসে বসে মিসেস ডিকি তার দু গাছি অবিন্যস্ত চুল খুব মনোযোগের সঙ্গে যখন তাদের স্বস্থানে ফিরিয়ে আনার জন্যে সচেষ্ট, ততক্ষণ রূপী অজস্র জরি ও ফ্রিল-আঁটা প্যারিস থেকে আনা হালকা নীল গাউন হাতে ধরে দাঁড়িয়ে থাকে।
মিসেস ডিকি মাড়ি-চেপা গলায় বলে, 'ওডিকোলোন, ওডিকোলোন! মাই গড!'
রূপী বিছানার ওপর গাউনটা আলগোছে রেখেই ওডিকোলোন স্প্রে করতে যাবে, এমন সময় আর-একটা ঠাঁই করে চড় পড়ে তার কানের ওপর এবং এবার তার কান ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

ডো'ন্ট পুট দ্যাট গাউন দেয়ার ! মাই গড্ ! টুমি একটা গাডা আছো, গাডা, ব্লাডি আছো !'

মিসেস ডিকির বাংলা, ইংরেজি সমস্তই দুর্বোধ্য। তবে গাউনের দিকে দৃষ্টি লক্ষ্য করে রূপী সঙ্গে সঙ্গে তার হাতে তুলে নেয়।

মিসেস ডিকি তার মাথায় হাত দিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হামার মাঠা, হামার মাঠা ! পুট দ্যাট অন্ মাই হেড।'

রূপী এবার গাউনটা তার স্বীয় স্থানে তুলে রাখে, কিন্তু মেমসাহেব আয়নার দিকে চেয়েই আর্তনাদ করে ওঠে, "মাই হেয়ার ! মাই হেয়ার।'

রূপীর দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হাসি হচ্ছে ! হাসি হচ্ছে !' এবং তৃতীয়-বার চপেটাঘাত। তার পর কাৎরাতে থাকে মেমসাহেব, যার বাংলাটা অনেকটা এরকম, 'আমি তোকে চাবুক মেরে ঠিক করব। হুইপিং-হাউসে পাঠাব। জিমের কথায় কিছু করিনি। নইলে আমার অমন সাধের সুপ-প্লেট, জার্মান ক্রকারি ! ওরকম প্লেট এখন বাজার থেকে উঠে গেছে। আমার সমস্ত সেটটাই কানা হয়ে গেল। আমি জানি, জিম ঐ বাঁদীটাকে তাক করছে। যত বুড়ো হচ্ছে, তত বেটার কাম বাড়ছে।...আমি এবার ইংলণ্ডে ফিরে যাব। অনেকদিন হল এই জাহান্নামে আছি।

এমন সময় দেওয়ালঘড়িতে সাতটা বাজল। 'চার্লস, চার্লস উইল থি ক্রস্।' তারপর গদি-আঁটা টুলে চোখ বন্ধ করে বসে চেঁচায়, 'ঠিক কর, ঠিক কর।'

রূপী আস্তে আস্তে তার সরু সরু নিপুণ আঙুল চালিয়ে চিরুনিতে আবার চুলগুলো যেমন ওপরের দিকে ছিল, তেমনি তুলে দেয়, যতখানি সম্ভব চুলের গুছিগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে চুলের পাশ দিয়ে নামায়।

'ব্লাডি, ইন্টেলিজেন্ট !' মিসেস ডিকি স্বগতোক্তি করে। এর পর রূপী মিসেস ডিকির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ওডিকোলোন স্প্রে করে। তারপর নীল গাউনটা কোনোরকমে পরিয়ে দেয় মেদবহুল দেহে।

ডক্টর ডিকির জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়।

'কামিং কামিং, ওয়ান মিনিট। ঘরের মধ্যে ভ্যাপসা গরমে ওডিকোলোনের ধোঁয়ায় ডক্টর ডিকির মুখখানা ভেসে ওঠে, তার চোখ খোঁজে রূপীর চোখ। আর রূপীর সেই গা-ঘোলানো ভাবটা ফিরে আসে। একবার কটমট করে সাহেবটার দিকে তাকায়, কিন্তু সাহেব দমে না, সে কিশোরীর দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে হাসে।

৫

সেদিন সন্ধ্যায় চার্লস ম্যাকিনটশ তার নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশ-উপলক্ষে ভোজ দিয়েছিল। সপরিবারে ম্যাকডাওয়েল, ডিকি, ফাউলার আরো তিন-চারটে পরিবার, যাদের কাছে সে অনুগৃহীত, যাদের সহায়তায় সে কয়েক মাসের মধ্যেই এক উদ্‌ভ্রান্ত কিছু পরিমাণ আদর্শবাদী এবং না বলতে-কৃতসংকল্প বেমানান বেলাইনের যুবক থেকে জন কম্পানির একজন দায়িত্বশীল অফিসার, একজন নতুন নবাবে রূপান্তরিত, তাদের সকলকে সে ডেকেছিল।

ডিকিদের দুই সন্তানই ইংলণ্ডে। তাদের ফিটনের শব্দ মিলিয়ে যেতে-না-যেতে বাড়িটা নিঝুম হয়ে পড়ে। বাবুর্চি সুলতান মাংসের কারি কিছুটা সরিয়ে রেখেছিল, সেগুলো দেবী গড়ফ্রে, জগা, জগদীশ আর নিজের জন্যে বার করে। আস্তাবলের ধারে সহিসদের জন্যে বড় ডেকচিতে ভাত ফোটে, সঙ্গে সকালের ঘ্যাঁট, চচ্চড়ি। কানাই আর রূপীর জন্যে ওবেলাকার ঠাণ্ডা কড়কড়ে ভাত পড়ে থাকে। কানাই কোকরুমের পেছনের ছোট ঘরখানায় গড়গড়া পালিশ করছিল। রূপী এসে বললে, 'তোর সঙ্গে কথা আছে কানাই।'

কানাই যেন অপেক্ষা করছিল কিছুদিন থেকে। কিছুদিন থেকেই রূপীর দিকে তাকাতে তার ভয় করছিল। এখন সে খাঁচায় বন্দী একটা জন্তুর জীবন-যাপন করছে, কিন্তু খাঁচায় থাকতে থাকতে জন্তুরও জীবনের প্রতি আকর্ষণ বাড়ে, প্রথম কদিন হয়ত সে খায় না, গুম হয়ে থাকে। তারপর খাবারের জন্যে প্রতীক্ষা করে, এমন কি খাঁচার গরাদ দিয়ে যখন শীতের রোদ তার পিঠে আঙুল বোলায়, তখন এই বন্দীজীবনও মুহূর্তের জন্যে বেড়ে লাগে।

'তোর সঙ্গে কথা আছে কানাই।'

'বল', কানাই মুখ না তুলে বললে।

'আমার দিকে তাকাচ্ছিস না কেন?'

কানাই ধীরে ধীরে মুখ তুলে বললে, 'তাকাতে ভয় করে রূপী। তোর দিকে তাকাতে ভয় করে।'

একহারা দীঘল মেয়েট কেঁপে উঠল। আশ্চর্য। কানাই, তার একমাত্র আপনার লোক, সেও তাকে ভয় করে, কিন্তু পরমুহূর্তে কানাইয়ের চোখ

দেখে সে বুঝতে পারে। তার চোখে যে স্পষ্ট আত্মসমর্পণের ভাষা, তা রূপীর চোখ এড়ায় না। কানাই এতদিন পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে, কিন্তু এইবার সে ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রূপী ভাবে, এজন্যে দায়ী কোন্‌টা, তার মন না তার দেহ? ডাক্তার সাহেব যে কারণে তার দিকে চেয়ে চেয়ে মিটমিট করে হাসছিল, এ কি সেই কারণ?

কানাই ঘাড় নামিয়ে আত্মগতভাবে বললে, 'আমি ঠিক তোকে বোঝাতে পারব না। তোর দিকে চাইলে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। ভাবছিলাম, যখন গোলাম হয়েছি, তখন গোলামের মতোই থাকি, জগা, জগদীশ—আর ক-বছর পর ঠিক এদের মতোই হয়ে যাব আমি, কিন্তু তোকে দেখলে মনটা আনচান করে। ভাবি, পালিয়ে যাই কোথাও তোকে নিয়ে, ঘর বাঁধি। আর পাঁচটা লোকের মতো আমিও দিন কাটাই।'

রূপী তার পাশে এসে চুপ করে বসে থাকে। সে ক্রমশঃ টের পায় এ ব্যাপারটা বোধ হয় আলাদা। ঠিক ডাক্তার সাহেবের ব্যাপার না, জগার ব্যাপার না। আর-একটা ব্যাপারও আছে, যা গান শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে নড়ে ওঠে।

'তোকে আমার বড্ড বেশী ভালো লাগছে রে। আগে যেমন যাত্রাগান লাগত তেমনি। আগে পাগলার মতো গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরতাম, রাতের পর রাত জাগতাম, কোথায় নতুন পালাগান হচ্ছে, অমনি ছুটতাম মাঠ ভেঙে। আর ভয় করত, বাড়ির সবাই চটবে, বকাবকি করবে, ভয় করত আর ভালো লাগত। তোর দিকে তাকালে আমার সেইরকম লাগে।'

'চল, আমরা কোথাও পালাই।'

কানাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'জগা বলছিল, সবাই ওরকম ভাবে প্রথম প্রথম। চেষ্টাও করে, কিছু হয় না।'

'তোর ভয় বড্ড বেশি কানাই।'

কানাই স্থিরদৃষ্টিতে রূপীর দিকে চেয়ে বললে, 'লক্ষ্মণদার সাহস ছিল, তাতে কিছু হল?'

অদূরে রাস্তায় ফিটনের আওয়াজ পাওয়া যায়। কানাই, রূপী সচকিত হয়ে ওঠে। দুজনেই উৎকর্ণ। তারপর আবার ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে যায়।

'আজ সকালে কোথায় গিয়েছিলি? আমার খুব মন খারাপ লাগছিল তোকে দেখতে না পেয়ে। ভয় পাচ্ছিলাম, তোকে বোধ হয় কোথাও বেচতে নিয়ে গেছে।'

কানাই হেসে বললে, 'ও, তোকে বলা হয়নি। ম্যাকডাল সাহেবের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল ডাক্তার সাহেব। তার নাকি বুকের দোষ হয়েছে। শুয়ে আছে। আর কি পেল্লাই ব্যাপার, মনে হল রাজপ্রাসাদে গিয়েছি। আর একটা জিনিসও দেখলাম।' কানাই হঠাৎ চুপ করে যায়, তাকে কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্ত লাগে।

রুপী বললে, 'কী জিনিস দেখলি ?'

কানাই ঘাড় নাড়ায়, 'নাঃ ! সে বলা যায় না।'

'ঠিক আছে, বলিস নে।'

'না, না, রাগ করিসনে বলছি। এই সেদিন এত জাঁক করে বিয়ে হল ম্যাকডাল সাহেবের। সাহেব তো শুয়ে আছে বিছানায়। বাড়িতে আরো কয়েকজন ডাক্তার। এত ঘর, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে গড়গড়া নিয়ে অন্যদিকে ঢুকে গেছি। ভারী পর্দা সরাতে গিয়েই থমকে গেলাম। দেখি ম্যাকডালের মেমসাহেবটা সেই একটা ছোকরা সাহেব আছে না—যার বাড়িতে আজ নেমন্তন্ন—তাকে জড়িয়ে ধরে—।'

রুপী বললে, 'হুঁ।'

কানাই উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললে, 'এই সেদিন বিয়ে হল। তা হলে তুই কেন বিয়ে করলি ?'

'ও নিয়ে ভাবিস নে কানাই ! নবাব, বাদশা, রাজা, মহারাজারা এরকম। এরা আমাদের নতুন রাজা, নতুন নবাব। এ-সব কথা আমি একদম শুনতে চাই না। তুই যদি চলে যাস, আমি মরে যাব। তোকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না।'

সেই দুই কিশোর-কিশোরী স্বপ্নাবিষ্টের মতো মোমবাতির আলোয় দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকে। সেই মুহূর্তে জীবনটা এমন সম্ভাবনায় দুলছিল তাদের সামনে, যে-কোনো ক্ষয়-ক্ষতি-মালিন্য তাকে স্পর্শ করেনি। রুপী বুঝতে পারে, কানাই যেমনভাবে তাকে টেনেছে তার স্বল্পবিবাহিত জীবনের লক্ষ্মণের সাহচর্যে, সে তুলনায় কিছুই মনে হয়নি। আর কানাই, রুপীর হাতখানা টেনে তার চোখের ওপর রাখে। যেন তার ভয়, তার এই মুহূর্তে চোখাচোখি হলে তার সমস্ত বাক্য অপবিত্র হয়ে যাবে। রুপীর লম্বা আঙুলগুলো তার বন্ধ চোখের ওপর রেখে কানাই আস্তে আস্তে বললে, 'তোর জন্যে আমি মরব রুপী। আমার আর ভয় নেই।'

সেই পবিত্র মুহূর্তেও রুপীর মনের আর একটা দিক সজাগ হয়ে ওঠে। তার

স্মরণে আসে, নবগ্রামে তাঁতিপাড়ার অনেক দম্পতির কথা, যারা পরস্পরের সান্নিধ্যের জন্যে একদা হাঁইফাঁই করেছে, কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই অবিশ্বাস, সন্দেহ ও আত্মগ্লানির পাঁকে চলচ্ছক্তি বিরহিত। বস্তুতঃ রূপী সেই পবিত্র মুহূর্তে সেই ম্লান আলোয় এবং এক ইতালীয় চিত্রকরের আঁকা প্রায়নগ্ন নারী ও তার কুকুরের তৈলচিত্রের নীচে মানুষের আদ্যন্তকালের প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েছিল। যে-কোনো বিরাট পরিবর্তনের মুখে, প্রেমে কিংবা বিপ্লবে যে বিরাট প্রত্যাশার দরজা খুলে যায় এবং পরবর্তীকালে রোজকার প্রাত্যহিক দেনা-পাওনায় যে দরজা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে, সেই আলো ও আঁধারে-মেশা ভবিষ্যৎ, সেই আশা ও আশাভঙ্গের উপস্থিতি একইসঙ্গে টের পায় রূপী। ঘুমের মধ্যে থেকে সে বলে ওঠে, 'তুই যে গানের মতো কথা বলছিস কানাই। পারবি তো, আরো অনেক বছর পরে এ গান গাইতে ?'

'তুই যদি আমার পাশে থাকিস, যদি এইভাবে আমার দিকে তাকাস, তা হলে আমি পারব।'

'নবাবপুরে পারিসনি, নবাবপুরে যখন বলেছিলাম ডিঙি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে জলে, তখন তুই ভয় পেয়েছিলি।'

কানাই রূপীর হাঁটুতে মাথা রেখে বললে, 'আমার আর ভয় নেই। মরতে হলে মরব। কি আছে! একটাই তো জীবন।'

'একটা কেন, আমার মনে হয়, আগের জন্মেও তুই ছিলি। আগের জন্মে, হয়ত এই বাড়িতেই, তুই আর আমি এমনি পাশাপাশি বসেছিলাম।'

কানাই বললে, 'আমি ও-সব ভাবি না। অনেকে বলে, আমি বলি না। আগের জন্মে কি ছিলাম না ছিলাম, ভেবে কি লাভ। একটাই তো জীবন আমার সামনে, এখানেই মরা, বাঁচা।'

'আগের জন্মে আমরা দুটো তেলাপোকা ছিলাম। রূপী সশব্দে হেসে ওঠে। পায়ের আওয়াজ আসে। তারা দুজনে সরে বসে। দেবী গডফ্রে ঢুকে বললে, 'এখানে কী হচ্ছে ? আমি তোমাদের আগে বলিনি, সাহেব, মেমসাহেব বেরিয়ে গেলে এ বাড়িতে একদম থাকবে না ?

রূপীর হাসির দমক তখনো কাটেনি। হেসে বললে, 'এটা আমাদের বাড়ি দেবীদি। আগের জন্মে আমি আর কানাই ছিলাম এ বাড়ির মালিক।'

রাগী গলায় দেবী বললে, 'অত ঢং করতে হবে না। বাঁদীর অত ঢং মানায় না।'

কানাই ভয়ে ভয়ে দেবী গডফ্রের দিকে চেয়ে থাকে। প্রথম থেকেই এই মহিলা-

টিকে তার ভালো লাগে না। সাহেব, মেমসাহেবের সঙ্গে সঙ্গে ইনিও ছড়ি ঘোরাবেন, তাতে সে মনে মনে বিরক্ত। শান্ত গলায় বললে, 'দেবীদি, তোমার কি অসুখ করেছে?'
স্ত্রীলোকটি গালে হাত দিয়ে বললে, 'আ মোলো যা, এই সেদিনের ছেলে, নাক টিপলে দুধ বেরোয়। আমার সঙ্গে এসেছিস মস্করা করতে?'
রূপী রুখে বললে, 'তুমি কে দেবীদি? মেমসাহেব তো আমাকে বারণ করেনি। তুমি বলবার কে?'
'আমি কে? আমি কে?' দেবী গডফ্রে ফেটে পড়ল। যেতে যেতে বললে, 'আচ্ছা, আমি কে, দেখাচ্ছি।'
সে চলে যাবার পর কানাই বললে, 'তুই ও কথা না বললেই পারতিস রূপী। কেন বিপদ ডেকে আনছিস?'
রূপী গম্ভীর হয়ে বললে, 'বিপদ না ডাকলেও আসবে। বিপদ ঠেকানো যাবে না।'

সে রাত্তিরেই বিপদ এল। বিপদের মোটা ভুরু, মোটা নাক, বিপদের ঘাড় মোটা, আর তার পুরু ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গন্ধ আসছে। রূপী মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়েছিল। তার গায়ের কাপড় টেনে নামানো হয়েছে। ত্যালতেলে জেলির মতো গালের স্পর্শে, গন্ধে, ঠাণ্ডায় রূপী জেগে ওঠে। জেগে উঠেই চেঁচিয়ে ওঠে, দেবীদি।'
ডাক্তার বাংলায় বললে, 'ডেবি নেই, হামি আছে। হামি রুপিয়া দেবে।'
এক ঝটকায় সেই অবয়বহীন নাক, চোখ, ভুরু, ত্যালতেলে গাল দুহাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে শরীরটাকে পাক দিয়ে খাটের এক কোণে উঠে পড়ে রূপী। আর তিন-চার পা দূরেই দরজার ছিটকিনি। মুহূর্তে আর এক ঝটকায় রূপী আছড়ে পড়ে দরজার গায়ে, কিন্তু শরীরের ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারায় তার হাত ছটকে ছিটকিনি থেকে সরে কালো ড্রেসিং-গাউনপরা একতাল মাংসের ওপর গিয়ে পড়ে। মাংসের একটা খাঁচায় যেন সে আটকে পড়েছে, এবার সেই ত্যালতেলে গাল, মোটা নাক, তার নাক, মুখে পরিব্যাপ্ত হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্তনাদ ওঠে। সজোরে দাঁত বসিয়েছে রূপী সেই মোটা নাকে। রক্তাক্ত নাক দুহাত দিয়ে চেপে সাহেব আর্তস্বরে বলে, 'বীচ, বীচ। আই উইল টিচ ইউ।'

রূপীর ঘুম আসে না সে রাতে। তার দু চোখ দিয়ে জল গড়ায়। কয়েক ঘণ্টা আগে মোমবাতির আলোর নীচে কানাইয়ের সঙ্গে বসে থাকা আর কয়েক ঘণ্টা পরেই অন্ধকারে একতাল মাংসের আক্রমণ এ দুটোই কি একই দিনের ঘটবার ঘটনা? মাঝখানে কয়েকদিন ছেদ দেওয়া যেত না? কদ্দিন সে ঠেকাবে? প্রতিরাত্রেই এই একতাল মাংস এসে হানা দেবে তার ঘরে আর সে নিজেকে দেখতে পায়—সেই একতাল মাংসের সঙ্গে সে নিজেও তালগোল পাকিয়ে আছে। দূরে কোনো পেটা ঘড়িতে রাত তিনটের আওয়াজ আসে। কানাইয়ের কাছে যাওয়া যায় না এই মুহূর্তে?

রূপী ঠিক স্পষ্ট করে তার মনের ভাবখানা বুঝতে পারে না, কিন্তু যন্ত্রচালিতের মতো সে উঠে দরজার শেকল খোলে। বোধ হয় রাত তিনটে হবে। চেপে ঠাণ্ডা পড়েছে। রান্নাঘরের পাশে আঁস্তাকুড় থেকে নেড়ি কুকুরটা এসে তার কাছে ল্যাজ নাড়ায়। ঠিক এই মুহূর্তে কানাইকে তার আত্মদানের প্রবল বাসনা জাগে। এখনো সে পবিত্র আছে, এখনো সেই মদের গন্ধভরা মাংসের তালের সঙ্গে সে তাল পাকিয়ে যায়নি, কিন্তু এই ভবিতব্য থেকে তার নিস্তার নেই। আজ ফিরেছে, কিন্তু কাল? কাল আসবে আরো আটঘাট বেঁধে। তার আগে যার সঙ্গে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছে, তার কাছে যাবে। ঘুমের মধ্যে যেন রূপী হাঁটছে। ঘুমের মধ্যে উঠোন পেরিয়ে সে লম্বা ঘরখানার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায় এবং সেই মুহূর্তে জগার কাশির আওয়াজ আসে। কাশতে কাশতে সে কফ ফেলে। দরজায় করাঘাত করামাত্রই জগা দরজা খুলবে, তারপর জগদীশ, তারপর সুলেমান বাবুর্চি, তারপর একজন মশালচী, এক বৃদ্ধ হুঁকোবরদার, সবার শেষে কানাই। রূপীর ঘুম ছুটে যায়। ভারী পায়ে তার ঘরে ফিরে আসে।

ভোরবেলায় দরজায় টোকা পড়ে। দেবী গডফ্রে ঘরে ঢুকে বললে, 'সাধ করে মরণ ডেকে এনেছিস।'

রূপী নিশ্চল কাঠ হয়ে শুয়ে থাকে।

'কি রে, কথা বলছিস না যে?'

রূপী উঠে বসে বললে, 'তুমি তো নিজে দরজা খুলে দিয়ে ভেগেছিলে। এখন আবার দিদি সেজে এসেছ।'

'তোর তেজ এখনো মরেনি দেখছি।'

'মরেনি, মরবেও না।'

৬

ভোরে ম্যাকডাওয়েলের অবস্থার অবনতি হয়। খবর পেয়ে ডাক্তার সাহেব জামা-কাপড় ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে ঘুমন্ত মেমসাহেবের জন্যে চিরকুট লিখে: 'ডার্লিং, ম্যাকের এখন-তখন অবস্থা। দেখি কি করা যায়।'

লম্বা করিডোরের মুখেই চার্লস ম্যাকিনটশ, তার মুখ শুকনো, চুল উষ্কখুষ্ক, নিদ্রা-জাগরণের ছাপ চোখে-মুখে।

'একটা ভয়ংকর রাত গেছে। ভয়ংকর রাত।' মাথা নামিয়ে চার্লস বললে। 'জুন তো আর নিজের চোখে দেখতে পারলে না।'

'জুন?' ডাক্তার ভুরু কুঁচকালে।

'হ্যাঁ, মানে মিসেস ম্যাকডাওয়েল। সত্যিই কোমল মন। একেবারে বিয়ের পরে পরেই!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে ডাক্তারের পেছনে পেছনে লম্বা করিডোর দিয়ে হাঁটতে সুরু করে। চমকে উঠে বলে, 'তোমার নাকে কী হল? ফুলে একেবারে ঢোল হয়েছে।

ডিকি বললে, 'আর বোলো না। কাল সকালে একটা হাতি দেখে আমার ঘোড়াটা ভড়কে গিয়ে একেবারে দু-পা তুলে নৃত্য! কিছু না, সেরে যাবে।'

'রক্তপাত হয়েছিল মনে হচ্ছে।'

'সামান্য সামান্য। তুমি আমার সঙ্গে থাক। আজ থেকে জোঁক দেবার ব্যবস্থা করব। আমি ডক্টর স্টিফেনের সঙ্গেও কথা বলেছি। আজ সকাল থেকেই চালাতে হবে। লীচ এক্সপেরিমেণ্ট আজকাল কলকাতাতেও খুব সাকসেসফুল হচ্ছে।'

সকাল দশটায় ডক্টর স্টিফেন, সঙ্গে দু-জন মেল নার্স নিয়ে হাজির হয়। মড়ার মতো পড়ে থাকে ম্যাকডাওয়েল, নিঃশ্বাস এত ক্ষীণ যে, মাঝে মাঝে বোধ হয়, সব শেষ হয়ে গেছে। ঘরের কোণে উনুনে কেটলিতে জল ফোটে। আর বালতিতে বারো-চোদ্দটা জোঁক। মেল নার্সরা আস্তে আস্তে ম্যাকডাওয়েলের প্যাণ্ট খুলে তার উরু অনাবৃত করে। গরম জলে উরু ধোয়ানো হয়। তার পর দুটো দুটো করে জোঁক দু পায়ে ধরানো হয়। প্রথমে জীবগুলো বুঝতে পারে না তাদের এই জামাই আদরের কী কারণ। তারপর থোড়ার গায়ে বুলে

পড়ে এবং ক্রমে ক্রমে তাদের আয়তনবৃদ্ধি পায়।

ম্যাকডাওয়েল একবার নড়েচড়ে ওঠে, যেন বুক থেকে আওয়াজ ওঠে, 'মাই গড, মাই গড।'

ডিক স্টিফেনকে বললে, 'ইমপ্রুভমেণ্ট লক্ষ্য করছ? পেশেণ্ট কথা বলছে।'

স্টিফেন ঘড়ি দেখে বললে, 'ওগুলো ফেলে দাও, আরো চারটে লাগাও।'

জোঁক ছাড়াতে বিপর্যয়। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটে এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই মিসেস ম্যাকডাওয়েলের প্রবেশ। শাদা বুটিতোলা গোড়ালি পর্যন্ত নামানো হালকা নীল ফ্রকে যেন উড়তে উড়তে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়ায় এবং প্রবল চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পড়ন্ত মহিলাটিকে কোলে তুলে পাশে গদি-আঁটা চেয়ারে বসিয়ে দেয় চার্লস। পাংখাওয়ালা মাথার কাছে পাখা করে, ডাক্তার স্মেলিং-সল্ট নাকে ধরে।

ডিক চার্লসকে ধমকালে, 'আমি তোমাকে বলেছিলাম দরজাটা আটকে রাখতে যতক্ষণ লীচ এক্সপেরিমেণ্ট চলছে।'

মিসেস চোখ তুলে তাকালে। বিহ্বলভাবে চার্লসের দিকে চেয়ে বললে, 'আমি কোথায়?' তার পর পাশেই দু জোড়া জোঁক-আঁটা অনাবৃত থোড়ার দিকে চোখ পড়তেই চোখ বুঁজে বলে, 'মাই গড্! মাই গড্! একটা ঘাটের মড়াকে আমি বিয়ে করলাম। আমার কী হবে!'

ডিক বললে, 'আর দু-তিনদিনের মধ্যেই তোমার স্বামী সুস্থ হয়ে উঠবে ম্যাডাম। আমরা কলকাতায় এ রকম আকছার কেস করেছি। এখন বিজ্ঞানের যুগে সব কিছুই সম্ভব। তুমি কিছু ভেব না ম্যাডাম। বিকেলবেলাতেই দেখবে তোমার স্বামী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে।'

মিসেস ম্যাকডাওয়েল বললে, 'আমি কী পাপ করেছি যে, ভগবান আমাকে এরকম শাস্তি দিলেন!'

স্টিফেন বললে, 'চার্লস, তুমি বরং ম্যাডামকে শোওয়ার ঘরে নিয়ে যাও। ওঁর কোমল মন। উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন।'

অচেতন ম্যাকডাওয়েলের মুখ থেকে গোঙানির আওয়াজ আসে। মিসেস ম্যাকডাওয়েল উঠে পড়ে। চার্লসের হাতে ভর দিয়ে ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

'তোমার কি মনে হয় ডিক, ম্যাকের এই বিপদ কাটবে?'

স্টিফেনের কথার জবাব না দিয়ে রুগীর নাড়ি টেপে ডক্‌টর ডিক। নাড়ির

গতি অতি ক্ষীণ শুধু নয়, অত্যন্ত অনিয়মিত। তার ফোলা নীলচে নাকের ওপর, হাত বোলাতে বোলাতে বললে, আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে জন। বিকেল নাগাদ কিছুটা অবস্থার উন্নতি আশা করছি। আমাদের মেজর ফিশারের এক কেস।'

সে তো বাঁচেনি।'

'তা অবশ্য, তবে ইমপ্রুভ করেছিল।'

জন স্টিফেন গদি-আঁটা চেয়ারে আরাম করে বসে হাই তোলে। তারপর ঝকঝকে পিতলের বাতিদান লক্ষ্য করে বলে ওঠে, 'ভদ্রমহিলা বিস্তর সম্পত্তির মালিক হবে।'

'হ্যাঁ, ম্যান প্রোপোজেস, গড ডিসপোজেস,' ডক্টর ডিকি ইংরেজি প্রবাদ উদ্ধৃত করে। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমি ভাবছি অন্য কথা।' ডক্টর স্টিফেনের কৌতূহলী চোখ অনুসরণ করে বললে, 'আমি ভাবতাম ছোকরাটা ন্যালাখ্যাপা। এখন দেখছি মোটেই তা নয়।'

স্টিফেন ম্লান হেসে বললে, 'ইউথ আর মানি, এ দুটো একসঙ্গে থাকা ভাগ্যের কথা। এই লোকটাকেই দেখ না।' বলে নিশ্চল ম্যাকডাওয়েলের দিকে চেয়ে বললে, 'সারা জীবন টাকা টাকা করে হাঁইফাঁই করল। টাকা এল, কিন্তু বয়স নেই।'

'আমাদের সকলেরই প্রায় একই অবস্থা।'

'তুমি ঠিকই বলেছ ডিকি, এ ছোকরা ভাগ্য করে জন্মেছে।'

সেদিন বিকেলে যখন সাহেবপাড়া নিঝুম, রাস্তায় ঘোড়ার খুর এবং গাড়ির চাকার শব্দ নেই, কারণ, দীর্ঘ লাঞ্চের পর সাহেব, মেমসাহেবরা বিশ্রামে মগ্ন, কোনো কোনো মহিলা দাসীকে দিয়ে পায়ের নখ পরিষ্কার করাচ্ছে, কেউ চুল বাঁধছে সন্ধ্যার মজলিশের জন্যে, ঠিক সেই নিস্তব্ধতায় ম্যাকডাওয়েল চোখ মেলে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে, 'জল।'

চার্লস ম্যাকিনটশ ঝিমচ্ছিল। গত রাতে সে বাড়ি যায়নি। রুগীর পাশে ছিল। এইমাত্র তার ঝুল এসেছিল। ঝিমতে ঝিমতে যে ভাবী দিনের স্বপ্ন দেখে। জাহাজে তার সহযাত্রিণী মিস ক্র্যাফটন, তারপর সেণ্ট জন্‌স চার্চের ফুলের বাসরে নববধূ, আর গত দুদিনে তার ওপর একান্ত নির্ভরশীল তরুণী —এই তিনটে ছবিই আগু-পিছু করে মনের মধ্যে উঠে মিলিয়ে যায়। যখন সে স্বপ্ন দেখছিল ম্যাকডাওয়েলের শয়নকক্ষে সে ও তার আকাঙ্ক্ষিত রমণী, ঠিক

সেই সময় ম্যাকডাওয়েলের কর্কশ গলা কানে আসে, 'ওয়াটার, আই সে ওয়াটার।'

ধড়মড় করে উঠে বসে চার্লস। এক গেলাস জল এগিয়ে দেয়। জল খেয়ে ম্যাকডাওয়েল বালিশের ওপর পিঠ উঁচু করে বসবার চেষ্টা করে।

'উঠ না, উঠ না কাকা, ডাক্তার বারণ করেছে।'

পরিশ্রমে হাঁপায় ম্যাকডাওয়েল। জোরে নিঃশ্বাস নিতে নিতে বলে, 'তুমি, তুমি এখানে কেন?'

'আমি কাল রাত থেকে তোমার বাড়িতে আছি তোমাকে অ্যাটেণ্ড করার জন্যে।

মুখ বিকৃত করে ম্যাকডাওয়েল বললে, 'আমাকে অ্যাটেণ্ড করার জন্যে? ভণ্ডামি কোরো না চার্লস। ভণ্ডামির একটা সীমা আছে!'

নিষ্পাপ মুখ করে চার্লস বললে, 'তুমি প্রকৃতিস্থ নও কাকা। উত্তেজিত হয়ো না। তোমার পক্ষে উত্তেজনা খুব খারাপ।'

আবার উঠে বসবার চেষ্টা করে, আবার হাঁপায় ম্যাকডাওয়েল। চোখ বন্ধ করে আর্তস্বরে বলে, 'মাই গড্! মাই গড্!' তারপর চোখ খুলে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, 'আমার বাড়িতে বসে আমার সদ্য-বিবাহিত বউ-এর সঙ্গে তুমি প্রেম করবো আর আমি তা চুপ করে দেখব?' তারপর মোটা গলায় গর্জন করে, 'গেট আউট! গেট আউট! আই সে, গেট আউট ইউ সোয়াইন!' এবং চিৎকার করেই আবার জ্ঞান হারায় ম্যাকডাওয়েল।

রাতে রুগীর পাশের ঘরে চার্লসের শোওয়ার ব্যবস্থা হয়। সেখানে মিসেস ম্যাকডাওয়েলের আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে চার্লস তার আঙুল দিয়ে সুন্দর একজোড়া ভুরুর ওপর দাগ কাটতে কাটতে বললে, 'আমার জীবনের স্বপ্ন আজ সার্থক হল।'

'তোমাদের পুরুষমানুষদের কিছু বিশ্বাস নেই। এই বুড়োটা দেখ না, আমার জীবনটা···' গলায় কান্না উছলে আসে নববধূর।

গভীর চুম্বনে কান্না মুছে দিয়ে চার্লস বললে, 'সবাই তো একরকম হয় না। আমি তো তোমাকে বলছি, জাহাজে যখনই তোমাকে প্রথম দেখলাম—অবশ্য আমি তখন স্বপ্নেও ভাবিনি, আমার এমন সৌভাগ্য হবে, তোমার বুকে মাথা রাখতে পারব, এ আমার কল্পনার বাইরে।'

এমন সময় পাশের ঘর থেকে একটা আওয়াজ আসে। রুগীর কি জ্ঞান ফিরে এসেছে? পা টিপে টিপে মিসেস ম্যাকডাওয়েল পাশের ঘরে গিয়ে ফিরে আসে।

তার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত। নিশ্চল স্বামীকে ডিঙিয়ে সে একবার কাঠের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। তারপর কাছে এসে চার্লসের হাতখানা কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, 'সবচেয়ে বিপর্যয় কি হবে জানো?'

'যদি বেঁচে ওঠে।'

মিসেস ম্যাকডাওয়েল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'তা হলে কী হবে?'

চার্লস ম্যাকিনটশ মাটিতে গড় হয়ে বসে মিসেস ম্যাকডাওয়েলের হাতখানা নিজের হাতে নিয়ে আদালতে বিচারকের সামনে দাঁড়ানো কণ্ঠে বললে, 'আমি প্রতিজ্ঞা করে বলছি, আমি কখনোই তোমাকে ছাড়ব না।'

কিন্তু এ প্রতিজ্ঞায় ডাল গলে না। বস্তুতঃ এ প্রতিজ্ঞাতে কিছু ফয়দা হয় না। মিসেস ম্যাকডাওয়েল ভাবিতভাবে বললে, 'দ্যাখো, ছেলেমানুষি কোরো না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আর একটা ভয়ও আছে।' এবার সত্যিই তাকে ভীত দেখায়।

চার্লস তার হাত সজোরে আকর্ষণ করে বললে, 'সত্যিই আমি বলছি জুন—'

'আরে না না, তোমার কথা না। যদি মারা যাবার আগে ম্যাক তার বিষয়-সম্পত্তি কোনো চ্যারিটিতে দিয়ে যায়।'

চার্লস ম্যাকিনটশ অবাক হয়ে তার প্রেমিকার দিকে চেয়ে থাকে। সে অনুভব করে, আপাত-প্রজাপতির মতো হাল্কা সুন্দর এই নারী বিষয়বুদ্ধিতে ঝুনো নারকেল। মুখে বললে বটে, 'না, না, এটা সম্ভব নয়' কিন্তু বিকেলে একলা ঘরে ম্যাকডাওয়েলের ভর্ৎসনায় কণ্ঠ তার কানে বাজতে থাকে। তার আরো ভয় হতে থাকে যদি আবার উঠে বসে তা হলে শুধু এ বাড়ি থেকে তাড়ানোই নয়, প্রতিহিংসাপরায়ণ ম্যাকডাওয়েল তার ভবিষ্যতের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দেবে। গুম হয়ে সে বসে থাকে। আলিঙ্গনের যে উষ্ণ অনুভূতি তার সারা গা বেয়ে ওঠা-নামা করছিল সেগুলো মিইয়ে আসে।

চিন্তাক্লিষ্টমুখে তরুণী বললে, 'একটাই উপায় আছে।' কৌতুহলী চার্লসের দিকে না তাকিয়েই বলে, 'আমি শুনেছি, লীচ এক্সপেরিমেণ্ট বেশি হয়ে গেলে —এখনো বালতিটা ঘরেতেই আছে—তুমি চার্লস আরো দু জোড়া লীচ লাগাও।'

'আমি?' সভয়ে তাকিয়ে থাকে চার্লস।

'ছেলেমানুষি কোরো না, ছেলেমানুষি কোরো না। বারান্দার দরজাটা আগে দিয়ে এস।'

দুজনে নিস্তব্ধ ঘরে এসে দাঁড়ায়। মিসেস ম্যাকডাওয়েল স্বামীর পায়ের কাছ থেকে কম্বলটা সরিয়ে বললে, 'কাম অন্, কাম অন্।'
জল নড়া পড়ায় জোঁকগুলো কিলবিলিয়ে ওঠে। সেদিকে চেয়ে চার্লসের গা ঘোলায়, একবার প্রেমিকার দিকে চায়। প্রেমিকা স্বামীর উরু অনাবৃত করে মিষ্টি হাসে। দুহাতে চার্লস ঝপ ঝপ করে জোঁক ধরে থলথলে মাংসে চেপে ধরে। একটা ফসকে যায়। 'শক্ত করে ধর, শক্ত করে ধর।' নববধূ বললে।

৭

ক্রমাগত জলের ঝাপটায় নাকের ফোলা নীলচে ভাবটা অনেক কমে। তাছাড়া ম্যাকডাওয়েলের অবস্থা দিন-দুই ক্রমাগত এমন ছুটোছুটিতে থাকতে হয় যে, স্বামীর নাকের ওপর মিসেস ডিকির দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। দু-দিন পর সকালে খাবার টেবিলে ডক্টর ডিকি বললে, 'বোধ হয় এবারের মতো বিপদ কাটল।'
'কিন্তু তোমার নাক? পড়ে গিয়েছিলে?'
'আর বোলো না। শহরের রাস্তায় হাতি-চলাচল আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। পরশুদিন সকালে শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছিল, ভাবলাম ঘোড়া নিয়ে বেরোই। মাঝ-রাস্তায় হাতি আসছে দেখেই এমন পা তুলে তিনি নাচতে আরম্ভ করলেন যে, আমি হুমড়িয়ে পড়ে গেলাম।'
মিসেস ডিকি ধরা গলায় বললে, 'জিম, আমি না হয় বুড়ি হয়ে গেছি—
'না, না, আমি তোমাকে বলব ঠিক করে রেখেছিলাম, কিন্তু, ম্যাকডাওয়েল এমন ভেলিক দেখালে আমার একেবারে মনে ছিল না। বিশ্বাস করো ডার্লিং, তোমার কাছে লুকিয়ে আমি কোনোদিন কিছু করিনি, করব না।'
'আমাকে তোমার কিছু বলতে হবে না জিম। দেবী গডফ্রের ব্যাপারটা ধর —তখন আমি অভিভূত হয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমার কোনো তাপ-অনুতাপ নেই। আমি এখন খালি তাকিয়ে আছি কবে পাড়ি দেব, কবে এ দেশ ছাড়ব।'
ডাক্তার চায়ের কাপ মুখ থেকে নামিয়ে রেখে বললে, 'তখন আমার বয়েস কম ছিল ডার্লিং।'
'আমি তো বললাম, তুমি এখন কী করছ না করছ, তাতে আমার বিন্দুমাত্র

ইণ্টারেস্ট নেই জিম। একসময় হয়ত ছিল।'

'দ্যাখ, কোন্ কথা থেকে কোন্ কথা উঠল। তখন বয়স কম ছিল। ভালো জিনিস আমার ভালো লাগত।'

'এখন ভালো লাগে না? আমার তো মনে হয়, এই যে নতুন ছুঁড়িটা এসেছে, সেদিকে তুমি ঝুঁকেছ।'

'ওর সম্পর্কেই তোমাকে বলব ভাবছিলাম।'

মিসেস ডিকির ফরাসী হেয়ার-ড্রেসারের পাকানো কার্লগুলো এখন সাদামাটা হয়ে কানের পাশে ঝুলছে। সেগুলো কানের পাশ থেকে সরাতে সরাতে বললে, 'তুমি তো সেদিনই বলেছিলে. আমার এত দামী সুপ-প্লেট ভাঙল, আমি শাস্তি দিতে চাইলাম। তুমি না করলে। এর পর তোমার সামনে আমাকে অপমান করবে।'

'আমি খুব ভুল করেছিলাম, ডার্লিং। তুমি ঠিকই বলেছ। কুকুরকে লাই দিলে মাথায় চড়ে বসে। আমাকে দেবীও বলছিল, ওর গাঁয়ের সেই ছেলেটাকে নিয়ে পালাবার ফন্দি আঁটছে।'

'আমি তখন বলেইছিলাম তোমাকে', উত্তেজনায় গলা চড়ে যায় মিসেস ডিকির। 'তুমি তখন ওর চামড়া দেখে ভুলে গেছিলে।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝ না ডার্লিং। তখন অন্য চিন্তা মাথায় ছিল না। ভেবে দ্যাখ ম্যাকডাওয়েলের অবস্থা। বিয়ের সাতদিন যেতে না যেতেই। আর আমাদের একমাত্র বল ভরসা।'

'তুমি ঠিক বলছ জিম, মেয়েটাকে শাস্তি দিতে তোমার কোনো আপত্তি নেই?'

'আমিই তো তোমাকে বলছি, এই-সব বেয়াদবি আমাদের সংসারে চলবে না। তোমার সেই জার্মান প্লেট, আমার মনে হয়, ও ইচ্ছে করেই ভেঙেছে।'

'আব আমিও তো সেই কথাটাই বলছি। হাত থেকে মিছিমিছি কি শুকনো প্লেট পড়ে যায়? তোমাকে তো এই কথাটাই সেদিন বোঝাতে পারলাম না।'

'যাক গে, যা হয়েছে, হয়েছে, তুমি রোববার দিনই ব্যবস্থা কর। আমি চার্লসকে বলছি মিসেস ম্যাকডাওয়েলকে নিয়ে আসুক। ক-দিন বেচারির খুবই কষ্টে যাচ্ছে। বিয়ের ঠিক পরে পরেই। একটু চায়ের ব্যবস্থাও করতে পার।'

'নিশ্চয়। সে কথা আমাকে বলতে হবে না।'

সেদিন বিকেল থেকেই ভৃত্যমহলে একটা সাজ-সাজ পড়ে যায়। উঠোনে ভালো

করে ঝাঁট পড়ে, নালি সর্দাররা যত্ন করে কুয়ে রাপাড়ের নালা থেকে পাঁক তুলে ওষুধের গুঁড়ো ছিটোয়।

'দেবীদি, এত ঝাড়পোঁছ কেন?

দেবী গডফ্রে বললে, 'বড়দিন আসছে তো। সাহেবদের বাড়িঘর-দোর সব সাফ হয় বড়দিনের আগে।'

সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় গাঁজায় টান দিয়ে জগা গান ধরে, 'রুপী আজ টুপি পরেছে।'

কানাই পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। 'কী গান গাইছ জগাদা?'

পাশ থেকে বেসুরো হেঁড়ে গলায় জগদীশ ফের গাইলে, 'রুপী আজ টুপি পরেছে।'

'তার মানে?'

কাশতে কাশতে প্রবল হাসির দমকে জগার যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

বললে, 'কেমন গান বেঁধেছি কানাই। একেবারে রহস্য হয়ে গেছে।'

'রহস্যটা কী?'

'ঐতো বললাম।' হাত নেড়ে জগা সুর করে গাইলে, রুপী টুপি পরেছে।'

রুপীকে নিয়ে একটা ব্যাপার ঘটতে চলেছে, তা আন্দাজ করে কানাই এবং একটা চাপা ক্ষোভ, আসোয়াস্তিতে তার বুক ভারী হয়ে থাকে। রুপীকে এখন সর্বদা পাহারা দিচ্ছে দেবী গডফ্রে। একবার রুপীকে ডাকতে গিয়েছিল কানাই। দেবী ঝাঁঝিয়ে উঠেছে, 'গোলাম-বাঁদীর কোনো পিরিত হয় না, বুঝলে চাঁদ। গোলাম গোলাম, বাঁদী বাঁদী।'

'দরজা ছেড়ে দাও দেবীদি।'

ঘরের ভেতর থেকে রুপী চেঁচিয়ে বললে, 'আমাকে সাহেব শাস্তি দেবে। তাই জগা, জগদীশ ফুর্তি করছে।'

কানাই ফিরে যায়। শাস্তি আর নতুন করে কী দেবে?

পরদিন সকালে একটা গরুর গাড়ি ভর্তি মাটির জালা হাজির হয়। জগা, জগদীশ, নালি সর্দার, সহিস, অন্যান্য হুঁকাবরদার, নাপিত, বাবুর্চি, ধোপা, দরজি সবাই একে একে হাত লাগায়। একটা চাপা ফুর্তি সকলের মুখে-চোখে। বিকেল গড়িয়ে এলেই কুয়োর পাড়ে সার সার চেয়ার পড়ে, ফুলের টব লাগিয়ে ছাইগাদাটা ঢাকা হয়। সারা দুপুর জালার পর জালা জলে ভর্তি হতে থাকে। প্রায় চল্লিশজন ভৃত্য কুয়োর পাড় ঘেঁষে দাঁড়ায়। ওদিকে সস্ত্রীক মেজর

ফাউলার তার নতুন বগী চেপে হাজির হয়। মিসেস ম্যাকডাওয়েলের হাত ধরে সাদা মখমলের ঝালর দেওয়া পোশাকে চার্লস ম্যাকিনটশের আবির্ভাব। সম্প্রতি কলকাতার বিখ্যাত ইতালীয় কনফেকশনারের তৈরি মস্ত চকোলেট কেক মিসেস ম্যাকডাওয়েলের প্লেটে তুলে দিয়ে মিসেস ডিকি বললে, 'বিশ্বাস করবে না। আমার ক-দিন রাতে ঘুম হয়নি ম্যাকের কথা ভেবে ভেবে। এদিকে বড়দিন আসছে। প্রত্যেক বছর ম্যাকই সবচেয়ে বড় পার্টি দেয়। ঢের ঢের লোক দেখেছি, কিন্তু এ রকম হৃদয়বান পুরুষ!' চোখে রুমাল চাপা দেয় মিসেস ডিকি।

মেজর ফাউলার বললে, 'একবার যখন বিপদ কেটেছে, তখন আশি বছর বাঁচবে।'

বিমর্ষভাবে মিসেস ম্যাকডাওয়েল বললে, 'এ কথাটা আগে আমিও শুনেছি। তবে এ কথাটা কি ঠিক?'

'হানড্রেড পার্সেন্ট। ম্যাকডাওয়েল অত সহজে টেঁশে যাওয়ার লোক নয়। ও কাউন্সিলের মেম্বার না হয়ে যায় না।'

কেক, প্যাসট্রিসহযোগে চা-পান শেষ হতে-না-হতেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ডিসেম্বরের সন্ধ্যা ঝপ করে নামে। মিসেস ম্যাকডাওয়েল রুমাল বার করে হাঁচি দেয়।

'একটু ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে, না?' চার্লসকে নিচু গলায় বলে। তারপর ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করে, 'কখন তামাসাটা সুরু হবে। আমি এ রকম তামাসা কখনো দেখিনি। তুমি দেখেছ চার্লস?'

'না, আমিও দেখিনি।'

এবার হ্যাজাক জ্বালানো হয়। কুয়োর পাড়ের পাশে পাঁচ-ছটা খুঁটির গায়ে আলো ঝোলানো হতেই চারদিক ঝলমল করে।

ডিকি গিয়ে সার সার ভৃত্যের দিকে চেয়ে বললে, 'আর কতক্ষণ দেরি করবে? লাগিয়ে দাও।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভৃত্য চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ নগ্ন রূপীর দু হাত দুদিকে শক্ত করে ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে জগা আর জগদীশ। কুয়োর পাড়ে তাকে দাঁড় করানোমাত্রই দুজন ভারী তার মাথার ওপর জল ঢালতে থাকে। সেই কনকনে ঠান্ডায় প্রবলবেগে জলের ধারা মাথার নামবার সঙ্গে সঙ্গেই একজন ভৃত্য পেছন থেকে এসে তার খোলা চুল এক হ্যাঁচকায় নীচের দিকে টেনে ধরে থাকে। ডিসেম্বরের ঠান্ডায় রূপীর নাক

আর মুখের ওপর অবিরল জালার পর জালা থেকে তোড়ে জল নামে। রূপী আঁকপাঁক করে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে।

মিসেস ম্যাকডাওয়েল হাততালি দিয়ে ওঠে, 'লুক, লুক, সি লুকস লাইক এ ফিশ।'

রূপী ছটফট করে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে, শরীরখানা দুমড়ে বেঁকিয়ে জলের ধারা থেকে একটু সরে যেই হাঁ করে নিশ্বাস নিতে যায়, অমনি অপর এক জালা জল তার খোলা মুখের ওপর নেমে আসে। একবার জগাকে লাথি মারে। জগা তাকে দু পা ধরে টেনে কুয়োর পাড়ে শুইয়ে দেয়। এবার শরীরের সর্বত্র জালার পর জালা কনকনে ঠাণ্ডা জল পড়তে থাকে। রূপী আর নড়েচড়ে না। ডাক্তার সাহেবের খেয়াল হয়। চেঁচিয়ে ওঠে, 'স্টপ, স্টপ! বন্ধ কর, আভি লে যাও।'

জগা হাত বাড়িয়ে সেই অচৈতন্য দেহটা নিয়ে ভৃত্যশালার দিকে এগোয়। পেছনে পেছনে দেবী গডফ্রে।

টেবিলে ফিরে এসে অতিথিদের বললে ডক্‌টর ডিকি, 'আর এক কাপ করে চা হোক। কি বলুন!'

আর ঠিক এই মুহূর্তে কাণ্ডটা ঘটে। ডাইনিং হল থেকে ঝনঝন শব্দে কাঁচের জিনিস ভাঙে।

পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ডক্‌টর ডিকি। 'নিশ্চয় সেই বড় বাতিদানটা ভেঙেছে। মাই গড্‌। গভর্ণর-জেনারেলের প্রেজেণ্ট। নবাব অফ আউধের অন্দরমহলের বাতিদান।'

মিসেস ডিকি চেঁচিয়ে ওঠে, 'কানাই কোথায়? নিশ্চয় ওর কাজ। ও মেয়েটার লাভার, আমি তোমাকে বলি নি? তুমি বলতে বাঁশি বাজায়। এখন কেমন বাঁশি শুনছ?'

সে রাতে ফিটন চেপে ময়দানে হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরে মিসেস ম্যাকডাওয়েল ও চার্লস আশ্চর্য। ম্যাকডাওয়েল বালিশের গায়ে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছে। চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ঘরে ঢুকতেই বললে, 'তোমরা হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলে? কেমন লাগল?'

'অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা হল ম্যাক, অদ্ভুত!'

মিসেস ম্যাকডাওয়েল খলখল করে ওঠে।

'তুমি নিশ্চয় দেখেছ অনেক। আমি ত দেখিনি।'

চার্লস ম্যাকিনটশের দিকে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে চেয়ে ম্যাকডাওয়েল বললে, 'তুমি কাল একবার অ্যাটর্নি হিকিকে ডেকে আনবে।'

মিসেস তাড়াতাড়ি বললে, 'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। এ রকম ঘটনাও যে ঘটতে পারে ইণ্ডিয়াতে, না এলে জানতে পারতাম না। একেবারে কলসীর পর কলসী জল পড়ছে আর মেয়েটা আঁকপাঁক করছে। আশ্চর্য সব কাণ্ড ইণ্ডিয়াতে ঘটে! হুইঃ!' মিসেস ম্যাকডাওয়েল হ্যাণ্ড-ফ্যানে বাতাস খেতে খেতে ফুঁ দিলে।

'তুমি কিন্তু ভুলে যেও না চার্লস। কোর্টে বেরোবার আগেই তাকে ধরবে।'

'এখন একটু সুস্থ হয়ে নাও না কাকা। হিকিকে যখনই বলবে ডেকে আনব।'

ম্যাকডাওয়েল চেঁচিয়ে উঠল, 'আমার কথার ওপর কথা বোলো না চার্লস।'

'হুম!' ঠোঁটে আঙুল দিয়ে শব্দ করে মিসেস ম্যাকডাওয়েল। নিচু গলায় বললে, 'একেবারে উত্তেজনা নয় ম্যাক। ডাক্তার বলছে,...ওকি, কি হল?'

ম্যাকডাওয়েল আবার নেতিয়ে পড়েছে বালিশে। তার বুকটা হাঁপরের মতো ওঠে, পড়ে। চার্লস সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, 'আমি এখনি ডাক্তার ডেকে দিচ্ছি।'

চোখ বন্ধ করে ভাঙা গলায় ম্যাকডাওয়েল বললে, 'গেট আউট, গেট আউট অফ মাই সাইট, বোথ অফ ইউ!'

এবং সঙ্গে সঙ্গে সে জ্ঞান হারাল।

মিসেস ম্যাকডাওয়েল চার্লসের হাত ধরে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে বললে, 'বুঝতে পারলে?'

চার্লস বিমর্ষভাবে বললে, 'হুঁ।'

'একটা কিছু কর চার্লস। একটা কিছু কর। আর আমার সহ্য হচ্ছে না', মিসেস ম্যাকডাওয়েল দু হাত মুঠি করে বললে।

'তুমি শান্ত হও জুন, শান্ত হও, অস্থির তরুণীর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে চার্লস বললে।

'আর ক-দিন এ রকম চলবে? আমার এখন মনে হচ্ছে, ও বেঁচে উঠবে। তারপর হয়ত, আমাদের দুজনকেই তাড়াবে এ বাড়ি থেকে', আতঙ্কে তার চোখ বড় হয়ে ওঠে।

'ম্যাকডাওয়েল একটা খুব ইমপর্ট্যাণ্ট লোক। গভর্ণর-জেনারেলের স্নেহের

পাত্র'।

'কে দেখছে ? সবাই জানবে, অসুখেই মারা গেছে।'

চার্লস গম্ভীরভাবে বললে, 'ঝপ্ করে কিছু করা মুশকিল। তা ছাড়া ডক্টর ডীক আমার দিকে কেমন যেন তেরছাভাবে তাকাচ্ছে। সেদিনের লীচ এক্স-পেরিমেণ্ট বোধ হয় ও ব্যাটা টের পেয়েছে।'

অসম্ভব ! তুমি বড্ড নার্ভাস চার্লস। তোমার আর সব ভালো, ঐ একটা ব্যাপার। আমি যদি ইয়ংম্যান হতাম।'

চার্লস তার প্রেমিকার কানের লতিতে টোকা মেরে বললে, 'তা হলে কি সর্বনাশ হত জুন ! এই ভগবানের সৃষ্টি একেবারে খুঁতো হয়ে যেত।'

মিসেস ম্যাকডাওয়েলের হঠাৎ একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে পড়ে যায়, যেন কথা-টার ফয়সালা এই মুহূর্তে না হলে তাদের মিলন অসম্ভব। সোফার একপাশে সরে গিয়ে আড়চোখে চার্লস ম্যাকিনটশকে দেখে নিয়ে মেঝের দিকে চেয়ে থাকে।

'কী হল ? সত্যিই তোমাকে মাঝে মাঝে আমার ভয় করে।' চার্লস বললে।

'একটা কথা তোমাকে আমি পরিষ্কার বলি, টাকার জন্যে আমি ম্যাককে কখনো বিয়ে করিনি।'

মসিসম্যোকডাওয়েলের হাতখানা টেনে তার নিজের বুকের ওপর রেখে চার্লস ম্যাকিনটশ বললে, 'এ কথাটা আমায় তোমার বোঝাতে হবে ?'

নিজেকে আলগা করে তরুণী বললে, 'না, ঠিক তা নয়।'

'তবে ?' বলে হাবার মতো চেয়ে থাকে চার্লস। পর মুহূর্তেই খেয়াল হয়। চেঁচিয়ে বলে, 'সত্যিই আমি খুব স্থূল। আমি খুব সাদামাটা। তুমি ঠিকই ভাবতে পার, আমি একজন এয়ারেসকে বিয়ে করবার জন্যে ঝুঁকেছি। জুন, জুন ! আমি চন্দ্র, সূর্য সাক্ষী করে বলছি, তোমাকে জাহাজে দেখামাত্রই আমি তোমার প্রেমে পড়েছিলাম। মুখ ফুটে বলতে পারিনি। আমার পক্ষে কি তা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার দেখার স্বপ্ন নয় ? তোমার সঙ্গে টাকার কোনো সংস্পর্শ আছে বলে আমি ভাবতে পারিনা। তোমার চোখের দিকে তাকালে আমার মনে হয় যা কিছু পবিত্র...'

মিসেস ম্যাকডাওয়েল চার্লসের গোঁফে আঙুল বুলাতে বুলাতে বললে, 'তুমি এ দিকটা বড্ড বেশি ছেঁটেছ।'

এর পর তাদের আর কথাবার্তা বিশেষ হয় না। চার্লসের আলিঙ্গনে সাড়া দিয়ে তরুণী ম্যাকডাওয়েল-পত্নী ভাবলে, এখন আর না করার কোনো মানে হয় না।

খুব ভোরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে পা টিপে টিপে চার্লস ম্যাকিনটশ রুগীর ঘরে ঢোকে। ঘরের মধ্যে ভোরের নীল আলো ফুটেছে। বাগানের ঝোপ থেকে একটা তিতির ঘন ঘন ডাকছে তার সঙ্গিনীকে। চার্লস নিচু হয়ে রুগীকে কিছুক্ষণ দেখে। তারপর তার উল্লসিত কণ্ঠ চারপাশের নিস্তব্ধতা ছাপিয়ে বেজে ওঠে, 'জন, জন! হি ইজ ডেড্।'

৮

কলকাতা সত্যিই মিছিলের শহর। অন্ততঃ ডিসেম্বরের কলকাতা এমন-সরগরম, সাহেবপাড়ার দোকানে দোকানে ভিড়, মাঝে মাঝে ছোট ছোট মিছিলে খৃষ্ট-সংগীতের মিছিল, সাদা কলার-আঁটা কালো পোশাকে বালকদের হাতে ক্রুশ, পেছনে দীর্ঘকায় পাদরী। দোকানে দোকানে লাল, নীল কাগজের ফুল, চীনে লণ্ঠন, হরেকরকম টুপি, রুপোলি চাকতি, ঝালর। 'সুইস কেক্ সর্বপ্রথম কে আনল শহরে?—আমরা' একটা মস্ত কেকের পুতুলের নীচে নীল ফেস্টুন। তা ছাড়া বাড়িতে বাড়িতে ভোজ। মাঝে মাঝে বাজনদারদের মিছিল, এই ভোজ-পার্টির সঙ্গে বাজনার জন্যে তাদের ঘন ঘন ডাক পড়ে। তারা এই শীতের সন্ধ্যায় বড় বড় ব্যাগপাইপ বাজাতে বাজাতে চলে এবং সে আওয়াজে ঘোড়া ভড়কে লাফিয়ে পথচারীদের ত্রাসের কারণ হয়।

সম্প্রতি ইংলণ্ডে গভর্ণর-জেনারেলের বিরোধীরা অত্যন্ত সরব হওয়ার আবার একটা চাপা কানা-ঘুষো ফুসুর ফুসুর ইংরেজ-পরিবারের আনাচে-কানাচে ঘোরে। হেস্টিংস এ-সব তোয়াক্কা না করে আজকাল প্রেমের কবিতা লিখতে মগ্ন। কিছুদিন আগেই অসুস্থতার কারণে মাদাম ইম্‌হোপের স্বদেশযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতাপ্রীতি ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে, কিন্তু তিনিও সেদিন বিকেলে সেণ্ট জন্স চার্চে উপস্থিত ছিলেন।

দারুণ জমজমাট শোকমিছিল। প্রথমে ক্রুশকাঁধে একজন নিঃসঙ্গ পাদরী। তার কিছু ব্যবধানে চার ঘোড়ায় টানা গান-ক্যারেজের ওপর কালো মখমলে ঢাকা কফিন। ওপরে গভর্ণর-জেনারেলের দেওয়া একটিমাত্র সাদা ক্রিসেন-থিমামের চাকা। তার কিছু পরেই কালো ভেলে মুখঢাকা কালো গাউনপরা শোকার্ত ম্যাকডাওয়েল-পত্নী অতি কষ্টে সঙ্গী চার্লস ম্যাকিনটশের হাতে ভর করে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। তার পেছনেই কাউন্সিলের সদস্য, বোর্ড অফ

স্ট্রেডের ম্যাকডাওয়েলের সহকর্মীরা, উচ্চপদস্থ কোম্পানির অফিসিয়াল, পুরো এক কোম্পানি সৈন্য—ইংরেজ অফিসারদের অধীনে লাল উর্দি আর নাগরা পরা তেলেঙ্গী সিপাই, পিঠে গাদা বন্দুক, কারুর কারুর কোমরে বিরাট খাপেভরা তলোয়ার। তাদের দেখে রাস্তার ধারে আমবাগানে কয়েকটা বাঁদর প্রবল কিচিরমিচির সুরু করে।

গির্জার মুখে মিছিল আটকে পড়ে। জাহাজঘাটার দিকে আগুয়ান উটের সারির শেষ উটের পিঠ থেকে কাপড়ের ভারী পেটি দড়ি আলগা হয়ে মাটিতে পড়েছে, তার ফলে প্রবল বিশৃঙ্খলা। সামনের দুটো উট ঘুরে দাঁড়িয়েছে। মাঝখানে একটা ঠেলায় ছালা চাপা দেওয়া কি একটা বস্তু, সেটাও জন্তুগুলোর মাঝখানে পথ আটকে পড়েছে। ওদিকে চার্চের গায়েই ঘোড়সওয়ারদের বল্লমে গভর্ণর-জেনারেলের ফ্ল্যাগ উড়ছে, হেস্টিংস তার সবুজ কোট পরে থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে এদিকে তাকিয়ে আছেন। ট্রাফিক কণ্ট্রোল করতে একটা হুলস্থুল পড়ে যায়। দুজন মিলিটারি ঘোড়সওয়ার ইতিমধ্যেই উটের পালের ওপর টগবগ করে লাফিয়ে তাদের সামনে পড়ায় আরো কেলেঙ্কারি। দুটো উট গা ঝাড়া দিয়ে বিকট আওয়াজ করতে থাকে। তাদের গা থেকে দড়ি আলগা হয়ে আরো পেটি মাটিতে পড়ে। দুজন তেলেঙ্গী সৈন্য এক ধাক্কায় ঠেলাটাকে মালসুদ্ধ পাশের নালায় গড়িয়ে ফেলে দেয়। দূরে তামাসা দেখবার অভিলাষে যে জনতা জমতে সুরু করেছিল, সেদিকে লক্ষ্য করে আরো দুজন ঘোড়সওয়ার তেড়ে যায়। কৃষ্ণবসনা শোকার্ত মহিলাটির গলা দিয়ে আর্ত চিৎকার বেরোয়, 'মাই গড্, মাই গড্! আর কতক্ষণ চলবে চার্লস?'

আর বেশিক্ষণ অবশ্য চলেনি। কলকাতায় যে রকম চিরকাল ঘটে, যখন ক্রমশঃ সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে, তখন আস্তে আস্তে একটা সুরাহা হয়। পেটিগুলো উটের পিঠে শক্ত করে বাঁধা হবার পরই উটের পাল চলতে সুরু করে। এবার গান-ক্যারেজের পথ পরিষ্কার। গির্জায় মৃতের আত্মার জন্যে প্রার্থনা-সূচক ঘণ্টা বাজতে থাকে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা পরিষ্কার।

চারদিক সব ফর্সা হয়ে যাবার পর ঠেলাওয়ালা রত্নাকর পাণ্ডে একটা বিড়ি ধরাল। নালার পাশে ঠেলা থেকে ছিটকে পড়ে আছে কানাই, সেদিকে একবার চেয়ে পিচ্ করে ঘাসে থুতু ফেলে। তার মামার বদলি হয়ে রত্নাকর কাজ করছে গত তিনদিন, প্রতিদিনই একটা-না-একটা ঘটনা ঘটছে। তার মনে হল, তার গলার মাদুলিটা খসে পড়ে যাবার পর থেকে এই-সব বিপত্তি।

কান থেকে পাকানো চিরকুট বার করে চোখের সামনে মেলে ধরে রত্নাকর। সে হিন্দি লিখতে জানে। মিলিয়ে দেখতে চেষ্টা করে ডক্‌টর ডিকির হাতে বড় বড় গোল হরফে ইংরেজি লেখা—৩০ চাবুক, অগ্রিম এক টাকা চোদ্দ আনা। গত তিনদিনে হুইপিং হাউসে এই প্রথম তিরিশ চাবুকের কেস সে দেখল। তিরিশ চাবুক মানে মৃত্যুদণ্ড, দু টাকার কম খরচায় মৃত্যুদণ্ড মন্দ নয়। আর একবার তাকায় নিশ্চল কানাইয়ের দিকে রত্নাকর। আশ্চর্য প্রাণশক্তি ছেলেটার, অজ্ঞান হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত গোঙানি ছাড়া আওয়াজ বার করেনি মুখ থেকে। শেষের পাঁচ ঘা মারার জায়গা ছিল না ক্ষতবিক্ষত পিঠে, পাছায়। হঠাৎ সন্দেহ হয় রত্নাকরের, হয়ত মরে গেছে।

কানাই মরেনি। কচি সবুজ ঘাসের ঘ্রাণে তার জ্ঞান ফিরে আসে। চারদিকে হট্টগোল শব্দে সে ঠাওর পায় না, সে বেঁচে আছে না মরে গেছে। তার বেঁচে থাকার কোনো কথা ছিল না। দ্বিতীয়বার অজ্ঞান হবার পরও চাবুক মারার সময় কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার জ্ঞান ফিরে আসে এবং সে মনে মনে এই পৃথিবীর কাছে, বিশেষ করে রূপীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছিল। কানাই কচি ঘাসের ওপর তার আঙুল বোলায়।

রত্নাকর বিড়ি খেয়ে উঠে পড়ে। 'উঠ্‌, উঠ্‌' বলে হাঁক দেয়, কিন্তু কাছে এসে কানাইয়ের অবস্থা দেখে তার মায়া হয়। কানাই ফ্যালফ্যাল করে তার দিকে চেয়ে আছে। হালকা শরীরটা পাঁজাকোলা করে তুলতে গিয়ে ক্ষতের ওপর হাত পড়ে। কানাই যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে ওঠে।

ঠেলায় তার দেহখানা নামিয়ে ছালা চাপা দিতেই কানাই বললে, 'আবার কেন নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে? এখানে ফেলে রাখ। রাত্তিরে শেয়ালে খেয়ে নেবে।'

'আরে বাপ! রুপেয়া লিয়া কামকে লিয়ে।'

'কাম মানে তো চাবুক মারা।'

রত্নাকর ঠেলা ঠেলতে ঠেলতে বললে, 'সব এক বাত, সব এক বাত. যিসসে দানা-পানি মিলে ওই কাম।'

আবার মিছিল আসে। আসন্ন খ্রীস্ট-উৎসবের জন্যে কালো পোশাক-পরা বালকেরা গান গায়।

চিৎ হয়ে শুয়ে থাকায় কানাই তাদের দেখতে পায় না, জিজ্ঞাসা করে, 'এরা কারা?'

'ইনলোককো কাম গানা-বাজানা, উসসে দানাপানি মিলতে হ্যায়।'

সারা পিঠে দগদগে ঘা নিয়ে কানাই পড়ে থাকে এবং ক্রমাগত সে একটা দোটানায় দুলতে থাকে, বলতে গেলে যে দোটানা গত দু-শ বছরের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস। এক-একবার ভাবে, ঠিকই করেছে, কোনো হঠকারিতা হয় নি। অপমানের সে বদলা নিয়েছে। এটা শুধু খাওয়া, পরা, থাকার ব্যাপার না, ইজ্জতের ব্যাপার। মানুষ বাঁচে তার ইজ্জতের জন্যে, তার মনুষ্যত্বের জন্যে। দাদা লক্ষ্মণ দাস ঠিকই করেছিল, বেঁচে থাকার একমাত্র পথ লক্ষ্মণ দাসের পথ। তারা যদি একজোট হতে পারে, জগা, জগদীশকে সঙ্গে নিতে পারে, তা হলে তারা পারে না ডাক্তার সাহেবকে এক রাতেই খতম করতে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বৈত-সঙ্গীতের আর একটা গলা ভেসে আসে। লক্ষ্মণ দাস একলাই ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছে, দূর থেকে দাঁড়িয়ে লোকে তাকে তারিফ করবে, কিন্তু তার ডাকে কখনো সাড়া দেবে না। লক্ষ্মণ দাস চিরকালই একটা উচ্চ কণ্ঠের কবিতা, এক ধরণের অসংলগ্ন কাব্য। সে কি তার দাদার পথেই হাঁটবে? কারণ জগা, জগদীশ কোনদিনই তার পাশে আসবে না এবং একলা দাদার পথে হাঁটলে তাকে দাদার মতোই ফাঁসিকাঠে ঝুলতে হবে। নইলে জগা, জগদীশ হতে হবে, খাঁচায় বন্দী জন্তুর জীবনযাপন করতে হবে এবং ক্রমে ক্রমে খাঁচাটাকেই সমস্ত জগৎ বলে মেনে নিতে হবে। প্রবল বেদনায় সঙ্গে সঙ্গে জ্বর আসে কানাইয়ের। দিন-রাত বেহুঁশ অবস্থায় কাটতে থাকে। কয়েকটা ঘা বিষিয়ে যায়। দিনের পর দিন মাটির গামলায় মাড়-ভাত পড়ে থাকে। রাত্তিরে ইঁদুরের উৎপাত বাড়ে।

জগা বললে, 'ছোকরাটা মরে যাবে দেখছি।'

জগদীশ বললে, 'দেবীদিকে বলব?'

'দেবীদি? দেবীদি কিছু করবে না।'

'রুপীকে বলি। ও কানাইকে পেয়ার করে।'

'রুপী? ওর আজকাল শরীর খারাপ,' তেরছাভাবে জগদীশের দিকে চেয়ে জগা হাসে।

তিনদিন পর বিকেলবেলা। ভৃত্যাবাস খালি। কানাই শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছিল কড়িকাঠের দিকে। তার মাথায় হাতের স্পর্শে সে চমকে ওঠে।

'উপুড় হয়ে শো, ওষুধ এনেছি', রুপী বললে।

তুলোয় করে কর্পূর মেশানো নারকেল তেল ঘায়ে লাগায় রুপী।

'কেন সাধ করে বিপদ টেনে আনলি?' ভীষণ ক্লান্ত গলা রুপীর।

'কেন ডেকে আনলাম বুঝলি না ?'

'তুই যে বলেছিলি তোর দাদার রাস্তায় হাঁটবি না।'

'দাদার রাস্তা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই রুপী।'

অনেকগুলো মুহূর্তে চুপচাপ কেটে যায়। দুজনেই ভাবছিল এইমাত্র কয়েকদিন আগের কথা, যখন একলা ঘরে মোমবাতির আলোয় তাদের সামনে সমস্ত দরজা গুলো খোলা মনে হয়েছিল।

'একটা কথা তোকে বলি রুপী, আমার কাছে কোনো কথা লুকোস না।'

'কেন বলছিস ?'

'আমার মনে হচ্ছে আমাদের আরো সর্বনাশের দিন আসছে।'

ঘায়ে তুলো বোলাতে বোলাতে আতঙ্কে রুপীর চোখ বড় হয়ে ওঠে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সর্বনাশের চেহারা, তার নাক, চোখ, মুখ, সর্বনাশের গন্ধ তার নাকে এসে লাগে।

আস্তে আস্তে উঠে বসে স্থিরদৃষ্টিতে কানাই চেয়ে থাকে রুপীর দিকে। তার হাতখানা হাতে নিয়ে বললে, 'অত ভেঙে পড়িস নে রুপী, অত ভেঙে পড়িস নে। সাহেবটা তোর কতখানি নেবে ? শরীরটা নেবে, এই তো ? আমরা অপেক্ষা করব। দিন আমাদের ঠিক আসবে।'

কোন্ দিক থেকে আসবে ? কেমনভাবে আসবে ? এই চার দেয়ালের মধ্যেই তো বছর ঘুরে যাবে। তখন আমি আস্তে আস্তে দেবী গডফ্রে হয়ে যাব। মন খারাপ লাগলে জর্দা দিয়ে পান খাব। আর তুই জগার মতো ভোঁতা হয়ে পড়বি, গাঁজা টানবি। আর একজন বাঁদী গোলামের অপমানে কষ্টে হে হে করে হাসবি। এ ছাড়া আমাদের কী ভবিষ্যৎ আছে ? এই সব কথা রুপীর মনের মধ্যে খেলে, কিন্তু বলতে পারে না।

কানাই চোখ বন্ধ করে বললে, 'তোর মনে নেই, আমি তোকে বলেছি রুপী, তোর জন্যে আমি মরব।'

'আমি মরতে চাই না কানাই। আমি দেখতে চাই, শেষ পর্যন্ত আমি কি দেবী গডফ্রে হব, আর তুই কি জগা, জগীশ বনবি। আমি দেখতে চাই। কুয়োর পাড় থেকে ফিরে দু দিন অজ্ঞান হয়েছিলাম। এখনো গায়ে জোর পাই না। বুক ব্যথা করে।'

তারপর মাথা নিচু করে রুপী নিজের মনে বললে, 'তুই ঠিক বলেছিস কানাই। সাহেব আর কতখানি আমার নেবে ? আরো অনেক থাকবে। তোর জন্যে

থাকবে।'

দ্রুত পায়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

জানুয়ারি মাস পড়তে না পড়তেই চার্লস ম্যাকিনটশ ও মিস ক্র্যাফটন তাদের এনগেজমেণ্ট উপলক্ষে এক ভোজসভা আহ্বান করলেন। এখন ম্যাকডাওয়েলের বাড়িতেই চার্লস তার ঘরবাড়ি বানিয়েছে, নইলে তার প্রেমিকা ভয় পায়, সে নাকি ম্যাকডাওয়েলের কাশির আওয়াজ শোনে রাতে, চাঁদের আলোয় জানলার ধারে তার টাক চকচক করে। গত দু-তিন মাসেই চার্লসের আরো অর্থাগমের সুরাহা হয়। এখন সে অনেক ধীর শান্ত, বোকার মতো নানা ধরণের প্রশ্ন করে না। কারণ সে টের পায়, খুব তাড়াতাড়ি চারদিকে ঢাকঢোল না পিটিয়ে নানা-ভাবে পয়সা রোজগার করার চেষ্টাই জীবন-জিজ্ঞাসার একমাত্র উত্তর। এই পথেই তার কাকা সগৌরবে হেঁটে ইংলণ্ডে বিরাট রাজপ্রাসাদ বানিয়ে দেশের এবং দশের মুখোজ্জ্বল করেছে। ম্যাকডাওয়েলও তার হাত ধরে নিয়ে এসেছে এই রাস্তায়, আর ম্যাকডাওয়েলের মৃত্যুতে সে এই রাস্তায় এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। তার বাল্যকালের স্মৃতি আর তাকে পীড়া দেয় না, বরং ধনী হবার সংকল্পে তাকে আরো দৃঢ় দেখায়।

বুকে হাত দিয়ে যদি বলতে হয়, তা হলে সে বলবে যে, গহরের বোনের সঙ্গে মিস ক্র্যাফটের বিশেষ পার্থক্য নেই। বরং গহরের বোনের দাবি অনেক কম। চার্লস এখন বুঝতে পারে কেন ম্যাকডাওয়েল ডক্টর ডিক, আরো অসংখ্য জন কোম্পানির অফিসিয়াল ভারতীয় নারীর সান্নিধ্যের জন্যে উন্মুখ। ভারতীয় নারীদের বিবাহিত নারীর সম্মান দেবার কোনো প্রশ্ন নেই। অবশ্য অনেকদিন দৈহিক সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই কখনো মায়া-মমতা জন্মায়, যেমন অ্যাটর্নি হিকি তার জমাদারণীর জন্যে চুঁচড়োয় বাড়ি বানিয়েছে, কিন্তু সে সম্পর্ক কখনোই ইংরেজ মহিলাদের মতো সর্বগ্রাসী নয়। অথচ ইংরেজ মহিলার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না হলে জন কোম্পানির যে একটা ভেতরের সমাজ তার দুর্ভেদ্য প্রাচীর কোনোকালেই ভেদ করা যাবে না। ম্যাকডাওয়েল এবং আরো দু-একজন এই ফরমুলাতে পড়ে না, তারা নিশ্চয় আরো কর্মদক্ষ ছিল, কিন্তু গত কয়েক মাসের অভিজ্ঞতায় চার্লস বুঝেছে, ইংরেজ তরুণীর হাত ধরে দাঁড়ালেই কলকাতার যে-কোনো সান্ধ্য-পার্টির দ্বার অবারিত। ম্যাকডাওয়েলের মৃত্যু এবং তার নিজের অস্বাভাবিক সৌভাগ্য চার্লস

ম্যাকিনটশের মধ্যে এক পরিষ্কার পরিবর্তন সূচনা করে। সে নিজেও বুঝতে পারে, সে পালটে যাচ্ছে, কিন্তু তা নিয়ে আগের মতো মনোবিকলন করতে বসে না।

চা খেতে খেতে নীলের ওপর সাদা বুটিতোলা ফ্রক পরণে মিস ক্র্যাফটন পা নাচায়।

চার্লস বললে, 'তুমি আমাকে কিছু বলবে মনে হচ্ছে।'

'না, না, চার্লস', মিস ক্র্যাফটন চোখ মটকায়।

'বলো না, বলো না ডার্লিং, তোমার পা নাচানো দেখলে আমার রক্ত হিম হয়ে যায়।'

'সে কি, সে কি, আমি এ রকম ডাইনী তোমার কাছে, তা তো জানতাম না !

'ডাইনী না, ডাইনী না, দেবী। তুমি আমার দেবী।'

মিস ক্র্যাফটন ঘাড় কাৎ করে ম্যাকিনটশকে দেখে এবং গুন গুন করে গান করে। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বলে, 'আমি ভেবেছিলাম, তুমি একেবারে তাজা, একেবারে আনকোরা।'

চার্লস ভয়ে ভয়ে তার প্রেমিকের দিকে তাকায়। হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'এখন তোমার কি মনে হচ্ছে, আমি সেরকম তাজা নই ?'

বিকেলের পড়ন্ত আলোয় তার সুন্দর নখগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চোখের সামনে রেখে মিস ক্র্যাফটন বলে, 'গহরের বোন তোমার কাছে রাতে আসত ?'

চার্লস ম্যাকিনটশ লাফিয়ে উঠে বললে, 'মিথ্যে কথা !

নিরুত্তাপ গলায় মিস ক্র্যাফটন বললে, 'বোসো, অত উত্তেজিত হোয়ো না। ম্যাক নিজেই আমাকে বলেছে।'

'তোমাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নেবার জন্যে বলেছে।'

তার সুন্দর নখগুলো আলোর সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে মিস ক্র্যাফটন বলে, 'অন্য মেয়েরা এ-সব ব্যাপারে খুব গুরুত্ব দেয়', থমকে থাকে সে এক মুহূর্ত। আর সেই থমকে থাকা মুহূর্তে একটা প্রকাণ্ড অনিশ্চিতি যেন চার্লস ম্যাকিনটশকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসে। মিস ক্র্যাফটন আবার বললে, 'অন্য মেয়েরা গুরুত্ব দেয়, আমি দিই না।'

চার্লস ম্যাকিনটশের মুখে হাসির রেখা ফুটতে না ফুটতেই মিস ক্র্যাফটন বললে, 'কিন্তু'...

চোখে কৌতূহল, নিঃস্পন্দ ম্যাকিনটশ। ওদিক থেকে কোনো আওয়াজ আসে

না। হঠাৎ হেসে ফেলে মিস ক্র্যাফটন, 'অত টেনস হোয়ো না চার্লস।' কৌতুকে তার চোখ চকচক করে, 'যদি আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় ঐ চোখে সুরমা-লাগানো মহিলাটিকে দেখি, তা হলে গরম শলা দিয়ে ওর ঐখানে চালিয়ে দেব।' মিস ক্র্যাফটন অদৃশ্য শলাকা দুই হাত দিয়ে ধরে এক পুরুষালি ভঙ্গি করলে।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে চার্লস ম্যাকিনটশ, বললে, 'জুন, জুন,' তুমি সত্যিই ডার্লিং।'

বিয়ের তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারি যত এগিয়ে আসতে থাকে, ততই চার্লস ম্যাকিনটশ একটার পর একটা প্রেমের পরীক্ষা দিয়ে চলে। যেমন সে পুরো দুদিন দমদমের কাছে বাঘ-শিকারে উধাও হয়ে পড়ে। তাঁবু থেকে পত্রবাহকের হাতে প্রেমিকাকে চিঠি পাঠায়, যা অনেকটা মাদাম ইমহোপকে লেখা গভর্ণর-জেনারেলের প্রেমপত্রের মতো। ভারাক্রান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি গদ্যে সে উজাড় করে দেয় গ্রীক দেবদেবীর উপমা। তার মাঝখানে মাঝখানে অনেকটা এ রকম মনোভাব—'আমি বাঘের পেটেই যাবো স্থির করেছি, কারণ, তুমি তো আমাকে ভালোবাস না।' পড়তে পড়তে আহ্লাদে টলমল করে মিস ক্র্যাফটন। নিজের মনে বলে, 'হাউ সুইট ! হাউ সুইট !'

ফিরে আসার পর নিভৃতে ক্ল্যারেট পান করতে করতে সে বায়না দেয়, তাকেও শিকার-পার্টিতে নিয়ে যেতে হবে।

'অসম্ভব ! তোমার যে ডেলিকেট নার্ভ !' চার্লস বললে।

'তুমি আমাকে জান না চার্লস। দরকার হলে আমি পুরুষমানুষের চেয়েও শক্ত।'

'কিন্তু বিয়ের তারিখ পয়লা। এর মধ্যে কোনো একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে।'

'নার্ভাস হোয়ো না চার্লস, নার্ভাস পুরুষমানুষ আমার ভালো লাগে না।'

চার্লস বললে, 'ঠিক আছে, আমরা পাখি শিকারে যাব। শীতে অনেক পাখি আসছে। ফাউলার সেদিন বলছিল।'

পরের সপ্তাহটা পাখি-শিকারের তোড়জোড়ে কাটে। তিনখানা বজরা নিয়ে গার্ডেনরীচে হিকি সাহেবের বাগানবাড়িতে ওঠা হবে। একটু এগিয়েই জঙ্গলের ধারে পাঁচ মাইল লম্বা ঝিল। স্থির হল ডক্টর ডিকি ফাউলারের পরিবার সঙ্গে যাবে। এক বজরায় খাবার-দাবার, বাবুর্চি, আর-এক বজরায় চাকর-বাকর, পাইক-বরকন্দাজ, আর-এক বজরায় সাহেব-মেমসাহেব। হিকি

সাহেবের পেটের অসুখ চলছে, তিনি আসতে পারবেন না। তবে মাল্লাসুদ্ধ তাঁর বজরা যাবে পিকনিক-পার্টিতে। আর-এক তরুণ ইংরেজ চিত্রকরকে সঙ্গে নিতে অনুরোধ জানিয়েছে হিকি, কলকাতার এবং আশেপাশের অনেক ছবি আঁকছে ছোকরা।

কানাই তিন-চারদিন হল বিছানা থেকে উঠেছে। দুটো রুপোর গড়গড়া তৈরি করে সে নিয়ে আসে শ্বেত-পাথরের গোল-টেবিল ঘিরে বসা অতিথিদের কাছে। সকাল থেকেই পান চলছে।

ফাউলার তীক্ষ্ণচোখে কানাইকে দেখে বললে, 'এই সেই ছোকরা নয়?'

ডক্টর ডিকি বললে, 'হ্যাঁ, শাস্তিও পেয়েছে খুব।'

মিসেস ডিকি বললে, 'তুমি জেমস, বড্ড তাড়াতাড়ি গলে যাও।'

ডক্টর ডিকি উদার হয়ে বললে, 'আসলে ওর লাভারের জন্যেই ও ওটা করেছিল। দ্যাখ, তোমার একটু প্রেমের জন্যে আমি সারাজীবন কত কিছু করেছি।'

'তোমার কাহিনীগুলো একটার পর একটা ফাঁক করে দেব?'

'কি যে বল, কি যে বল ডার্লিং। তোমাকে না-বলা আমার কিছুই নেই, তোমাকে অদেয় আমার কিছু আছে?

মিস ক্র্যাফটন খুক খুক করে হেসে বললে, 'আমি দেখছি গভর্ণর-জেনারেলের রোগ সবাইকে পেয়ে বসেছে।'

চার্লস শঙ্কিতভাবে বললে, 'কিসের রোগ?'

'কবিতার রোগ। চার্লস আজকাল কবিতা করে কথা বলে। সব গ্রীক দেব-দেবীর কথা চিঠিতে লেখে।'

মিসেস ফাউলার বললে, 'চার্লস তোমাকে কখন চিঠি লেখে? সে তো সব সময় তোমার আঁচলের তলায়।'

'বাঃ, তাই বলে চিঠি লিখবে না? কাছে থেকেই তো মানুষ দূরে চলে যায়।'

ডক্টর ডিকি জোরে হেসে উঠে বললে, 'তুমিও গভর্ণর-জেনারেলের রোগে পড়েছ।' তারপর দাঁড়িয়ে উঠে গেলাস তুলে চেঁচালে, 'থ্রি চিয়ার্স ফর দ্য গভর্ণর-জেনারেল, হিপ, হিপ।' সমবেত-কণ্ঠে রোল উঠল, 'হুররে!'

গঙ্গার ওপরে শীতের সকাল বড় মায়াবী। পাড়ের ধারে আম-জাম-নারকেল-বন, শিবমন্দির! ঘাটে কলসী-কাঁখে গৃহস্থবধূ, এমন-কি গাছে গাছে বাঁদর, ময়ূর, কখনো কখনো খরগোশ, গুড়ের নাগরিভর্তি পালতোলা নৌকো, মাঝে-মাঝে সমুদ্রোপকূলগামী বড় উঁচু পর্তুগীজ নৌকো, জলের ওপর পাক-খাওয়া

গাঙচিলের ঝাঁক, এই সমস্ত-কিছু দু-চোখ ভরে একজন তৃষ্ণার্ত মানুষের মতো পান করতে থাকে কানাই। কখন নিজের মনেই গুনগুন করে গাইতে থাকে।

'যাত্রাদলে ছিলে নাকি?' শীতল প্রশ্ন করে দাঁড় টানতে টানতে।

চমকে উঠে তাকায় কানাই। অনেকদিন পর স্বাভাবিকভাবে একটা মানুষ তার সঙ্গে কথা বলছে।

বৃদ্ধ সুরথ হাল থেকে মাঝে মাঝে চোখ কুঁচকে কানাইকে লক্ষ্য করছিল। বললে, 'তুমি সেই লক্ষ্মণ দাসের ভাই না? কোথায় যেন? শিবগ্রাম?'

সেদিকে মুখ ফিরিয়ে কানাই বললে, 'আমি নবগ্রামের কানাই। লক্ষ্মণ আমার দাদা।'

শীতল আরো জোরে দাঁড় বাইতে থাকে। আর দাঁড় বাওয়ার মাঝখানে তার কথাগুলো ছিটকে আসে। 'তোমার দাদার কথা আমরা সবাই জানি।'

কানাই চুপ করে থাকে। খুব ইচ্ছে করে এই তাদের গায়ের মানুষগুলোর মতো মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপ করে যেমন কিছুদিন আগেই সে করত, কিন্তু এখন সে কেমন আত্মসচেতন। তার কেমন মনে হতে থাকে, শীতল তাকে খুঁটিয়ে দেখছে। তার বুকের নীলচে পোড়া অর্ধচন্দ্র সে দেখতে পেয়েছে। সেই দাগ তাকে আলাদা করে দিয়েছে চারপাশের অসংখ্য মানুষের কাছ থেকে। এমন-কি, গঙ্গার তীরে এই মনোমোহিনী শোভা থেকেও তাকে দূরে সরিয়ে রাখছে।

গলা নিচু করে বললে, 'একটা রাস্তা বাৎলে দাও-না দাদা।'

শীতল কথা বলে না। আরো জোরে দাঁড় টানে। পাশের দাঁড়ির দিকে ভয়ে ভয়ে তাকায়।

এবার ফিসফিস করে কানাই বলে, 'আমি তোমাদের মতোই গাঁয়ের ছেলে। আর গোলাম হয়ে থাকতে পারব না। আমি দাঁড় টানতে পারি। জাল ফেলতে পারি।'

সুরথ হাঁক দেয়, 'বা, জোরে বা।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে কানাইয়ের দিকে চেয়ে শীতল দাঁড় বইতে থাকে।

ডাক্তার সাহেবের হাঁক আসে, 'কানাই।'

হিকি সাহেবের বাগান, শীতের কমলা-রোদ্দুরে অপরূপ। বটল পামের সার দেওয়া রাস্তা, বারান্দায় থাকে থাকে সাজানো চন্দ্রমল্লিকা। সামনে ছাঁটা ঘন

সবুজ লন।

বেতের চেয়ারে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে মিস ক্র্যাফটন বললে, 'চমৎকার! মনে হচ্ছে আমরা ইংলণ্ডে বসে আছি।'

মেজর ফাউলার বললে, 'সত্যি কথা বলতে কি, ইংলণ্ডের অধিবাসীদের চেয়ে আমরা অনেক ভালো আছি।'

মিসেস ফাউলার বললে, 'জানো, আমার বোনের চিঠি এসেছে। চাকর-বাকরের কি ক্রাইসিস! আমার বোনকে এখন নিজের হাতে কাপড় কাচতে হচ্ছে, ভাবতে পারো?'

যেন একটা ভিন্ন গ্রহের মতো তার ইংলণ্ডের জীবনযাত্রা মুহূর্তের মধ্যে চার্লসের মনে ভেসে ওঠে। রাস্তার মোড়ে সাবান-মাখানো ডাঙ্গিল ডাঙ্গিল কাপড় পিটছে পাড়ার মহিলারা। আর সেই টাউনশেণ্ড কোম্পানির অন্ধকার ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া কাঠের বাড়ি।

অদূরে আর-একটা বেশ সাজানো বাগানবাড়ি দেখা যায়। মিস ক্র্যাফটন সেদিকে চেয়ে বললে, 'ওটা কার বাড়ি?'

'ওটা সামনের রোববার নিলামে উঠছে', ফাউলার বললে। তারপর মিস ক্র্যাফটনের দিকে চেয়ে বললে, 'বাড়িটা হিকির বাড়ির থেকেও বড়। বাগানের জমিও বেশি, একটু জংলা বটে। তা সে দুদিনেই সাফ করে নেওয়া যায়। তোমার যদি পছন্দ হয় আমি তোমার হয়ে নিলাম ডাকতে পারি।'

মিস ক্র্যাফটন চার্লসের দিকে এক নজর চেয়ে বললে, 'কার বাড়ি?'

'আসলে এক ডাচ ভদ্রলোকের বাড়ি। কিনেছিল একজন নেটিভ ব্যবসায়ী। ভীষণ অহংকারী লোক। তেমনি টাইট খেয়েছে।'

'কৃষ্ণগোপাল? কৃষ্ণগোপালের অবস্থা যে এত খারাপ হয়ে গেছে তা তো জানতাম না', চার্লস বললে।

'বড্ড বাড় বেড়েছিল। গত বছর বড়দিনে তার বাড়িতে ডিনার দিলে। সে কি এলাহি কাণ্ড! যেন একজন কাউন্সিল মেম্বর! কৃষ্ণগোপাল ভাবত, ইংরেজের কায়দায় ব্যবসা করে ও ইংরেজ বনে গিয়েছে। এখন টাইটও খেয়েছে তেমনি। ওর সব লাইসেন্স ক্যানসেল করে দেওয়া হয়েছে। শুনছি কলকাতার কাছে এখন জমিজমা কিনবে। জমিদার হবে।'

ডক্টর ডিকি বললে, 'আমাদের ইণ্টেলিজেন্সের খবর, লোকটা সত্যিই বিপজ্জনক। ওপরে ওপরে পার্টি দিচ্ছে, আর তলে তলে লোক খ্যাপাচ্ছে। এই তাঁতিদের মধ্যে

যে কয়েকটা গণ্ডগোল হল তার মূলে নাকি কৃষ্ণগোপাল।

চার্লস বললে, 'ডার্লিং, আমরা শিকার-ফেরতা বাড়িটা একবার দেখে আসব। তোমার শরীরও তো খারাপ যাচ্ছে। এখানে দেখছি গঙ্গার হাওয়াটা চমৎকার।'

ক্ল্যারেট রোস্ট চিকেন আর পর্ক চপ দিয়ে একটা তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে শিকার-পার্টি বেরোয়। ঘোড়া তৈরি ছিল, সামনে পাগড়ি-আঁটা বরকন্দাজরা বল্লম আর গাদা বন্দুক হাতে চলে, তারপর সাহেব-মেমসাহেবদের ঘোড়া। দেখা গেল, মিস ক্র্যাফটন ঘোড়ায় চাপা ইতিমধ্যেই বেশ আয়ত্ত করেছে, লাগাম হাতে নিয়েই সে ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা এগিয়ে যায়, তবে স্থূলকায়া মিসেস ডিকির একটু অসুবিধে। তার লাগাম ধরে সহিস হাঁটে। মিসেস ফাউলারের ও অসুবিধে নেই, সে বিনে সহিসে টগবগিয়ে চলে। পেছনে কাতার-দেওয়া চাকর-বাকর, মাঝি-মাল্লা। মাঝে মাঝে মাটির বাড়ির বাইরে উৎসুক গ্রামবাসী। একদল বালক মজা দেখবার জন্যে একটু দূরত্ব বজায় রেখে শিকার পার্টিকে অনুসরণ করে। মাইল-খানেক যেতে না যেতেই গাছপালা ঘন ঝোপের ওপার থেকে একটানা একটা আওয়াজ আসতে থাকে—কোয়া, কোয়া, কোয়া, কোয়া…

ফাউলার মিস ক্র্যাফটনের পাশে যেতে যেতে বললে, 'ডাকস, ওয়াইল্ড ডাকস।' শিকারীর দল যত এগোয়, আওয়াজ তত বাড়ে, খুব সুরেলা নয়, কর্কশ একটানা শব্দ।

মিস ক্র্যাফটন বললে, 'আমি কিন্তু একবার সুট করব।'

'নিশ্চয়, আমার ডাবল-ব্যারেলটা এনেছি তোমার জন্যে', ফাউলার বলে।

উঁচু বাঁধের ওপর শিকারীরা উঠতেই সামনে ঝিলটা দেখা যায়। একদিকে ঘন পদ্মবন। লম্বা চকচকে নীলচে জল শীতের রোদ পোয়াচ্ছে। সামনে একটা বাঁক খেয়ে দিগন্তে মিলে গেছে ঝিল। ওপারে ঘন সবুজ ঢাল, সেই সবুজ মখমলের মাঝে মাঝে বাদামী নক্‌শা পাড়—আওয়াজটা ওদিক থেকে আসছে। এত লোক জলের ধারে গেলেই পাখিদের নজরে আসবে। সেজন্যে একটা বড় বটের নীচে খানসামা, বাবুর্চি, হুঁকাবরদার এই ধরণের কিছু লোক রাখা হয়। তারা এখানে সাহেবদের জন্যে একটা হাই টি-র ব্যবস্থা করবে। আর শিকারীরা আস্তে আস্তে মাথা নিচু করে এগোতে থাকে জলের দিকে।

'আমার দারুণ একসাইটেড লাগছে চার্লস, গুঁড়ি মেরে যেতে যেতে চার্লসের হাতখানা টেনে তার বুকের ওপর রেখে মিস ক্র্যাফটন বললে।

'তোমার তা হলে যাবার দরকার নেই। আমরা দুজন বরং থেকে যাই।'

'দূর, কি-যে বল! ইণ্ডিয়াতে এলাম, এখনো শিকারের অভিজ্ঞতা হয়নি।'

ফাউলার ঠোঁটের ওপর তর্জনী রেখে সবাইকে নিঃশব্দ হতে বলে। তারপর তার বেয়ারার হাত থেকে বাণ্ডিল নিয়ে সবুজ কতগুলো সিল্কের পর্দা বার করে সবাইকে গায়ে জড়িয়ে নিতে বলে।

'গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড! আমাকে কেমন লাগছে চার্লস্ ?' সবুজ চাদর মুড়ি দিয়ে মিস ক্র্যাফটন বলে।

'চুপ, আর কথা নয়। আস্তে আস্তে নৌকোয় উঠে বস। আমি আর মিস ক্র্যাফটন প্রথম নৌকোয়, তারপর চার্লস আর মিসেস ডিকি আর আমার স্ত্রী তিনখানা নৌকো খুব আস্তে আস্তে যাবে। আগে মিস ক্র্যাফটন ফায়ার করবে। তারপর অন্যেরা।'

মিসেস ডিকি বললে, 'আমি ও-সব ফায়ার-টায়ারের মধ্যে নেই। বন্দুক ফেটে হাড় জখম হওয়ার কেস অনেক দেখেছি। আমি ওর মধ্যে নেই।'

'আমিও না', মিসেস ফাউলার বললে।

'এগুলো নতুন ধরণের বন্দুক, একদম ফাটে না। তোমরা চোখ বুজে ফায়ার করতে পার।'

মিসসে ডিকি জোর দিয়ে বললে, আমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকই থাকতে চাই। মরদ হবার বাসনা নেই।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, তোমরা কথা বোলো না', ডক্টর ডিকি বললে।

শীতল আর সুরথ আস্তে আস্তে লগি ঠেলে এগোয়। পেছনে আর দুটো নৌকো। মেজর ফাউলার একট ডবল-ব্যারেল প্রধান অতিথির হাতে দিয়ে বললে, 'আমি যখন বলব, তখন ফায়ার করবে, তার আগে না।'

এ নৌকোগুলো অনেক ছোট, প্রায় ডোঙার মতো। ডোঙার নীচ দিয়ে জল চলে।

'ডুবে যাবে না তো, সেদিকে চেয়ে চার্লস-প্রেমিকা বললে।

'ওদিকে তাকিয়ো না, এই দ্যাখ, পাড় এগিয়ে আছছে। এবার ঐ ব্রাউন প্যাচগুলো বুঝতে পারছ কি?'

এখন বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। বাদামী পাখিগুলো একটু উড়ে আবার বসে পড়ে। তাদের পেটের কাছটা নীলচে সবুজ, গা বাদামী, গলা সাদা।

'হাউ সুইট!'

'কথা বোলো না।'

পাড় যত এগিয়ে আসে মিস ক্র্যাফটনের উত্তেজনা তত বাড়ে। পাড়ের কাছটা ঘন পদ্মবন।

ফাউলার বললে, 'তুমি একটু ভেতরের দিকে চেপে বসো, সাপ-টাপ থাকতে পারে।'

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে মিস ক্র্যাফটন, ডোঙা টলমল করে ওঠে। সুরথ হাঁক দেয়, 'হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!' ফাউলার তার সঙ্গিণীকে হাত ধরে চেপে বসিয়ে দেয়, কিন্তু ইতিমধ্যেই আওয়াজে হাঁসগুলো টের পেয়ে যায়। সামনের ঝাঁকটা শূন্যে উঠে পড়ে। দেখাদেখি দ্বিতীয় ঝাঁক।

'ফায়ার! ফায়ার! ফাউলার হাঁক দেয়, কিন্তু ভয়ে, উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করে বসে থাকে মিস ক্র্যাফটন। তার হাত থেকে এক হ্যাঁচকায় বন্দুকটা নিয়েই ফাউলার আকাশে উড়ন্ত ঝাঁক লক্ষ করে পর পর দু-বার ফায়ার করে, সঙ্গে সঙ্গে পেছন থেকে আরো বন্দুকের গর্জন শোনা যায়। ঝটপট ঝটপট করে বুনো হাঁস পড়তে থাকে, এক একটা পাখি শূন্যে আরো উঁচুতে পাক খেতে খেতে উঠে আবার জলে পড়ে।

মিস ক্র্যাফটন চেঁচিয়ে বলে, 'ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!'

পেছনের ডোঙা থেকে চার্লস চেঁচায়, 'আর ইউ অলরাইট ডার্লিং?'

বেজারভাবে ফাউলার বললে, 'শি ইজ পারফেক্টলি অলরাইট।'

এবার সবুজ মখমলে বাদামী নক্শার চিহ্ন নাই। একটার পর একটা ঝাক উড়তে থাকে, বরকন্দাজরাও ফায়ার করে। তারপর মাল্লারা, পাইকরা নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে রক্তের ছিটেলাগা সেই নীলচে সবুজ বাদামী পালক আর তাজা প্রাণের বাণ্ডিলগুলো ডোঙার কোণে স্তূপ করে জড়ো করে।

চার্লস উত্তেজিত হয়ে বললে, আমি অন্তত পাঁচটা নামিয়েছি।'

ডক্টর ডিকি বললে, 'আমি অন্তত সাতটা', কোনো কোনো বরকন্দাজের মুখে একটু ফিকে হাসি ফুটেই মিলিয়ে যায়।

ফাউলার বেজারভাবে বললে, 'তোমরা যে এমন দক্ষ শিকারী আগে জানতাম না।'

বিকেল পড়ে আসছে। কানাই লক্ষ্য করছিল মাথায় লালটুপি আঁটা সেই ইংরেজ চিত্রকর। চিত্রকর পাড়ে বসে শিকারের ছবি স্কেচ করছে—ডোঙার উপর সাহেব, মেমসাহেব, একজন ব্রিচেসআঁটা সাহেব ডোঙায় দাঁড়িয়ে বন্দুক

তাক করে আছে, আকাশে বুনো হাঁসের ঝাঁক। তবে যেজন্যে কানাই অবাক হয়, তার কারণ শিল্পীর আঁকা গাছের স্কেচগুলো। এগুলো চারপাশের আম-জাম-কাঁঠাল-নারকেল নয়। কানাই জানত না, শিল্পী গাছ বলতেই ওক, পপলার বোঝে। কাজেই পপলারের ফাঁকে একটা শিবমন্দির তার চোখে কিছুটা বিসদৃশ লেগেছিল।

কতদিন হয়ে গেছে—কানাই বটের শিকড়ে মাথা রেখে ভাবে। রূপী আজকাল তাকে এড়িয়ে চলে, সামনে পড়লে চোখ নামিয়ে নেয়। অথচ সে টের পায়, তাকে সে লক্ষ্য করছে। একদিন কাছে এসে জিজ্ঞাসাও সে করেছিল, 'আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিস?' রূপী জবাব না দিয়ে হেসেছিল। কাছেই গ্রাম। কতগুলো ন্যাংটো ছেলে ছাগল চরাতে চরাতে তাদের লক্ষ্য করে। সেদিকে চেয়ে চেয়ে কানাইয়ের মাথায় যে কথাটা বেশ কিছুদিন হল ঘুরছে তাই চাড়া দিয়ে ওঠে। এ জীবনের বন্ধন কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে, অজস্র ঝুঁকি মাথায় নিয়েও বেরুতে হবে। এ রকম তালগাছের নীচে ছাগল-চরা জলের ধারে তাকে বসতে হবে—রূপীকে নিয়ে। কারণ, সে যেখানেই থাক, তার পাশে যদি রূপী থাকে, তা হলে তার কাছে অচেনা, অপরিচিত কিছুই লাগবে না। তার পাশে সব সময় একজন আছে, যার সঙ্গে সে একই গাঁয়ে বড় হয়েছে, একইসঙ্গে নদীতে ঝাঁপিয়েছে, পাখি ধরেছে।

শিকার-পার্টির একদল ফিরে আসে। শীতলের দু হাতে ঝুলছে বুনো হাঁস। আরো দু-তিনজন হাঁস আনে। সেগুলো গাদি করে রাখা হয়। সাহেব-মেমসাহেবের দল ধীরে-সুস্থে আসছে।

বাবুর্চি, খানসামারা চায়ের ব্যবস্থা করে। কেক, ছুরি সাজানো হতে থাকে। গাছের কোটরে পাতা উনুনে চায়ের জল ফোটে।

বিড়ি ধরিয়ে শীতল কানাইয়ের পাশে এসে বসে—বলে, 'খুব গাঁয়ের কথা মনে হচ্ছে না? প্রথম প্রথম সবাইয়ের ও রকম হয়।'

'আমার একটা ব্যবস্থা করে দাও-না দাদা, মরি মরব। আমি ঠিক পারব। আমি লুকিয়ে তোমাদের জেলে-নৌকোতে গিয়ে উঠব। সেখান থেকে নৌকো বেয়ে…'

'ধরা পড়লে?'

কানাই শান্তস্বরে বললে, 'ধরা পড়লে মরব।'

'অত সোজা নয়। ওদের পুলিশ যখন বলবে, কারা তোমার পেছনে ছিল তখন? ও-সব অনেক বড় বড় কথা শুনেছি। কথায় চিঁড়ে ভেজে না।

তোমাকে সাহায্য করতে গিয়ে আমি কেন বিপদে পড়ব ?'

'এই কথাটাই আমার দাদা বলত, কেউ বিপদের ঝুঁকি নেবে না, সবাই দূরে থেকে দাঁড়িয়ে আহা, উহু করবে।'

নেবা বিড়িটা দূরে ছুড়ে দিয়ে শীতল বললে, 'একটা উপায় আছে।' তারপর কানাইয়ের জিজ্ঞাসু চোখের দিকে চেয়ে আর-একটা বিড়ি ধরায়।

কানাই বললে, 'কি উপায় বল, এখনই ওরা এসে পড়বে।'

'শুনেছি, চন্দননগরে আইন করে এই ব্যবসাটা তুলে দিচ্ছে। ওখানে প্রত্যেক জাহাজ চেক করে, গোলাম, বাঁদী পেলেই নামিয়ে দেয়।'

উৎসাহে চোখ জ্বলে ওঠে কানাইয়ের। ফিস ফিস করে বলে, 'আমরা পালাব, আমরা চন্দননগর পালাব।'

'আমরা কি রে ?'

'আমরা···মানে, আমি আর রূপী।'

'রূপী ? মেয়েমানুষ ? তুই বিয়ে করেছিস ?'

কানাই মাথা নিচু করে বলে, 'রূপী আমাকে ভালোবাসে।'

'তা হলে তুই মর।'

'সেও নৌকো বাইতে পারে।'

'না, না, ও-সব মেয়েছেলে-টেয়েছেলে পারব না, ধরা পড়ে যাব। তখন আমাদের কে বাঁচাবে ? তোমার দাদা একটা-দুটো পাওয়া যায়। আমরা তোমার দাদা নই। আমরা জীবনটাকে ভালোবাসি।'

'জীবনটাকে ভালোবাসি বলেই তো পালিয়ে যেতে চাই দাদা।'

দৃঢ়কণ্ঠে শীতল বললে, 'লেজুড় নেওয়া চলবে না। লেজুড় না নিলে একবার দেখতে পারি। আর একটা কথা তোমাকে বলে রাখি, এখনো ওরা নদীটা আয়ত্ত করতে পারেনি। জল যতখানি আছে ততদূর তোমার জীবন। জল থেকে উঠলেই তোমাকে মেরে দেবে।'

'কবে যাব ?'

'তুই একটা ক্ষ্যাপা বটে! এখন কোথায় ? আগে ম্যাকিনটশ সাহেবের বিয়ে-থা হোক। সাহেব বাগানবাড়ি কিনেছে। বজরা কিনবে। বজরায় নতুন বউ নিয়ে সারারাত নাচগান হবে। সেই ফাঁকে যদি পার···। তবে একটা কথা বলে রাখি। আমাদের নৌকো যায় চন্দননগরের দিকে মাছ ধরতে। যদি বিপদে পড়ে, পাইক-বরকন্দাজ আসে, তার আগে তোমায় জলে ফেলে দেব।

এই সর্তে যদি রাজি থাক…'

'রাজি, আমি রাজি।'

'এ-সব হতে হতে ফাগুন-চোত।'

'তার আগে হয় না। আমি যে আর পারছি না দাদা।'

শীতল উঠে পড়ে বলে, 'অনেক কিছু পারতে হয়।'

ওদিকে শিকার-পার্টির ফেরার মুখে এক কাণ্ড। ঘোড়সওয়ারদের সামনে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে মুখোমুখি কৌতূহলী একজোড়া শ্বেতমৃগ। বেঁটে সাদা ধবধবে গা, মাথায় পাকানো কুচকুচে কালো শিং। কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই, কৌতূহলী বিশাল চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে। মিস ক্র্যাফটনের 'হাউ সুইট! হাউ সুইট!' ধ্বনি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই পাশ থেকে ফাউলারের ডাবল-ব্যারেল গর্জন করে উঠে। বিদ্যুৎগতিতে শূন্যে লাফিয়ে তারা পেছন ফেরে, কিন্তু পেছনেরটা খানিক দূরে পড়েই ছটফট করে।

চার্লস বলসে, 'তুমি ওটা না মারলেই পারতে মেজর। হরিণের মাংস বড্ড দড়কচা!'

ফাউলার জবাব দিলে, 'তাতে কি, চাকর-বাকরেরা খাবে।'

একজন বরকন্দাজ তার বল্লমের ডগায় বেঁধে শিং ঝুলে পড়া ধবধবে সাদা জীবটিকে নিয়ে আসে। ফাউলার বললে, 'শিকারের আসল ব্যাপারই হল ফান। তাই না?'

ম্যাকিনটশ বললে, 'তা অবশ্য।'

পড়ন্ত রোদ্দুরে কৃষ্ণগোপালের বাগানবাড়িটা এমন মায়াময় দেখায় যে, আগন্তুক-দের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। সম্প্রতি বাড়ির 'মালিক দেখাশোনা ছেড়ে দিয়েছে, বুড়ো দারোয়ান জানালে। আস্তাবলও ফাঁকা! সাহেব, মেম-সাহেব দেখে দারোয়ান তৎপর হয়ে ওঠে। দোতলায় রেলিং দেওয়া একটা একতলার সামনে যে ঢাকা বারান্দা ছিল কৃষ্ণগোপালের খুব প্রিয়, সেখানে দাঁড়িয়ে মিস ক্র্যাফটন বললে, 'হাউ লাভলি।'

শোওয়ার ঘর, বসার ঘর, পুরু দামী কার্পেটে মোড়া। বিদেশী আসবাবপত্র। দেয়াল-জোড়া আয়না।

'খুব সৌখিন লোক দেখছি কৃষ্ণগোপাল', চার্লস বললে।

'এদের আর বেশি বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়।' ফাউলার জবাব দেয়।

৭

দেহের ব্যাপারটা যত সোজা ভেবেছিল, সে ঠিক ততখানি সোজা নয়। সে শুধু ভাবেইনি, বলেও ছিল, সাহেব আর কতখানি নেবে? বেশির ভাগটা জমা থাকবে কানাইয়ের জন্যে, কিন্তু সেদিন যখন আবার গা থেকে কাপড় সরে গেল, আর গন্ধে-ভুরভুর একতাল মাংস তার শরীরের সঙ্গে তালগোল পাকিয়ে গেল, তখন তার দম বন্ধ হয়ে আসে। নিঃশ্বাসের জন্যে যেমন কুয়োর ধারে সে আঁকপাঁক করছিল, তেমনি আঁকপাঁক করে। আবার ইচ্ছে হয় প্রতিরোধের, কিন্তু প্রতিরোধ করার জোর আর আগের মতো নেই। কুয়োর পাড়ে সেই জলের নির্যাতনে সে শুধু শারীরিকভাবেই কাহিল হয়নি, মনের দিক থেকেও বিকল হয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় যখন তাকে পুরুষমানুষের ভিড়ের সামনে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়, তখনই সে মৃত্যুকামনা করেছিল। ঘরে ফিরে জ্ঞান হবার পর দেখলে দেবী গডফ্রে 'বিষ' লেখা বাতের মালিশের ওষুধ ঠিক হাতের কাছে রেখে গিয়েছে। বারে বারেই হাত বাড়িয়েছে শিশিটার দিকে। বিশেষ করে সেদিন সন্ধ্যাবেলাতেই তার আন্দাজ হয়েছিল ডাক্তার আজ রাতে আসবে, কিন্তু শিশিটাকে সে হাতের কাছ থেকে দূরে উঁচু তাকের ওপর তুলে রেখেছিল। ডাক্তার ডিকিকেও এবার সে প্রতিরোধ করে না। কাঠের মতো পড়ে থাকে। ডাক্তার তাকে কামক্রীড়ায় উদ্‌বুদ্ধ করার জন্যে হঠাৎ কাতুকুতু দিতে থাকে, কিন্তু কোনো ফল হয় না। শরীরটাকে সাময়িকভাবে রূপী আলাদা করে দিয়েছে, এটা যে-কোনো মেয়ের শরীর। অথবা তার সমস্ত শরীর জুড়ে কেউ যেন অ্যানেস্থেশিয়া প্রয়োগ করেছে, অথচ তার মন সজাগ। ডাক্তারের আঁচড়ানো, কামড়ানো, কিছুতেই তার সাড়া নেই। ডাক্তার তার হাতে একটা টাকা গুঁজে দেয়। হাতের তেলো থেকে তা গড়িয়ে মেঝেতে ঠং করে আওয়াজ তোলে।

সেই ঘটনাটা আরো কয়েকবার ঘটেছে। এখন এই অনুষ্ঠানের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি কি ঘটবে, তার সবটাই জানা, কিন্তু প্রথম রাতের মতোই চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ রাত কেটে গেছে। ডাক্তার খেপে গিয়ে রূপীকে জখম করেছে। একটার বদলে দুটো-তিনটে টাকা তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে, কিন্তু রূপীর

সেই প্রবল দৈহিক শীতলতা সে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে ডাক্তারের মনে হয়েছে সে একটা মড়া ঘাঁটছে, যে মড়া তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে তার দিকে। ডাক্তারের পছন্দ হয় নি। খোলা চোখের ওপর তার মোটা আঙুল রেখেছে।

দেবী গডফ্রে একদিন বললে, 'তুই কি সাহেবকে কিছু খাইয়েছিস ?'

রূপী চুপ করে থাকে। তার কথা আজকাল অনেক কমে গিয়েছে।

'সাহেব কোনো বাঁদীকে টাকা দেয়নি। তোর পেছনে টাকা ঢালছে। আর তুই এমন হেবুলি।'

নিস্তব্ধ রূপীর থুতনী তুলে ধরে বললে, 'তুই কি ভাবছিস বল তো ? ওই ছোঁড়াটাকে নিয়ে ঘর বাঁধবি ? সাহেব, মেমসাহেব যদি বা রাজি হয়, জগা, জগদীশ রাজি হবে ? তা ছাড়া ছেলেটাও তো ভালো নয়। আমি ওর মায়ের বয়সী। আমার দিকে আজকাল কেমনভাবে তাকায়।

রূপী কথা বলে না। এমন-কি কৌতুহলও প্রকাশ করে না।

'তোর কি হয়েছে বল তো ?'

রূপী স্থাণুর মতো বসে থাকে।

এদিকে ঋতুরাজ বসন্ত এল কলকাতায়। বিকেলে হাওয়া দিতে সুরু করেছে, কিন্তু চার্লস ম্যাকিনটশ ও মিস ক্র্যাফটনের বিবাহ পিছিয়ে গেল। তাদের প্রচুর শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রবল ইচ্ছে সত্ত্বেও প্রেমিক-প্রেমিকারা একটু আটঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে চাইলে। প্রেমিকা-প্রেমিককে বলল, 'একবার ঠকেছি চার্লস; আর একবার ঠকতে চাইনে।' চার্লস বললে, 'ঠিক আছে ডার্লিং, আমারও তাই মত। অর্থাৎ সে কি পরিমাণ উত্তরাধিকারিণী, তা মিস ক্র্যাফটনের বিয়ের আগেই সম্যক জানা দরকার, শুধু চার্লসের তারুণ্যের ওপর তো নির্ভর করা যায় না। গোটা বসন্ত কাটল কোম্পানির কাগজপত্তর, ইংলণ্ডে ম্যাকডাওয়েলের ব্যাঙ্কে টাকার হিসেব-নিকেশ করতে। বারওয়েল গভর্ণর-জেনারেলের স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্যে ইংলণ্ড পাড়ি দিলে, তার সঙ্গে গভর্ণর-জেনারেল এবং কাউন্সিল মেম্বারদের দরখাস্ত-সমেত তার স্ত্রীর উত্তরাধিকারিণী হবার দাবি এবং সঙ্গে সঙ্গে মিসেস ম্যাকিনটশের নামে ট্রানস্ফার করার সুপারিশ যায়। এই সব ব্যাপারে ক্রমাগত শলা-পরামর্শ, বিশেষজ্ঞদের অভিমত, সন্ধ্যাবেলায় কনফারেন্স ঘন ঘন বসে। গভর্ণর-জেনারেলের শরীর ও মন মাঝে খারাপ ছিল। স্ত্রী ইংলণ্ডে পাড়ি দেবার পরই তিনি আজকাল একটু খিটখিটে হয়ে পড়েছেন। তাপর ইংলণ্ডের

সংবাদপত্রে অত্যন্ত অশালীন কার্টুন ছাপা আবার শুরু হ'য়েছে। গভর্ণর-জেনারেলের সই আদায় ক'রতেই তিন সপ্তাহ কেটে যায়। শেষকালে বারওয়েলের মারফৎ একটা হিল্লে হয়।
বাস্তবিক ম্যাকিনটশ-ক্র্যাফটনের বিবাহ অনেকটা বড় কোম্পানি বা বিজনেস ফার্ম চালু করার আয়োজনের মত লাগে। এ নিয়ে আইনজ্ঞ, অর্থনীতিবিশারদ, এমন-কি, সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো অভিযোগ থাকলে সে-সব খণ্ডন করার বিশেষজ্ঞ অর্থাৎ আমরা আজকাল যাকে বলি দুর্নীতি, সেই-সব দুর্নীতির অভিযোগ থেকে সম্পত্তি মুক্ত করার প্রয়াস—এই-সমস্ত মিলে একটা জমজমাট ব্যাপার দাঁড়িয়ে যায়। দেখা যায়, চার্লসের চেয়েও এ-সব ব্যাপারে মিস ক্র্যাফটনের উৎসাহ আরো প্রবল।
'ডার্লিং, তোমার সেই কথাটা মনে আছে?'
কথাটা প্রেমিক তোলার সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রেমিকার ভুরু কুঁচকে যায়। বেজার-ভাবে বলে, 'টাকার জন্যে তুমি-আমি কেউই বিয়ে ক'রছি না, এই তো? সেটা তো সবাই জানে।'
'কিন্তু এই চারপাশের···'
'তুমি এখনো ঠিক সাবালক হ'য়ে উঠছ না চার্লস। এইটাই একমাত্র খ্যাঁচ। কি হবে ভাব তো? তুমি কল্পনা ক'রতে পার সেই অবস্থা? বিয়ের পর একদিন জানতে পারব আমরা দুজনে শূন্যে দাঁড়িয়ে আছি? সেজন্যে তো ব্যবস্থা করতে হবে।'
সেই অনিশ্চিতের আতঙ্ক ম্যাকিনটশকেও স্পর্শ করে। তাড়াতাড়ি ব'লে ওঠে, 'তুমি ঠিকই ব'লেছ ডার্লিং, আমরা আর ঠকতে চাই না।'
উঠে গিয়ে সে তার প্রেমিকাকে আলিঙ্গন করে।
সেদিন দুপুরবেলায় বাড়িতে কেউ নেই। সাহেব স্লেভ-হাউসে নিলাম ডাকতে গিয়েছে। মেমসাহেব ম্যাকডাওলেয়ের বাড়ি। রুপীকে খুঁজে বেড়ায় কানাই। ক'-দিন থেকেই তার মনের মধ্যে আবার ঝড় উঠেছে। সেই বুনো হাঁস-শিকারের সন্ধ্যা কতদিন হ'য়ে গেল। ফাগুন-চোত যায় যায়। গত দু'মাস যেন একটা দুর্ভেদ্য আবরণে রুপী নিজেকে ঢেকে রেখেছে। ডাকলে সাড়া দেয়নি। কানাই ডাইনিং-হল পেরিয়ে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ওঠে। একবার উঁকি দিয়ে দেখে সিঁড়ির ওপরে সেই বিশ্রী মহিলাটি আছে নাকি। দেবী গজয়েস্ম চোখ যেন আজকাল সব সময় কানাইকে খুঁজছে এবং সেই চোখের দিকে চোখ

প'ড়লে কানাইয়ের মনে হয় যেন একটা সরীসৃপ তার পিঠ দিয়ে নেমে গেল। একবার পথরোধ ক'রে দাঁড়িয়েও ছিল। ভারী পুরু কার্পেটের ওপর পা টিপে উঠতে উঠতে ভাবলে, আর কিছুতেই সে থাকবে না, কিন্তু রুপীকে সে ফেলে যাবে কেমন করে?

ক্লোকরুমের ভারী পর্দা একটুখানি ফাঁক করে কানাই। রুপী একমনে কাপড় গুছোচ্ছে। কানাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে থাকে। সত্যই সারা শরীরে যৌবনের ঢল নেমেছে রুপীর, তার সেই অনাবৃত দীঘল হাত যা সর্বকালের শিল্পীদের আরাধ্য, তার আগের চেয়ে ভারী বুক, নিতম্ব—এ যেন আর এক রুপী। পায়ের খস্‌খস্‌ শব্দে রুপী চমকে উঠে কানাইকে দেখে হেসে ফেলে। কানাই এসে তার হাত ধ'রে বললে, 'রুপী, তুই কি সুন্দর।'

রুপী কানাইয়ের হাত ধরে মেঝেতে বসে।

কানাই সভয়ে বললে, 'দেবীদি কোথায়?'

'ভয় নেই, দেবীদি ঘুমোচ্ছে।'

কানাই তার হাত বাড়িয়ে রুপীর মুখখানা তুলে তারে চোখ ভ'রে দেখতে থাকে এই অপরিচিতাকে। রুপীর মুখের রেখাও যেন পালটে গেছে।

কানাই ব'ললে, 'রুপী, আমি ব'লেছিলাম না, তোর জন্যে মরব? এবার তাই হবে।'

রুপী হেসে ব'ললে, 'এবারে কি ভাঙবি? ঝাড়লণ্ঠন?'

'এবারে তোকে ভাঙব।

'রুপী ছল ছল করে হেসে ওঠে, 'ভাঙ, আমাকে ভাঙ, এখনই ভাঙ।'

'তুই যে আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছিস? বল, বল, আমার সঙ্গে মরবি?'

রুপী এবার একদৃষ্টিতে কানাইকে দেখে। সে চোখে মমতায় ভরা সস্নেহ দৃষ্টি, কিছুটা যেন ক্লান্ত, আবার কিছুটা উদগ্রীবও।

'তুই আমাকে বড্ড বাচ্চা ভাবিস, না রে রুপী?'

'তুই তো বাচ্চাই', রুপী কানাইয়ের পিঠে হাত রাখে।

'এই গরম প'ড়লে সাহেব-মেমসাহেব যাবে নৌকোয়, সবাই যাবে। সারারাত নাচ-গান হবে। আমরাও যাব। জেলেদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমরা···

রুপী কানাইয়ের হাতখানা টেনে নিয়ে বললে, 'তুই আমার একটা কথা শুনবি?

কানাই সেদিকে কান না দিয়ে বললে, 'জানিস রুপী, চন্দননগরে এই দাস-ব্যবসা উঠে গেছে। আমরা জেলেদের নৌকো বেয়ে চ'লে যাবো চন্দননগর। পারবি

না ? পারবি না রূপী ?'

রূপী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে বললে, 'কানাই, আমার পেটে ছেলে এসেছে।'

কানাই হতভম্ব হ'য়ে পড়ে। হাবার মতো বললে, 'ছেলে এসেছে ? তার দৃষ্টি একেবারে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে। রূপীর মুখ থেকে তার দৃষ্টি দেওয়াল, কড়িকাঠ ঘুরে আসে।

রূপী আবার একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কানাইয়ের দিকে। এমন একটা অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তার যে কানাইয়ের মনে হয় তার মনের সমস্ত আনাচে-কানাচে তা ছড়িয়ে গেছে।

শান্ত গলায় রূপী ব'ললে, 'এর পর তো তুই আমাকে সঙ্গে নিবি না। এর পর তুই আমার জন্যে মরবি না, তাই না কানাই ?'

কানাইয়ের মনে প্রশ্নের ঝড় উঠেছিল, কিন্তু রূপীর চোখের দিকে তাকিয়েই সে প্রশ্নের জবাব পায়। বরং এই নতুন রূপী তাকে আরো প্রবলভাবে অভিভূত করে যেমনভাবে নদীর ধারে তার গ্রামের স্মৃতি তাকে আকর্ষণ করে তেমনি একটা আকর্ষণ সে বোধ করে তার সমস্ত শরীর জুড়ে। জবাব না দিয়ে সে তার মাথাটা রাখে রূপীর বুকের ওপর এবং তখনই স্থির করে, যদি মরে একসঙ্গেই মরবে, যদি বাঁচে একসঙ্গেই বাঁচবে।

কতক্ষণ তারা এ ভাবে বসেছিল খেয়াল নেই ! বাতাসে জানলা পড়ে। রূপী চমকে উঠে বলে, 'কানাই।'

'কি ? কিছু বলবি ?'

রূপী হাসে, 'না, এমনি।'

কানাই ব'ললে, 'তোকে একটা কথা জিগ্যেস করব। রাগ করিস না। সেদিন বিকেলে দেখলাম তুই, মেমসাহেবের সঙ্গে ফিটনে ক'রে বেরোলি।'

রূপী আবার হেসে উঠল। তার সমস্ত বাধা যেন কেটে গেছে। স্বচ্ছ আনন্দে ঝল্‌মল্‌ করে তার মুখ। কানাই বলে, 'বল-না, হাসছিস কেন ?'

'আমার আজকাল খুব কদর, জানিস। আমি নাকি খুব ভালো চুল বাঁধি। ঐ-যে নতুন মেমসাহেব, একবার বিয়ে ক'রল, আবার ক'রছে…'

'হ্যাঁ, তোর মতো।'

রূপী আবার হাসে। 'আমি এখন ছবি দেখে চুল বাঁধি। সেই নতুন মেমসাহেবের বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। আমাকে কিছুতেই ছাড়বে না। আমাকে অনেক ব'লে-ক'য়ে আমাদের মেমসাহেব ফিরিয়ে এনেছে।'

খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেমে বললে, 'কত রকমারি গন্ধ। ওরা বলে সেণ্ট। একদিন লুকিয়ে এনে খুব ক'রে তোকে মাখাব।'

কানাই সভয়ে বললে, 'না, না, ও-সব করিস্‌নে। আবার ধরা প'ড়ে যাব। এবার ধরা প'ড়লে তোকেও ছাড়বে না, তোকেও চাবুক মারবে।'

'তা হ'লে যখন পালাব, তখন কয়েকটা সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'দূর! ও-সব গন্ধ-টন্ধ আমার ভালো লাগে না। তুই আমার বাগান রূপী। তুই আমার পাশে থাকলে আমার চারদিকে ফুল ফোটে।'

১০

গরমের হাওয়া দিচ্ছে। গহরের বোন বাহারে গান ধরে 'ফুলাতা হোলি খেলি।' তারপরে একসঙ্গে তিনজন ঝম্‌ঝমিয়ে এগিয়ে এসে নাচ সুরু করে। গহরের বোন চার্লসের আশেপাশে ঘোরে, কটাক্ষ হানে। ডাচ ক্ল্যারেট-তৃপ্ত চোখ সেদিকে মেলে চার্লস ম্যাকিনটশ তারিফ করে 'ব্রাভো!'

পাশ থেকে নববিবাহিতা স্ত্রী বলে, 'অমন ক'রে তাকিয়ো না, চোখ গেলে দেব।' তার রসিকতায় মেজর ফাউলার চেঁচিয়ে হেসে ওঠে।

'সত্যি এরকম বিয়ে ক'লকাতায় আর কখনো দেখিনি।'

বোর্ড অফ ট্রেডের একজন সদস্য দাঁড়িয়ে উঠে রসস্থ গলায় ব'ললে, 'আমি কিছু ব'লতে চাই।'

চার্লস হাত দেখায়। নাচ থামে। গহরের বোন মিট্‌ মিট্‌ ক'রে হাসে।

ঢ্যাঙা ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে জলকাটার মতো তার ডান হাতখানা শূন্যের ওপর আছাড় দিয়ে ব'ললে, 'কোনো বৈপরীত্য নেই (কন্‌ট্রাডিক্‌শন্‌)। ম্যাকডাওয়েলও যা, চার্লস ম্যাকিনটশও তাই। ম্যাকডাওয়েলও যা...'

আর বলা সম্ভব নয়। সবাই 'হিয়ার হিয়ার!' ধ্বনি তোলে।

আবার নাচ চলে। ক্ল্যারেট ম্যাডেরিয়ার ছিপি ঠকাঠক্‌ খোলে।

মিসেস ফাউলার তার জেডের পেন্‌ডেণ্ট বুকের মাঝখানে ঠিক ক'রে ব'ললে, 'সত্যি, এমন বিয়ে ক'লকাতা শহরে...'

'আর ফায়ার-ওয়ার্কস!' মিসেস ডিকি বললে।

'চলো ডার্লিং, ফায়ার-ওয়ার্কস দেখি।'

সারা সন্ধ্যে জুড়েই বাজি পুড়ছে। এখন অনেক ক'মে এসেছে। গ্রীণ বোটের

জানালার কাছে নবদম্পতি দাঁড়ায় এবং ঠিক এই সময় একটা হাউই ওঠে। সবুজ আলোর মালা জলের ওপর ভাসতে ভাসতে চলে।
'হাউ লাভলি!' নববধূ তার স্বামীর হাতে চাপ দিয়ে বললে, 'আমি কিন্তু তোমাকে হলপ ক'রে বল'ছি, টাকার জন্যে তোমাকে…'
'কি যে বলো ডার্লিং!' তাড়াতাড়ি হাত চাপা দেয় সে চার্লস ম্যাকিনটশের মুখে, এই পরম সত্য চাপা দেবার জন্যে।
রাত বাড়ছে। নাচ থেমেছে। বাজিয়েরা-নাচিয়েরা পাশের ঘরে মেঝেতে কুঁকড়ে ঘুমোচ্ছে। প্রচুর খানাপিনার পর সকলে ক্লান্ত। কেউ সোফায়, কেউ মেঝেতে পুরু গালিচায় তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়েছে। মাল্লারাও শুয়ে পড়ে। কে একজন হাঁচি দেয়। ঘুমন্ত মাল্লার গায়ের ওপর দিয়ে একটা বেড়াল লাফ মারে। চাঁদ ডুবছে, অন্ধকারে হাওয়া দেয়। ঠিক এই সময় গ্রীণ বোট সামান্য দুলে ওঠে। চোবদার তার অভ্যাসমাফিক হাঁক দেয়, 'কোন্ হ্যায়?' পাশের বোট থেকে আর-একজন চোবদার তার প্রতিধ্বনি তোলে। বোটের গা দিয়ে একটা জেলেদের ছিপ সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যায়।

এখন কত রাত ঠাওর হয় না। তারাগুলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলছে। গুণের কাঠি আরো বুকের সঙ্গে শক্ত ক'রে এঁটে ঘাসে-কাদায় পা ফেলে কানাই এগোয়। এক-একবার হড়কে যায়, কিন্তু আগের চেয়ে পদক্ষেপ এখন আরো নিয়ন্ত্রিত, হড়কানি অনেক কম। এক-একবার সে পেছনে তাকায়। আর কোনো কারণে নয় নিজেকে নিশ্চিত ক'রতে, অর্থাৎ সে যে এই গুণ টেনে নৌকো নিয়ে চলেছে, তা কি স্বপ্ন না বাস্তব?
গত চার-পাঁচদিন কানাই ঘুমোয়নি। যখন ম্যাকিনটশ-ক্র্যাফটন বিবাহের উৎসব জমজমাট, তখন ক্রমাগত শলা-পরামর্শ চালিয়েছে কানাই। প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে ফেঁসে গেল। একের পর এক বাগড়া এসেছে। সবচেয়ে বাগড়া দিয়েছে সুরথ। ব'লেছে, 'শীতল, কোম্পানি তাঁতিদের খেয়েছে। এবার জেলেদের খাবে, তুই এ-সব পাগলামি ছেড়ে দে। সব ভগবানের হাত।' শীতল তাকে বুঝিয়েছে, সে ঝুঁকি নিচ্ছে না, তাদের সম্প্রদায়ের আর কাউকে সে জড়াবে না। কোনো ঝুঁকির সম্ভাবনা দেখা দিলেই পলাতকদের ফেলে দেবে জলে, তাদের কোনো ওজর মানা হবে না। সুরথ নজির দেখিয়েছিল, 'কোম্পানির সঙ্গে কেউ এঁটে উঠবে না। এই দ্যাখ কৃষ্ণগোপাল, এত বড় মানী লোক, কি হ'ল।' তারপর তারা

তিনবার নৌকো পালটেছে। সারা দুপুর ছইয়ের নীচে জাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। সমস্ত দিন উদ্বেগে কেটেছে। জলপুলিস নতুন করে বসেছে, ছিপ নিয়ে ঘুরছে, খানাতল্লাসি ক'রছে। এখনো বিপদ পার হয়েছে কি না সে জানে না। একটা একটা করে তারা নিভছে, ফর্সা হ'চ্ছে। সারারাত গুণ টেনে হাত জ্বলে। এবার ঘাড় বেঁকিয়ে পেছনের দিকে চায়। রূপী নিশ্চল হ'য়ে হালে ব'সে আছে। গলুইতে ছল ছল ক'রে জলের আওয়াজ আসে।

কানাইয়ের এক-একবার মনে হয় সেও তার দাদা লক্ষ্মণ দাসের পথ নিয়েছে। এ পথ ছাড়া কি আর কোনো পথ নেই? বোধ হয় নেই, অন্ততঃ ঘটনাচক্রে নেই। কানাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। আর এই সমস্ত ব্যাপারটা একলা স্থির করা, একলা প্ল্যান করা, ব'লতে কি একলা একটা দীপশিখা মনের মধ্যে সঙ্গোপনে জ্বালিয়ে রেখে চলা, এর গৌরব আর অনিশ্চিত একইসঙ্গে কানাইকে আলোড়িত করে। ভারতবর্ষের অগ্রে-পশ্চাতে যারা এইভাবে হেঁটেছে, তাদের সমস্ত বাঁচার আয়রণি তার বুক জুড়ে বসে। চন্দননগরে প্রবেশের শেষ চেকপোস্ট পার হয়নি। হয়তো সেখানে তারা ধরা প'ড়বে কিংবা যাদের সে আত্মীয় ভেবে চ'লেছে, শীতলের সেই বন্ধুরা তাকে হয়তো অনাত্মীয় ভাববে এবং রূপী? মুক্ত হবার পর সে যদি দেখে মুক্তি বলতে কিছু নেই, রূপী যদি তার পাশে থেকেও না থাকে? যেমন ভারতবর্ষ স্বাধীন করার সংগ্রামে যারা নিজেদের যৌবন ফুঁকে দিয়ে প্রৌঢ় হ'য়ে জেল-গেটের বাইরে এসে দেখলে, সেই স্বপ্নের ভারত কোন্ ফুৎকারে উবে গেছে, চোর-বাটপাড়ে দেশ ছেয়েছে, তখন যে আশাভঙ্গ তখন খাঁচার দিনগুলোর জন্যে যে অশ্রুপাত, সেই ধরণের অনিশ্চিত কানাইকে দোলায়। অথচ, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সে টের পায়, জীবনের এই আনন্দ ও দুঃখের প্রবল ঝুঁকি নিতে পারে ব'লেই মানুষের জীবনের কোনো মানে হয়।

এবার অনেকটা ফর্সা হ'য়ে আসছে। ভোরের হাওয়া ছেড়েছে। ঘামে-ভেজা শরীর হাওয়ায় জুড়ায়। ভোরের আলোয় অদ্ভুত দৃশ্য ফুটে ওঠে। এদিকে-সেদিকে ছাই। বোধ হয় শ্মশান দিয়ে তারা চ'লেছে। আর-একটা জোয়ান মানুষের শবের অর্ধেকটা জলে ভাসছে, একটা কুকুর জলে নেমে মৃতদেহের ঘাড় কামড়ে খাচ্ছে। কানাই মাটিতে থুতু ফেলে। এক প্রবল আশঙ্কা তাকে অভিভূত করে। তার হয়ত এই পরিণতি। ম'রলে কাঠও জুটবে না। 'হারামি! শালা ডোমগুলো হারামি! না পুড়িয়ে ফেলে দিয়েছে।'

এবার নদী বাঁক নেয় এবং একটা ফুলন্ত শিমুলগাছের ফাঁকে ছবির মতো

চন্দননগর শহর ভেসে ওঠে। তার আগে চেকপোস্টের পতাকা উড়ছে দেখা যায়।

সেদিকে চেয়ে থমকে দাঁড়ায় কানাই। রূপীর দিকে পেছন ফিরে বলে, 'কি রে, ধরা প'ড়ব না তো?'

রূপী মৃদু হাসে। ভোরের আলোয় হালে ব'সে থাকা রূপীকে ঠিক দেখায় পৌরাণিক নায়িকার মতো। ডাক দিয়ে বলে, 'উঠে আয়। মাঝ-নদী বেয়ে চল। আমার মন ব'লছে, আমরা বেঁচে যাবো।'

কানাই দূরে লক্ষ্য করে। নদীর বুকে কয়েকটা কালো বিন্দুর মতো জেলে-নৌকো। তারপর দু'হাত জোড় ক'রে প্রণাম করে। কাকে প্রণাম ক'রে জানে না। সমস্ত শরীরটা ঝাঁকি দিয়ে মাঝ-নদী-বরাবর কানাই দাঁড় বাইতে থাকে।